শৈবভারতী

ম বর্ষ
সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৮৮

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৮

সম্পাদক—অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

শ্রীতুলসীকৃতং-শিবাষ্টক-স্তোত্রম্

নমামীশমীশান-নির্বাণরূপং
বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্মবেদস্বরূপম্।
অজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং
চিদাকারমাকাশবাসং ভজেমহম্॥
নিরাকারমাকারমূলং তূরীয়ং
গীরাজ্ঞানগাতীতমীশং গিরীশম্।
করালং মহাকালকালং কৃপালং
গুণাগার-সংসার-পারং নতোঽহম্॥
তুষারাদ্রি-সঙ্কাশ-গৌরং পরেশং
মনোভূপরার্দ্ধ-প্রভাদীপ্ত-দেহম্।
গিরিন্দ্রাত্মজা-বালচন্দ্রাবতংসং
ভূজঙ্গেশহারং সুরেশং ভজেঽহম্॥
লসৎকুণ্ডলং ভালনেত্রং সুরেশং
প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালুম্।
মগাধীশ-চর্ম হারং মুণ্ডমালং
প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং নতোঽস্মি॥
প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং
অখণ্ডং ভজে ভানুকোটি-প্রকাশম্।
ত্রয়ী শূল নির্মূলনং শূলপাণিং
ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যম্॥

কলাতীত কল্যাণ-কল্পান্তকারিন্
সদা সজ্জনানন্দদাতঃ পুরারে।
চিদানন্দ-সন্দোহ-মোহাপকারিন্
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারে ॥

ন যাবদুমানাথ-পাদারবিন্দং
ভজন্তীহ লোকে চতুর্বর্গকামাঃ।
ন তাবৎসুখং শান্তি সন্তাপনাশং
প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাস ॥

ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাং
নতোঽহং সদা সর্বতঃ শর্ব তুভ্যম্।
জরাজন্মদুঃখৌঘতাতপ্যমানং
প্রভো পাহি পাপান্নমামীশ শম্ভো ॥

ইতি শ্রীতুলসীকৃতং শিবাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ও নেপালসহ ভারতে শৈব নাথ-যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, আসাম, বঙ্গদেশ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে এঁদের সংখ্যা বিরাট হলেও, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে এঁদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। সাম্প্রতিক জন-গণনার প্রতিবেদন থেকে মোটামুটিভাবে একটা পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতের অভ্যন্তরস্থ সন্ন্যাসাশ্রমী যোগীর সংখ্যা পাওয়া দুস্কর।

বিপুল সংখ্যক এই নাথ-যোগীদের অতীত যতই গৌরব-মণ্ডিত হোক না কেন, সামগ্রীক দৃষ্টিতে তাঁদের বর্তমান অবস্থা যে উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয় তা জোর করেই বলা যায়। অঞ্চল বিশেষে এঁরা শিক্ষাগত ও আর্থিক মানে অগ্রসর হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা-দীক্ষায়, এবং আর্থিক মানে অনগ্রসর। মহারাষ্ট্রে 'নাথ-গোঁসাই', 'নাথ-পন্থী ডবরী গোঁসাই'-রা যাযাবর উপজাতির (Nomadic tribe) তালিকাভুক্ত। রাজস্থানে রাজগুরুরূপে পরিচিত নাথ-যোগীদের অনেকে সরকারী সাহায্য লাভের আশায় নিজ সন্তানদিগকে 'বিমুক্ত ঘুমন্ত যোগী' জাতিরূপে নথিভুক্ত করবার জন্য সচেষ্ট। উত্তর প্রদেশের মীরাট, আম্বালা, সাহারাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 'শর্মা', 'উপাধ্যায়' 'ব্রাহ্মণ' (নাথ) পদবীধারী অনেকে 'নাথ-যোগী' রূপে চিহ্নিত হয়ে সরকারী দাক্ষিণ্যপ্রার্থী। নানা ধারা ও শ্রেণীতে বিভক্ত নাথ-যোগীদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির বৈষম্য যেমন নৈরাশ্যজনক, তেমনি নৈরাশ্যজনক তাঁদের আত্মপরিচয়ের বৈষম্য। অত্যাবশ্যক হলেও, এই 'বিবিধের মাঝে' 'মহান মিলনে'র সেতুটি নির্মাণের কোন চেষ্টা হয়নি আজ পর্যন্ত।

বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ উন্নতিসাধনকে লক্ষ্যে রেখে অনেক আঞ্চলিক সমিতি গঠিত হয়েছে। আসামে 'আসাম নাথ-সম্মিলনী' পশ্চিমবঙ্গে 'আসাম-বঙ্গ যোগী সম্মিলনী' দিল্লীতে 'অখিল ভারতীয় নাথ-সমাজ', উত্তর ভারতে 'ভারতবর্ষীয় নাথসংস্কৃতি পারিষদ', মহারাষ্ট্রে 'বিদর্ভ নাথ সম্মিলন', বোম্বেতে 'বোম্বে যোগী সমাজ', কর্ণাটকে 'যোগী সুধারক সংঘ' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এদের সকলের কর্মক্ষেত্রই নিজ নিজ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি 'অখিল ভারত নাথ-সমাজ' একটি প্রস্তাব রেখেছে ('নাথ-সন্দেশ' মার্চ, ১৯৮১) 'অন্তরাষ্ট্রীয় নাথ-যোগী সম্মেলন' নামে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহুত হউক। সেই সম্মেলন মঞ্চে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ বিচার-বিতর্ক করে আমাদের সকলের জন্য এক জাতি, এক শ্রেণী, এক সম্প্রদায় সূচক নাম স্থির করুন। সকল নাথ-যোগীগণ যাতে বৈদিক সংস্কার গ্রহণ করে তার জন্য কর্মপন্থা স্থির করা হোক। সমস্ত সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি যাতে স্বজাতীয় পুরোহিত দিয়ে করা হয় তার জন্য প্রচার ও জনমত গঠনকরা হোক।

বলা বাহুল্য, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর ঘোষিত লক্ষ্য ও আদর্শও উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষের সহিত অভিন্ন। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী তাই উপরোক্ত প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এবং আশ্বাস দেয় আন্তরিক সহযোগিতার।

মোগল যুগে নাথ সম্প্রদায়

ডক্টর এন. সি. নাথ

প্রিন্সিপাল, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ের তৃতীয় অধ্যায়ে রতিকামিনী ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুরতনাথ[১] বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তাই ইহা শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম এবং এই নামের দ্বারা সুরতনাথের বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক সূচিত হইতে পারে। তবে আসলে নামটি সুরথনাথও হইতে পারে। মোগল দলিলে থ-কে ত্ লেখার উদাহরণ আছে (এই প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। সুরতনাথের দেহরক্ষার পর তাহার শিষ্য থান্ নাথের নামে প্রদত্ত একখানি দলিল এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

দলিল সংখ্যা ৫

সম্রাট জাহাঙ্গীরের মুরিদ (শিষ্য অনুগামী)

ইৎমাদউদ্দৌলা

"পরগণা পাঠানের বর্তমান ও ভাবী জাগীরদারগণের সকল গোমস্তা এবং করোরী-র উদ্দেশ্যে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া হইল যে—

যেহেতু প্রাচীন এক ফারমান অনুযায়ী নবম জাহাঙ্গীর বর্ষের[২] ২৬শে খুর্দাদ্ তারিখে লিখিত সম্রাটের মহামান্য ফারমান্ দ্বারা পূর্বোক্ত পরগণায় ২০০ বিঘা জমি সুরতনাথকে দান করা হইয়াছিল এবং সুরতনাথ সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন—

অতএব উক্ত জমি পারসীল[৩] বৎসরের খারিফ ফসলের আরম্ভ

---

১. শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, অধ্যায় ৩১, শ্লোক সংখ্যা ২

২. অর্থাৎ ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে।

৩. তুর্কী পঞ্জিকায় ১২ বৎসরে ১ যুগ ধরা হয়। সীচ্‌কানিল, উদীল, পারসীল্ প্রভৃতি এই বার বৎসরের নাম। বার ও মাসের নাম আমাদের পঞ্জিকায়ও আছে। বৎসরের নাম আমাদের নাই।

হইতেই মৃত সুরতনাথের শিষ্য থান্ নাথ এবং অন্যান্য যোগীকে মদদ্-ই-মাস্ (grant-in-aid) রূপে দান করা হইল।

এই মহামান্য আদেশ কার্য্যকরীকরতঃ কথিত জাগীরদারের গোমস্তা ও করোরীগণ প্রাচীন মহালের উক্ত খুদ্ কাষ্ঠা[৪] জমি উল্লিখিত যোগীদের হস্তে অর্পণ করিবেন। যাহাতে তাঁহারা বিজেতা রাজবংশের স্থায়িত্বের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন এবং তৎসহ উক্ত জমির ফসলের দ্বারা তাঁহারা জীবিকা নির্বাহও করিতে পারেন।

নবম জাহাঙ্গীর বর্ষের ২৭শে তীর্ তারিখে লিখিত হইল।

উল্টা পৃষ্ঠে

মহামান্য ফারমান্ অনুযায়ী জিম্ন্[৫]

পুরাণ মহালের ২০০ বিঘা জমি।

বৈজ্

আলোচনা

এই দলিলে প্রাপ্ত যোগী থান্ নাথের নাম অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। আকবর কর্তৃক যোগী উদন্ত নাথকে প্রদত্ত দলিলে যে দশজন নাথ যোগীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটা নামের প্রথমার্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল নাথটুকু আছে। যদি ঐ সব স্থানের কোথাও থান্ নাথের নাম থাকিয়া থাকে। অবশ্য অন্যত্র নাম উল্লেখ না থাকিলেই যে যোগীর মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হইল তাহাও নহে। তবে যেহেতু সুরতনাথের পর ইনি সরকার প্রদত্ত মদদ্-ই-মাস্ ভূখণ্ডের মালিকানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ইনিই গুরু পরম্পরার অন্তর্গত হইয়া জাখবর গদীতে আসীন হইয়াছিলেন। জাখবর মঠের সমাধিক্ষেত্রে

৪ সম্ভবতঃ নিজের ক্ষেতের জন্য প্রদত্ত জমি। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ নির্ণয় হয় নাই। খুদ্=স্বয়ং ; কাষ্ঠা—সম্ভবতঃ কৃষ্টি বা কৃষি।

৫. জিম্ন্—জমিন্, জমি

থান্ নাথের সমাধি বলিয়া কোন সমাধি দৃষ্ট হয় না।[৬] এমন হইতে পারে যে থান্ নাথ অন্যত্র দেহরক্ষা করেন। অথবা তাঁহার সমাধি কালক্রমে বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এখানে আর একখানি ক্ষুদ্র দলিলের প্রসঙ্গ করিতেছি। উহাতে তান্ নাথ ও বান্ নাথের কথা আছে।

দলিল নং ৬

আল্লা হু আকবর

......জমিল্ ১১০১

"যেহেতু যোগী তান্ নাথ, বান্ নাথ এবং অন্যান্যরা সম্রাট প্রদত্ত এক মহামান্য, মহান্ ফারমান্[৭] এর বলে পরগণা পঠান্ মৌজা নরোৎ এর অন্তর্ভুক্ত ২০০ বিঘা জমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। অতএব এতদঞ্চলের কিংবা অপরাপর এলাকার গোমস্তাগণ উক্ত শ্রদ্ধার্হ ফকির অর্থাৎ গৃহত্যাগী উদাসী পুরুষগণকে কোনরূপ উৎপীড়ন করিবেন না, কিংবা কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে যাইবেন না। এ ব্যাপারে এই যাহা লিখিত হইল উহা যেন খেয়াল রাখা হয়। ইহা সম্রাটের কঠোর নির্দেশ বলিয়া গণ্য হইবে।"

আলোচনা

এই দলিলের তারিখ আছে কিন্তু কাহার দ্বারা প্রদত্ত বোঝা যাইতেছে না। দলিলের পার্শ্বে অঙ্কিত মোহরটীরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। হইলে কিছু তথ্য মিলিত। আকবর প্রদত্ত দলিলে (নং ২)—যাহা উদন্তনাথকে প্রদত্ত হইয়াছিল—সুরতনাথ প্রভৃতি দশজন নাথের সহিত তান্ নাথ ও বান্ নাথের নামও

---

৬. গোস্বামী ও গ্রেবাল কৃত The Mughals and the Jogis of Jakhbar গ্রন্থের পৃ. ১১১। পাদটীকা নং ৪ দ্রষ্টব্য।

৭. ফারমান্ সংস্কৃত প্রমাণ শব্দের ফারসী রূপ। অর্থ প্রমাণ পত্র বা দলিল।

উল্লিখিত হইয়াছে। তান্ নাথ, বান্ নাথ ও অন্য কয়েকজন যোগী ২০০ বিঘা জমি রাজ সরকার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য নূতন কোন জমি নহে। যে ২০০ বিঘা পূর্বে উদন্ত নাথকে দেওয়া হইয়াছিল উহাই কালক্রমে তান্ নাথ প্রভৃতির হাতে আসে। তবে এখানে গ্রামের নাম নরোৎ বলা হইয়াছে। উদন্ত নাথকে প্রদত্ত জমি ছিল বোহ বা ভোয়া গ্রামে।[৮] তবে উদন্ত নাথের দলিলেই দেখা যায় ৫০ বিঘা জমি জলে ডুবিয়া যাওয়ায় উহার বিনিময়ে অন্যত্র জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। উহা নরোৎ গ্রামে হইতে পারে। বর্তমান জাখবর মঠ হইতে মাইল খানেক দূরেই নরোৎ বা নরোৎ মেহরা নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। ভোয়া গ্রামও নিকটেই। জাখবর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। তবে এই দলিলে নরোৎ গ্রামেই ২০০ বিঘা জমির কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে ভোয়া গ্রামের জমির পরিবর্তে নরোৎ গ্রামেই সমস্ত জমি দেওয়া হইয়াছিল কিনা জানা যায় না।

এই দলিলে গোমস্তাগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন নাথ সাধুগণের উপর কোন অত্যাচার না করে, এমন কি কোন জিজ্ঞাসাবাদও না করে। ইহা হইতে মনে হয় গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারীরা সরকার প্রদত্ত বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী নাথ যোগী দিগকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করিত। সম্ভবতঃ ইহা রাজদরবারে নিবেদিত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে এই দলিল প্রদত্ত হয়, যাহাতে গোমস্তাগণের প্রতি উক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

---

৮. এই গ্রামের অধিবাসিগণকে অদ্যাপি "ভোয়া নাথীয়" নামে অভিহিত করা হয়। নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইহাদের প্রাচীন সম্পর্ক ইহাতে পরিস্ফুট। গ্রামটিকেও কখনও কখনও "নাথাঁ-দা-পিণ্ড" (নাথ সম্প্রদায়ের পাড়া) বলা হয়। দ্রষ্টব্য: The Mughals and the Jogis of Jakhbar, পৃ. ৫৪ টীকা ৬।

এই দলিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ইহাতে তান্ ও বান্ নাথের নাম তান্ নাত্, বান্ নাত্ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। থ্-এর স্থানে ত্ ব্যবহৃত হইয়াছে। মোগল দলিলে অন্য ২।১ টি স্থানেও এইরূপ বানান দৃষ্ট হয়। ইহা একটি মূল্যবান্ তথ্য। ইহার গুরুত্ব পরে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

গান্ধারী কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ

শ্রীচন্দ্রমোহন নাথ

অর্জুন বিরাট নন্দনকে ডাকিয়া—বলিলেন, হে উত্তর, আমার ধনঞ্জয় নামের কারণ বলিতেছি শুন। আমরা যখন হস্তিনানগরে ছিলাম তখন আমার মা মহাদেবের পূজা করিতেন। রাজপত্নী ব্যতীত অন্য কেহ পাষাণলিঙ্গ যোগেশ্বরের পূজা করিতে পারিতেন না। তাই মা প্রভাতে স্নানাদি সারিয়া নানান উপাচারে হরের পূজা করিতেন। অনুরূপভাবে সুবল নন্দিনী গান্ধারীও শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। কিন্তু একে অপরের খবর জানিতেন না। দৈবযোগে একদিন ঐ স্থানে দুইজনের দেখা। মাতা কুন্তীকে গান্ধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, ফলফুল হাতে তুমি কেন এইখানে—বুঝিতেছি, দেবতার পূজা দিবে। মা উত্তর দিলেন, আমি ত সদাই পূজা দিয়া থাকি। কিন্তু তুমি হেথা কি কারণে? গান্ধারী রাগিয়া বলিলেন,—রাঁড়ি। তোর এত গর্ব? আমার সংপূজিত শিবলিঙ্গে তোর কোন্ অধিকার? আমি রাজগৃহিণী এবং রাজমাতা; এই শিবলিঙ্গ শুধু আমারই পূজ্য। তখন মা বিনয় সহকারে বলিলেন, দিদি এমন করিয়া বলিও না। তুমি জ্যেষ্ঠা, তাই এত সহ্য করি। ইহা সকলেরই জানা আছে, যেইদিন আমি কুরুকুলে বধূ হইয়া আসি সেইদিন হইতেই কুরুকুলে হরের পূজা দিয়া থাকি। বহুদিন বনের ভিতরে ছিলাম, তাই তুমি পূজা দিতে পারিলে। আমি এখন আপন দেশে আসিয়াছি, আমি পূজা দিব। আর তোমার পূজা দিবার দরকার নাই। গান্ধারী বলিলেন, তুই পূর্ব অহংকার ছাড়—সকলের অনুমতিতে এই শিবলিঙ্গ আমি পূজা করি। ইহাতে তোর কোন অধিকার নাই। তোর সকল ফুলফল ফেলিয়া দিয়া এই স্থান হইতে দূর হইয়া যা। আবার পূজা দিতে এইখানে আসিলে ভাল

হইবে না। মা ও বলিলেন, যতদিন এইখানে ছিলাম না জোর পূর্বক ততদিন মহেশকে পূজিতেছিলে। কিন্তু ভগিনী আর আসিলে বিপদ হইবে। এইভাবে দুই বোনের কঠিন বিবাদ বাধিলে লিঙ্গ হইতে সদাশিব বাহির হইয়া বলিলেন, দুইজনে দ্বন্দ্ব কর কেন? —আমি সকলের ইষ্ট—, আমাকে কেহ ভাগ করিয়া লইতে পারে না। তোমরা দুইজনে কুলবধূ, তাহাতে আবার রাজবধূ ও রাজমাতা। তাই তোমাদের দুইজনের পূজায় আমি বড়ই প্রীত। সুতরাং উভয়েই সর্বদা আমার পূজা কর। বিরোধে কাজ নাই।

কিন্তু যদি একান্তই আমার পূজা লইয়া তোমরা বিবাদ করিতে চাহ তাহা হইলে আমার দৃঢ়বাক্য শ্রবন কর। এক সহস্র সুগন্ধী স্বর্ণ চাঁপায় প্রভাত বেলায় যে প্রথমে আমার পূজা করিবে আমি তাহারই এবং সেই হইবে রাজমাতা তাহার পুত্রেরাই হইবে রাজা। ইহা বলিয়া শিব প্রস্থান করিলেন। শিবের এই কথায় গান্ধারী অহংকারে মাকে উপহাস করিয়া বলিলেন, কুন্তী এইবার নিশ্চয়ই মহেশ্বর তোমার হইলেন ; যাও পুত্রদের নিকট সুবর্ণ চম্পা মাগিয়া সত্বর লইয়া আইস। গান্ধারী তখনই শতপুত্রকে ডাকাইয়া আনিয়া সকল ঘটনা বিস্তারিত জানাইলেন—দুইবোনের দ্বন্দ্ব এবং মহাদেবের আদেশ সকলই বলিলেন। ইহা শুনিয়া দুর্যোধন মহানন্দে সহস্র সহস্র কর্মী নিয়োগ করিলেন। ভাণ্ডার হইতে একশত মণ স্বর্ণ দিলেন এবং মুনিমুক্তা খচিত বহু সহস্র সুবর্ণ চাঁপা নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে আমার মা অভাগিনী। কারণ তিনি স্বামীহীনা, পরান্নে প্রতিপালিতা, অসহায়া, শিশুপুত্রের জননী তাই হরের বাক্য শুনিয়া অতি দুঃখে অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। চরণ চলে না—মুখে নাই বাক্য। দ্বিপ্রহর সময় হইল—আহারের সময় উপস্থিত ভীম বারবার খাইতে চাহিল। মা নিরুত্তরা, মলিনবদনা। ইহার পর ভীমের ন্যায় ক্ষুধায় পীড়িত নকুল সহদেবও গিয়া মাতার নিকট বার বার দুঃখের কারণ

জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইল না। পেটুক ভীম রন্ধনের দেরী থাকায় সামান্য কিছু আহারের অনুমতি চাহিল যুধিষ্ঠিরের নিকট। যুধিষ্ঠির বলিলেন মা কি কারণে এত দুঃখিত তাহা না জানিয়া কিরূপে আহার করিবে ভাই? তখন ধর্ম-নরপতির আজ্ঞায় আমি মায়ের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বল গো মা! তোমার কিসের দুঃখ? ভীম, নকুল, সহদেব ক্ষুধায় কাতর; কেন রন্ধনাদির ব্যবস্থা না করিয়া নতমুখে বসিয়া আছ?

তখন মা উভয়ের বিবাদ ও শঙ্করের আদেশের কথা জানাইলেন। আরও জানাইলেন, গান্ধারীর আদেশে সহস্র সহস্র কর্মী স্বর্ণ চাঁপা তৈয়ারীর জন্য নিয়োজিত হইয়াছে: তোমরা সব শিশু; ধন দৌলত কোথায় পাইবে এই চিন্তায় আমি অতিশয় দুঃখিত। আমি বলিলাম মা, ইহা আর কি এমন বড় কথা: তোমার যত স্বর্ণ চাঁপা দরকার আমি দিব। কিন্তু মায়ের প্রত্যয় হয় না। পুনঃ আমি আশ্বাস দিলাম, তোমায় ভুলাইতেছি না; যত চাও তত সুবর্ণ চাঁপা দিব—তুমি রন্ধন কর, অন্নজল খাও, শান্ত হও, সবাইকে ভোজন করাও। তখন মা আশ্বস্ত হইয়া রন্ধন করিলেন এবং সবাইকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইলেন।

এইরূপে রজনী শেষে প্রভাত হইয়া আসিলে আমি গুরুপদে প্রণাম জানাইয়া পুষ্পের জন্য যুগল অস্ত্র কুবের পুরী অভিমুখে নিক্ষেপ করিলাম; আর উহা বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া দিলাম। তখন শিবের উপরে অপ্রমিত ধারায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

দেউল, উদ্যান সুগন্ধী স্বর্ণ চাঁপায় পূর্ণ হইল। শুধু ফুল আর ফুল, মাকে বলিলাম—যাও স্নান সারিয়া শিবের পূজা কর। অগণিত ফুল আনিয়া দিয়াছি। কৌতূহলী হইয়া মা স্নানান্তে ভক্তিভরে মহাদেবের পূজা করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া মাতাকে বর দিলেন—"তোমার

[শেষাংশ ১৫ পাতায়]

সামবেদীয় নিত্যপূজা পদ্ধতি

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন

বিশেষার্ঘ্য জলে ও সামন্যার্ঘ্য জলে নারায়ণ শিলা, শিবলিঙ্গ, দেবীঘটে বা দর্পণে দেব-দেবীকে স্নান করাইতে হইবে।

নারায়ণের স্নান মন্ত্রঃ—ওঁ সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিংসর্বতোবৃত্ত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

বিশেষ স্নান মন্ত্রঃ—১। ওঁঅগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্। ২। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রাপয়িতু—শ্রেষ্ঠ তমায় কর্মণে। ৩। ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ঘৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সংসি বর্হিষি। ৪। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভি স্রবন্তু নঃ।

শিবের স্নান মন্ত্র ঃ—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

বিশেষ স্নান মন্ত্রঃ—১। দুগ্ধ দ্বারা—ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ। ২। দধি দ্বারা ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ। ৩। ঘৃত দ্বারা ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ। ৪। মধু দ্বারা ওঁ হৌং সদ্যজাতায় নমঃ।

স্ত্রীদেবতার স্নান মন্ত্র ঃ—ওঁআত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেত গঙ্গা চ কৌষিকা। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্বাঃ সুমনসে ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ।

পরে কুশি করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জল লইয়া দেব-দেবীকে স্নান করাইবে, মন্ত্র যথা ঃ—ইদং স্নানীয় গঙ্গোদকং ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ নমঃ! ওঁ শ্রীং লক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়

নমঃ। ইত্যাদি রূপে যে যে দেবতার স্নান করাইতে হইবে সেই সেই দেব-দেবীর নামোল্লেখ করিয়া জল দিবে।

পরে নারায়ণ শিলা ও শিবলিঙ্গকে মুছাইয়া নাদ বিন্দু আকারে চন্দন দিবে এবং নারায়ণকে চিৎভাবে উপর ও নিচে তুলসীপত্র দিয়া সিংহাসনে বসাইবে। শিবকে বিল্বপত্র উপুর করিয়া দিবে। ইচ্ছা করিলে শিবকে একটি তুলসীপত্র দেওয়া যায়।

অতঃপর পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে। পরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া পুনরায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যানান্তে ঐ পুষ্প নারায়ণ শিলায়, শিবলিঙ্গে, ঘটে অথবা দেবতার চরণে দিবে। পরে পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার শেষে প্রণাম করিয়া দেবদেবীর বীজমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া পুনরায় প্রণাম করিবে।

গণেশের ধ্যান :—ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধমধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতা-রিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দেশৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

সূর্যের ধ্যান :—ওঁ রক্তাম্বুজাশনমশেষগুণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্ত-জগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়ববান্ দধতং, করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥ অর্ঘ্যদানমন্ত্র :—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িণে ইদমার্ঘং ওঁ হ্রীঁ হংস শ্রীসূর্যায় নমঃ। পরে কর জোড়ে—এহি সূর্য সহস্রাংশ তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গ্রহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

নারায়ণের ধ্যান :—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরিসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারীহিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।

শিবের ধ্যান :—ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং, পরশুমৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্॥

প্রসন্নং পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিবসানাং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।

চণ্ডীর ধ্যান : ওঁ বন্ধুককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্। স্ফুরচ্চন্দ্র কলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্॥ ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্। পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ। দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মনিতাম্॥

[ক্রমশঃ]

[১২ পাতার শেষাংশ]

পুত্র কুরুকুলে রাজা হইবে এবং তুমিই আজ হইতে একা আমার পূজা করিবে। আর আমাকে বলিলেন—কুবেরের ধনাগার তুমি জয় করিয়াছ, তাই তোমার নাম হইল ধনঞ্জয়।”

তাহার পর গান্ধারী প্রাতে উঠিয়া হেমপাত্রে সহস্র কনকপুষ্প বিবিধ উপাচারে সাজাইয়া নারীগণ সহ পূজা করিতে আসিয়া দেখিলেন শিবপূজা সমাপ্ত, সকল দিক স্বর্ণপুষ্পে পূর্ণ। গান্ধারী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, আমি এই পুষ্পে শিবপূজা করিয়াছি এবং উমাপতি বর দিয়া নিজস্থানে গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে সমস্ত স্বর্ণপুষ্প জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং গৃহে গিয়া পুত্রদের নানা কটুবাক্য বলিলেন। আর বলিলেন, অকারণে আমার শতপুত্র জন্মিয়াছে, কুন্তী সাধ্বী সাধু পুত্রই গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তাই মাতা-পুত্রের জনম সফল হইয়াছে।

অনুরক্তির প্রকার ভেদ

শ্রীচন্দ্রশেখর নাথ

কে গো তুমি মোর নামে আঁখি কর সিক্ত ?
আর্দ্র কণ্ঠে কহে,—প্রভু, আমি তব ভক্ত।

কে গো তুমি জোড়হাতে কণ্ঠে গলবাস ?
ওগো প্রভু, আমি তব দাসের অনুদাস।

কে গো তুমি নামসহ কর প্রাণায়াম ?
আমি ঋষি, মহাতেজা যমদগ্নি নাম।

কে গো ঝাড় মোর গৃহ ধূলাকালি মাখা ?
ওগো প্রভু, এ দুঃখিনী তোমার সেবিকা।

কে গো তুমি ফলে-ফুলে সাজাও নৈবেদ্য ?
তোমার পূজক আমি করি যথাসাধ্য।

কে গো তুমি অগ্রে গাও পিছে জনগণ ?
তোমার গায়ক করি নাম সংকীর্তন।

কে গো তুমি তল্পি নিয়ে থাক কাছে কাছে ?
তোমার বাহক শিষ্য—চিরদিন পিছে।

কে গো তুমি বাক্যহীন বসিয়া নিরালা ?
তোমার সাধক আমি জপি জপমালা।

কে গো তুমি গৃহহীন বসি যোগাসনে ?
তোমার তপস্যা আমি করি একমনে।

কে গো তুমি দ্বারে বসে বাজাও খঞ্জনী ?
আমি কবি, গাই তব মহিমার বাণী।

দার্জিলিং ভ্রমণ

বিমলচন্দ্র নাথ

শৈল শহর দার্জিলিংয়ের
অপরূপ শোভা তার।
বিস্ময় ভরা বিভীষিকাময়
তবুও চমৎকার।
পাহাড়ের ঢালে কত ঘর বাড়ী,
কত যে বিশাল বৃক্ষ।
কত ফুল ফল ধরিয়াছে তায়—
বিহগেরা করে নৃত্য।
ষ্টীমে চলে ছোট টয় ট্রেন,
গতি তার অতি মন্দ।
বিরূপ হবেনা তাতে চড়ে তুমি,—
নেই তাতে কোন সন্দ
পাহাড়ে চড়িয়া দেখিবে পাহাড়,
নেইকো উহার শেষ।
মন হুহু করে জানাবে তোমারে,
আসিয়াছ দূরদেশ।
সমতল মাটি তোমারে টানিবে,
জাগিবে কত যে ভয়।
স্বদেশ জানিয়া তুমিও বলিবে,
এ দেশ তোমার নয়।
গ্রীষ্ম এখানে মরে হেজে গেছে,
শীতটা হয়েছে রাজা।
দাপটে তাহার মানুষের ভাই
শিরদাঁড়া নেই সোজা।

জল নেই তবু কলে যেটা পড়ে,
হাত দেওয়া বড় কষ্ট।
কন্ কন্ করে তখনি তোমার
জমে যাবে সব রক্ত।
আসা-যাওয়াতে যত ভাল লাগে
বসবাসে তত নয়।
অধিবাসী যারা ভীনদেশী তারা
মেলামেশা করা ভয়।
তবু যেতে হবে অপরূপ শোভা
নয়নে রাখিতে ধরে।
কেহ নাহি জানে বাঁচে সে ক'দিন—
কবে বা যাইবে মরে।

———

শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের যোনি-বংশ, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-বংশ

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি, টি.

বাংলাদেশের নাথ, দেবনাথ, ভৌমিক, মজুমদার, সরকার, মুহুরী, রায়, চৌধুরী, তালুকদার, হালদার, বিশ্বাস, শর্মা, বাগচী, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, প্রভৃতি উপাধিধারী বহু পরিবার নিজেদিগকে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। জাতিগত পরিচয় দিবার সময় বলিয়া থাকেন কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ যোগী ইত্যাদি। এই পরিবারগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জীবিকা, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। জীবিকা কাহারও বা চাষবাস, কাহারও বা পানচাষ, কাহারও বা তাঁতশিল্প, কাহারও বা চাকরী-বাকরী, কাহারও বা ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি; কেহ কেহ আবার যজন-যাজন-ক্রিয়ার দ্বারাই সংসার চালাইয়া থাকেন। ইহাছাড়া কিছু কিছু নাথ উপাধিধারী পরিবার আছেন যাঁহারা জাতিগত পরিচয় দিবার সময় বণিক, কায়স্থ প্রভৃত বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি?

শৈব-নাথ-ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করিয়া অনুমান করা যায়,—

শৈব-নাথ-ধর্ম দুইটি উপায়ে বিস্তার লাভ করিয়াছিল—(১) বিন্দু বা যোনিবংশ দ্বারা এবং (২) নাদ বা বিদ্যা বংশদ্বারা। পিতা-পুত্র ক্রমে শৈব-নাথ-যোগ-সাধনা করিয়া যোনিবংশ প্রসারিত হইয়াছিল এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় শৈব-নাথ-যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া বিদ্যাবংশ প্রসারিত হইয়াছিল। যোনিবংশের শৈব-নাথগণ গৃহী, কিন্তু বিদ্যাবংশের শৈব-নাথ-গণ অগৃহী। বিদ্যাবংশে সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের লোককে সমান মর্যাদা সহকারে শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইত—শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর সকলেই 'নাথ' পদবী প্রাপ্ত হইয়া অগৃহীনাথ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। কিন্তু যোনিবংশে পিতা-পুত্র ক্রম বজায় থাকায় সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাহাকেও শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্যই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত।

কিন্তু বর্তমানে বণিক, কায়স্থ প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের গৃহস্থদের মধ্যেও 'নাথ' পদবী দেখা যায়। ইহার কারণ দ্বিবিধ হইতে পারে। বল্লালী অত্যাচারের সময় আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করিতে গিয়া কেহ কেহ উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শেষপর্যন্ত ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। অথবা শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষার কঠোর নিয়মের (অন্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাহাকেও শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে হইলে তাঁহাকে অবশ্যই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত) শিথিলতার যুগে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির কোন কোন গৃহস্থ স্ব স্ব সম্প্রদায়ে থাকিয়াই শৈব-নাথ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের পরবর্তী বংশধরগণ সেই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ভারতীয় হিন্দু-সমাজে বর্ণ-বিভাগের পর চারিটি বর্ণের জন্য চারিটি পদবীর সৃষ্টি হইল—ব্রাহ্মণের জন্য 'শর্মা বা দেবশর্মা', ক্ষত্রিয়ের জন্য 'বর্মা বা দেববর্মা', বৈশ্যের জন্য 'গুপ্ত' এবং শূদ্রের জন্য 'দাস'। সুতরাং সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মূল পদবী 'শর্মা বা দেবশর্মা' সকল শ্রেণীর ক্ষত্রিয়ের মূলপদবী 'বর্মা বা দেববর্মা', সকল শ্রেণীর বৈশ্যের মূল পদবী 'গুপ্ত' এবং সকল শ্রেণীর শূদ্রের মূল পদবী 'দাস'[১]।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা মুনিধারার তাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডের যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ-ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-সত্তা লাভ করিলেন এবং তাঁহারাই গুরুর আসনে আসীন হইলেন। ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে শৈব-ধর্ম হইতেছে প্রাচীনতম ধর্ম। সুতরাং শৈব-গুরু-কুলই প্রাচীনতম গুরু কুল। এই শৈব-গুরুকুলের গুরুগণ ঈশ্বর বা প্রভুর তুল্য বলিয়া 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। কালক্রমে এই শৈব-গুরু-কুলের মূল পদবী 'শর্মা' 'নাথ' উপাধির অন্তরালে বহুক্ষেত্রেই হারাইয়া গেল। আর যাঁহারা ঋষিধারার ব্রাহ্মণ তাঁহারা কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডের যজ্ঞ লইয়াই রহিলেন এবং তাঁহারা 'শর্মা' এই মূল পদবীর দ্বারাই ভূষিত থাকিলেন। কালক্রমে এই ঋষিধারার ব্রাহ্মণগণের মূল পদবী 'শর্মা'ও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত নানাবিধ উপাধির অন্তরালে বহুক্ষেত্রেই হারাইয়া গিয়াছে।

---

১ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাবে বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে অনেকেই 'দাস' পদবী ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শৈব-গুরু-কুলে জাত মহাত্মাগণের অনেকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক সর্বাত্মক যোগ-সাধনায় রত হইলেন এবং সিদ্ধিলাভ করিবার পর উদার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই সন্ন্যাস অবলম্বনের পর শৈব-যোগ-ধর্মে দীক্ষা দান করিয়া বিদ্যাবংশ স্থাপন করিলেন।

শৈব-শঙ্করাচার্যের পূর্বেই শৈব-বিদ্যাবংশ নাথ, গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল।[১] এই শাখাগুলির মধ্যে নাথ শাখার গুরুগণ বৌদ্ধপ্লাবনে ভাসমান ভারতে শৈব-ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আর এই কাজ করিতে গিয়া তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের সহিত কিছুটা সমন্বয় সাধন করিয়া শৈব-ধর্মকে কিছুটা নতন ছাঁদে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শৈব-নাথ-গুরু গোবিন্দ নাথের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুর নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি বৌদ্ধমতকে পরাস্ত করিয়া শৈব-মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের মহান-মনীষা বেদান্ত-মতের প্রতিষ্ঠা দিল। শৈব-নাথ-মতের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটায় তিনি গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি শৈব-মতগুলিকে স্বীকৃতি দিয়া পৃষ্টপোষকতা করিয়াছিলেন। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য

---

১. বলা হইয়া থাকে—গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী শৈব-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন শৈব-গুরু শঙ্করাচার্য্য। কিন্তু 'চন্দ্রাদিত্য পরমাগমে" বলা হইয়াছে—যোগনাথের (বিন্দুনাথের) আদি নাথাদি ষোলজন পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে আদি নাথাদি ছয়জন গৃহবাসী ছিলেন এবং গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই 'চন্দ্রাদিত্য পরমাগম' অনুসারে বলা যাইতে পারে, —শঙ্করাচার্যের পূর্বেই গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি শৈব-সন্ন্যাসীগণ শৈব-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই শৈব-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়গুলি প্রতিষ্ঠাতা-গুরুগণের নামানুসারে পরিচিত হইয়াছিল; গৃহস্থ নাথ (রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ) গুরুর সন্ন্যাসী-শিষ্যগণও শৈব-নাথ-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশটি সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করায় সেই সম্প্রদায়গুলি দশনামী-সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

শৈব-নাথ-গুরুর সন্ন্যাসী শিষ্য হইয়াও 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত হন নাই। বেদান্তের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

কালান্তরে শৈব-ধর্মের সূত্র ধরিয়া শাক্ত-ধর্মের আবির্ভাব ঘটিল। শৈব-ধর্মের যোগ-সাধনা এবং শাক্ত-ধর্মের তন্ত্র-সাধনা পাশাপাশি চলিতে থাকিল। শৈব-গুরুগণের মধ্যে যাঁহারা গৃহী তাঁহারা দুইভাগে বিভক্ত হইলেন—(১) শৈব-গুরু ও (২) শাক্ত-গুরু। তাই ত দেখা যায়, শাক্ততন্ত্রেও গুরুকুলের উপাধি 'নাথ'।

'নাথ' শব্দের একটি অর্থ 'স্বামী'। বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবে সেখানেও গুরু-কুলের সৃষ্টি হইল। এই বৈষ্ণব গুরুগণ 'স্বামী' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। 'গোস্বামী' উপাধি 'স্বামী' উপাধিরই রূপান্তর।

সুতরাং বলিতে হয়,—ব্রাহ্মণ-কুলের মূল-পদবী 'শর্মা বা দেবশর্মা' আর ব্রাহ্মণ-কুলের মধ্যে গুরু-কুলের বিশেষ উপাধি 'নাথ বা দেবনাথ' অথবা 'স্বামী বা গোস্বামী'।

বাংলাদেশের মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, বাগচী, মৈত্র, ভৌমিক, মজুমদার, হালদার, রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, তালুকদার, মুহুরী প্রভৃতি পদবী পরবর্তীকালে প্রাপ্ত বিশেষ বিশেষ উপাধি মাত্র। ইহাদের মধ্যে মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কেবলমাত্র রাঢ়ী-ব্রাহ্মণগণের, মৈত্র প্রভৃতি কেবলমাত্র বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের; বাগচী প্রভৃতি বারেন্দ্র ও রুদ্রজ উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের; ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের এবং ভৌমিক, মজুমদার, হালদার, রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, তালুকদার, সরকার, মুহুরী প্রভৃতি সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের মূলপদবী 'শর্মা বা দেবশর্মা' এবং মূল উপাধি 'নাথ বা দেবনাথ'। যে ভাবে 'শর্মা' ভিন্ন অপর উপাধিগুলি রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আসিয়াছে, সেই একইভাবে 'নাথ বা দেবনাথ' ভিন্ন অপর উপাধিগুলি রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও আসিয়াছে।

শৈব-নাথ-ধর্মের মূল সাধনা হইতেছে যোগ-সাধনা। অতীতে যোনি-বংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও যোগ-সাধনা করিতেন। তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতেন বলিয়া কর্মকাণ্ডের যজ্ঞানুষ্ঠানও করিতেন তবে

জ্ঞানকাণ্ডের যোগকেই প্রাধান্য দিতেন। সেইজন্য তাঁহারা যজ্ঞসূত্র এবং যোগপট্ট, দুইটিই ধারণ করিতেন।

বেদ-পুরাণাদিতে বর্ণনা করা হইয়াছে,—ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডল হইতে; সেই মুখমণ্ডলের সর্বোচ্চস্থান ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি এবং রুদ্রগণ হইতে যোগধর্মপরায়ণ গৃহস্থ-শৈব-নাথ-গণের উৎপত্তি। তাই গৃহস্থ শৈব-নাথ-গণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আবার যেহেতু এই ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ যোগ-সাধনা করিতেন সেইজন্য তাহারা যোগী-ব্রাহ্মণ হিসাবেও পরিচিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে শৈব-যোগ-ধর্মের গৌরবময় যুগে বিন্দুবংশের সন্ন্যাসী যোগিগণের সহিত যোনিবংশের এই গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণও শুধু 'যোগী' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বর্তমানে, নানাকারণে, যোনিবংশে যোগ-সাধনা ও যোগপট্ট ধারণ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

যোনিবংশের গৃহস্থ রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণ এবং বিন্দুবংশের যোগী-সন্ন্যাসীগণকে লইয়া শৈব-নাথ-সম্প্রদায়। বর্তমান ভারতে এই সম্প্রদায়ের দুইটি বংশের অস্তিত্বই বর্তমান রহিয়াছে। বিন্দুবংশের সন্ন্যাসিগণ শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ঐতিহ্য অনেকাংশে রক্ষা করিয়া আসিতে পারিলেও যোনবংশের গৃহস্থগণ কিন্তু অনেকখানি পিছাইয়া পড়িয়াছেন। বাংলাদেশে'ত তাহারা একটা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে পরে আসিতেছি।

বিন্দুবংশে বর্তমানেও অপর বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সাধনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক শৈব-নাথ গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া 'নাথ' উপাধি ধারণ করিয়া শৈব-নাথ-তীর্থের মঠ-মন্দিরাদিতে অধ্যাত্ম-সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন। একদা উত্তর প্রদেশের গোরক্ষমঠের মোহন্ত ছিলেন গম্ভীর নাথজী। তিনি কাশ্মীরের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ মঠের মোহন্তপদে অধিষ্ঠিত হন দিগ্‌বিজয় নাথজী। তিনি উত্তর প্রদেশের ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন। বর্তমানে ঐ মঠের মোহন্তপদে অধিষ্ঠিত আছেন অবৈদ্য নাথজী। তিনি বিহারের ভুঁইহার ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান।

এইবার বাংলাদেশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় আসিতেছি। রাজা বল্লাল সেনের পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশে রুদ্রজ বা

যোগী ব্রাহ্মণগণ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা বল্লালের পিতৃশ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়,[১] বল্লাল সেন এই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে জটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে বল্লাল পত্নী পদ্মাক্ষিদেবীর প্রেরিত পূজা-উপাচারের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া রাজ পুরোহিতের (যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ) সহিত ঐ মন্দিরের মোহন্ত পুরোহিতের (রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ অথবা যোগী-সন্ন্যাসী) কলহ হইল এবং পরিণতিতে রাজপুরোহিত অপমানিত ও মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। রাজ-পুরোহিত রাজা বল্লালের নিকট অভিযোগ করিলে রাজার পূর্ব অসন্তোষ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। ফলে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া সমগ্র সম্প্রদায়ের (যোনি বংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ এবং বিন্দুবংশের যোগী-সন্ন্যাসী উভয়ের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

শুরু হইল ধ্বংস-যজ্ঞ। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যোনিবংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণের অনেকে পৈতা ও যোগপট্ট পরিত্যাগ করিয়া যিনি যেখানে পারিলেন আত্মগোপন করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন এবং বিন্দুবংশের যোগীসন্ন্যাসীগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। রাজাজ্ঞার সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারিত কুৎসা আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণদিগের প্রকৃত পরিচয় নানাবিধ অপপ্রচারের তলায় তলাইয়া গেল।

অপরদিকে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ প্রধান, কর্মকাণ্ডের ক্রিয়াকাণ্ড সর্বস্ব ধর্ম রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে যাঁহারা সেই ধর্মকে সর্বাংশে মানিতে চাহেন নাই তাঁহাদিগের উপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সমাজ অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চালাইতে থাকেন। নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশের রুদ্রজ বা যোগী-ব্রাহ্মণগণ কিন্তু যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই এবং এখনও করেন না। সেই কারণেও নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণগণকে লাঞ্ছিত ও সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। বাংলাদেশের সাহা, সুবর্ণবণিক প্রভৃতিকেও এই অত্যাচারের কবলে পড়িয়া অনেক গ্লানি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

---

১. তৎকালে শ্রাদ্ধীয়-দান-গ্রহণ অগৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইত। বর্তমান কালেও অনেক সৎ-ব্রাহ্মণ দেখা যায় যাঁহারা গৌরবজনক নয় বলিয়া শ্রাদ্ধীয়-দান গ্রহণ করেন না ; এমন কি শ্রাদ্ধ-বাসরে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে চাহেন না।

উপরোক্ত দুইটি কারণে বাংলাদেশের রুদ্রজ বা যোগী-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা, ঐতিহ্য, ধর্ম, আচার-নিষ্ঠা, ভুলিয়া প্রায় আত্মবিস্মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন বহুকাল। আত্মরক্ষার তাগিদে বিভিন্ন প্রকার নিম্নবৃত্তি গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইলেন। এইভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জীবিকা, রীতি-নীতি ও আচার-নিষ্ঠা আসিয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে এই রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে শিক্ষা পুনরায় বিস্তার লাভ করিলে, সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ উদার যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণদিগের সহায়তায় প্রায় আত্মবিস্মৃত এই জাতির জাগরণের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। অপরদিকে বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ বাংলা তথা ভারতের ও নেপালের শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণার কার্যে ব্রতী হইলেন। অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জনসাধারণের সম্মুখে আসিল ; শৈব-নাথ ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্পর্কে জানিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। যদিও সেই সমস্ত গবেষণায়, গবেষণার জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনে আংশিক সত্য মাত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; তথাপি সেই আংশিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণসত্য উদঘাটনের সোপানশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে ; সন্দেহ নাই। সেই সোপান-শ্রেণীতে আরোহণ করিয়া পূর্ণ-সত্য উদ্ঘাটনের মহানদায়িত্ব আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের যোনি-বংশের রুদ্রজ বা যোগী ব্রাহ্মণের শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে পিছনে পড়িয়া নাই। প্রত্যেকে সচেষ্ট হইলে অচিরেই আমরা আমাদিগের হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে অবশ্যই সমর্থ হইব। শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের বিদ্যাবংশের যোগীসন্ন্যাসীগণও আমাদিগের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। আমাদিগের সেই সমবেত প্রচেষ্টা প্রসারিত ও জয়যুক্ত হউক।

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে

রাণী দেবী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কত দর্শনীয় স্থান, কত শহর, নগর, মন্দির আছে আমরা তার কতটুকুই বা জানি, দেখা তো দূরে থাকুক। আমাদের পক্ষে বাইরে বেড়ানো সম্ভব হয়না নানাকারণে ঠিকই, তবে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় বোধহয়। অবশ্য সেই সাথে সুযোগও দরকার। সেবার এইরকম একটা সুযোগ এসেছিল আমাদের বেড়াতে যাবার।

পণ্ডিচেরীতে থাকেন আমাদের এক আত্মীয়। অনেকদিন থেকেই তিনি সেখানে যাবার জন্য বলেন কিন্তু আমাদের সময় সুযোগ হয় না। সেবার তিনি খুব জোর দিয়েই লিখলেন শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগষ্টে যাবার জন্য। হঠাৎ মনস্থির করে ফেললাম। ১৯৭৩ সালের ১২ই আগষ্ট আমরা রওনা হলাম। হাওড়া থেকে সন্ধ্যে ৭টায় মাদ্রাজ মেল ছাড়ল। ট্রেনে টু-টায়ারে উঠেই মনে হয়েছিল খুব ভীড় কিন্তু একটু পরে যে যার জায়গা পেয়ে গেলে আর ভীড় রইলো না। জিনিসপত্র গুছিয়ে জানালার কাছে বসতে বসতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাত ৯টা নাগাদ খাওয়ার পাট চুকিয়ে উপরের বার্থে উঠে শুয়ে পড়লাম। বাড়ীর মতো আরামেই রাত কাটলো। ভোর হল যখন, তখন আমরা উড়িষ্যা ছেড়ে এসে অন্ধ্রে পড়েছি মনে হল। ট্রেন ছুটে চলেছে, একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে ধানক্ষেত দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি ধানক্ষেতের ধারে ধারে তালগাছের সারি যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য গাছপালা কমই দেখলাম। একটার পর একটা পাহাড় যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটায় ছোট ছোট গাছপালা জন্মেছে আবার কোনটায় কঠিন পাথর এবড়ো-খেবড়ো ভাবে রয়েছে যেন যে কোন মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়বে। সকাল থেকেই এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। এগারোটা নাগাদ ওয়ালটেয়ারে ট্রেন থামতে আমাদের দুপুরের খাবার দিয়ে গেল। সকাল থেকে কোন কাজকর্ম নেই। বসে বসে খাওয়া বেশ ভালই লাগলো। ওয়ালটেয়ার শহর দেখা হলনা কারণ আমাদের গন্তব্যস্থল পণ্ডিচেরী। সারাটা দিন কেটে গেল ট্রেনের জানালায় বসে। ক্লান্তিও নেই চোখে ঘুমও নেই। ট্রেনে মাঝে মাঝে নতুন যাত্রী কিছু আসছে, তাদের সাথে ভাব করতে চেষ্টা করি, কিন্তু ভাষা তো বুঝিনা। যা হোক হাসিগল্পে দিনটা কেটে গেল। রাত এলে আবার উপরের বার্থে যেতে

হবে। কাজেই রাত সাড়ে আটটায় বিজয়ওয়াদায় পৌঁছলে রাতের খাবার দিয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে কতক্ষণে ভোর হবে আর আমরা মাদ্রাজ পৌঁছাবো। ভোর পাঁচটায় ট্রেন মাদ্রাজ পৌঁছবে সুতরাং তার আগে উঠে আমরা তৈরী হয়ে নিলাম।

সময়মত ট্রেন পৌঁছলো মাদ্রাজ ষ্টেশনে। ষ্টেশনটি বিরাট ও খুব পরিচ্ছন্ন মনে হল। ট্যাক্সি কোরে এগমোর ষ্টেশনে গেলাম। এখান থেকে ট্রেনে পণ্ডিচেরী যেতে হবে। ঘুমন্ত মাদ্রাজ শহরের একটুখানি দেখলাম। একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে কখন ছাড়বে ঠিক নেই। সুতরাং আমরা প্রাতরাশ সারতে রেলওয়ে ক্যান্টিনে গেলাম। একটু পরেই শুনলাম ট্রেন তখুনি ছাড়বে। নতুন খাবার মাদ্রাজী ধোসা আলুমটর সহযোগে আর নিশ্চিন্তমনে খাওয়া হল না। কোন রকমে গলাধকরণ করে ছুটে এসে ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনটা প্রথমে সব ষ্টেশনে থামছিল না পরে প্রত্যেক ষ্টেশনে থেমে অনেক দেরী করছিল। এক তামিল পরিবার ট্রেনে আমাদের সহযাত্রী হলেন। তাদের সাথে আলাপের চেষ্টা করলাম। ভদ্রলোক ইংরেজী বোঝেন কিন্তু মেয়েরা বোঝেনা, তারা হেসেই অস্থির। তারাও বোঝাতে চায় কিন্তু পারে না। আমাদেরও সেই অবস্থা। দু একটা ফল দেখিয়ে তার নাম ওদের ভাষায় জেনে নিলাম। ভাষা বুঝিনি, তবে তাদের হাবভাবে মনে হল এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির ও ব্যবহারে অমায়িক। খুব সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ, তবে সোনার গয়না, যা পরে এরা, ওজনে বেশ ভারী। কান তো গয়নার ভারে ছিঁড়ে পড়ার অবস্থা। গলায় বেশ ভারী হার আর বিবাহিতাদের আছে মঙ্গলসূত্র। আমাদের মতো শাঁখা-সিন্দুর নেই। ঐ মঙ্গলসূত্রই ওদের এয়োতির চিহ্ন। হাসিগল্পে সময় কাটছে বটে কিন্তু আমাদের শরীর যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কতক্ষণে পণ্ডিচেরী পৌঁছতে পারবো, এই চিন্তাই তখন অস্থির করে তুলেছে। আমরা টিণ্ডিভানম ষ্টেশনে নেমে বাসে করে পণ্ডিচেরী রওনা হলাম। ওদের ভাষার জন্য প্রতিপদেই অসুবিধা, ওখানে তামিল ছাড়া অন্য কোন ভাষা কোথাও লেখা থাকে না, এমন কি ইংরেজীও নয়।

বিকেল ৩টায় আমরা পণ্ডিচেরী পৌঁছলাম। স্নান খাওয়া সেরেই শ্রীঅরবিন্দের সমাধি দর্শনে গেলাম। আশ্রমের গেট দিয়ে ঢুকতেই মনটা ভরে গেল আশ্রমের সুন্দর, নীরব পবিত্র পরিবেশে। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধে

ভরপুর সমাধি। মনে হয় এরই মধ্যে ঋষি আজও বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে। সমাধিক্ষেত্রটি এমন যে, যে কোনভাবেই এখানে এলে মন ভক্তিতে ভরে ওঠে। একটি মেয়ে ফুল আর ধূপকাঠি নিয়ে বসে আছে; তার কাছে গেলেই কিছু ফুল ও ধূপকাঠি পাওয়া যায়; তার জন্য দক্ষিণা দিতে হয় না; আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগল। সকলেই ফুল ও ধূপ জ্বেলে সমাধিতে দেয়। আমরাও ফুল দিয়ে প্রণাম জানালাম। তারপর প্রণাম জানালাম শ্রীমায়ের উদ্দেশ্যে। তিনি সমাধির পাশেই তিনতলার ঘরে সমাধিমগ্ন।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গেলাম। সমুদ্রের পারে গিয়ে কী যে ভালো লাগল, বোঝাতে পারবো না। পণ্ডিচেরী বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। সমুদ্র শহরের আরো কাছে না আসে তারজন্য সাবধানতার শেষ নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই ফেলে রাখা হয়েছে, যার উপর ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ে। শহরকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য উঁচু দেয়াল করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের পাশেই চওড়া রাস্তা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, একদিন পণ্ডিচেরী ফরাসীদের রাজত্বে ছিল, আর তাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন বাংলার বিপ্লবী বীর সন্তান শ্রীঅরবিন্দ। এখানেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, আর তার গর্জনে চিন্তায় বাধা পড়ে। সমুদ্রকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, তবু সন্ধ্যে হয়েছে, শরীরও বড় ক্লান্ত লাগছে; সেদিনের মত ফিরে এলাম।

পরদিন ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর ঘর খুলে দেওয়া হবে সাধারণের জন্য। ভোরবেলায় আশ্রমের কাছাকাছি এসে দেখলাম, ইতিমধ্যে অনেক লম্বা লাইন হয়ে গিয়েছে। আমরা তৃতীয় সারির পেছনে স্থান পেলাম। একটু পরে দেখি আমাদের পেছনে আরও কয়েকটি লাইন হয়ে গেছে। লাইনে দেখলাম, প্রায় সারা ভারতের লোক আছে, তাছাড়া বাইরের দেশের লোকও আছে। এত লোকের সমাবেশ কিন্তু টু শব্দটি নেই। এক পা একপা করে গেট পর্যন্ত এগোতে আমাদের ৩ ঘণ্টা কেটে গেছে। যা হোক এক সময় সেই সাধনপীঠে পৌঁছলাম। পবিত্র ঘরটি যেন দেবতার মন্দির। ধূপ আর ফুলের গন্ধে এক স্বর্গীয় ভাবে পরিণত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীমায়ের দুখানি খুব বড় ছবি সেখানে আছে, আর আছে তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র। খুবই ভালো লাগল; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না; কারণ আরও বহু লোক আসবে।

সেদিন দুপুরবেলায় আমাদের আশ্রমের ডাইনিং হলে খাবার ব্যবস্থা। সেখানে গিয়েও দেখি লাইন। তবে এবারে গেটের কাছেই স্থান পেলাম। লাইন এক সময় এগিয়ে নিয়ে এলো যেখানে সেখান থেকে থালা নিলাম। আরও একটু এগিয়ে দেখি ভাত, ডাল, তরকারি নিয়ে বসে আছেন আশ্রমেরই ছাত্র ও কর্মীরা। থালাতে ভাত, তার ওপরে বাটিতে ডাল, তরকারী আর একবাটী দই ও কলা পেলাম। সবাই যে যার নিয়ে বসে যাচ্ছে। বসার ব্যবস্থাও সুন্দর। বারান্দাতে আসন পাতা তার সামনে ছোট জলচৌকি বসান। লনে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থাও আছে। বিরাট নেমন্তন্ন বাড়ীর মত নেই কোন গোলমাল হুড়োহুড়ি। আমরা বাংলাদেশের লোকেরা যে এত শান্ত ও ভদ্র হতে পেরেছি সে বোধহয় ঐ জায়গার গুণে। খাওয়ার পরে প্রত্যেকে যার যার থালা গেলাস নিয়ে গেলাম। কলের কাছাকাছি যেতেই একজনে বাটিকটা ও গেলাস নিয়ে নিল, তারপর থালাও। একদলে থালা বাটি মেজে ধুয়ে দিচ্ছে আর একদলে সেগুলো শুদ্ধজলে শোধন করে মুছে দিচ্ছে। সবাই যেন মেশিনের মতো নীরবে কাজ করছে। এরা সকলেই আশ্রমের ভক্ত কর্মী। অনেক বয়স্ক লোকও আছেন এই সব কাজে। আশ্রমের কাজই হল শ্রীমায়ের কাজ। এইভাবেই মায়ের সেবা করা হচ্ছে, তাদের বোধহয়, এই মনোভাব।

এইদিনই বিকেল ৬টা ১৫ মিনিটে শ্রীমায়ের দর্শন দেওয়ার কথা। আমরা গিয়ে শুনেছিলাম সেবার হয়ত দর্শন দেবেন না। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য। কিন্তু ঐদিন সকালে শুনলাম মা দর্শন দেবেন। এতদূর থেকে গিয়ে মায়ের দর্শন পাব না জেনে মনটা যেমন বিচলিত হয়েছিল দর্শন দেবেন জেনে আরও বেশী আনন্দ হল। ৪-৩০ নাগাদ আমরা দর্শনের উদ্দেশ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানেও ২।৩ হাজার লোক সমবেত হয়েছে ইতিমধ্যে। মা তাঁর বাড়ীর তিন তলার বারান্দায় কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়াবেন। নীচে খোলা জায়গা নেই, শুধু মাত্র চওড়া রাস্তা। এত লোকের সমাবেশ অথচ কোন গোলমাল নেই। সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছে ৬-১৫ মিনিটের জন্য। খানিক পরে হঠাৎ মেঘ হ'ল আর ঝমঝম করে বেশ বড় বড় ফোঁটা নিয়ে বৃষ্টি এল। দু-একজন একটু ছুটোছুটী করলো, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকলো। ওখানকার বাড়ীগুলো একটু ভিন্ন ধরনের, কোন বাড়ীতে রক বা বারান্দা নেই। সুতরাং যারা ছুটোছুটী করলো তারাও কম

ভিজলো না। বোধহয় দেবদর্শনের আগে স্নান হল। ঠিক ৬-১৫ মিনিটে মা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালেন বারান্দার রেলিংয়ের ধারে। শরীর খুবই দুর্বল বয়সের ভারে দাঁড়াতে পারছেন না তবু রেলিং ধরে একবার এদিক একবার ওদিক গেলেন যাতে সকলে তাঁকে দেখতে পায়। আগে যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, ছবিতে দেখেছি, সেবারে তা পারলেন না। মাকে দেখার আনন্দে তাঁকে প্রণাম জানাতে মনে ছিল না। যখন মনে পড়ে প্রণাম জানালাম চেয়ে দেখি তিনি সরে গেছেন। এই দর্শনই যে তাঁর শেষ দর্শন হবে সেদিন তা কেউ বুঝতে পারেনি। তার কিছুদিন পরেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এর পরেও কয়েকদিন পণ্ডিচেরীতে ছিলাম। আশ্রমের কাজকর্ম ২।৪ দিনে দেখে শেষ করা যায়না। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীমায়ের সহায়তায়। সব দায়িত্ব মায়ের উপর ছিল। আশ্রমের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম, সব কিছুর উপর মায়ের প্রভাব ছিল। সব কাজেই মা নিজেকে কীভাবে নিয়োগ করেছিলেন ভাবতে বিস্ময় লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দকে, বিবেকানন্দ যেমন নিবেদিতাকে, শ্রীঅরবিন্দ তেমনি শ্রীমাকে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ কোরতে। আজ মা মরদেহে নেই, কিন্তু কোন কিছুতেই নাকি তাঁর অভাব বোঝা যায় না। তাঁর অদৃশ্য শক্তি একইভাবে পরিচালিত করছে আশ্রমকে।

আশ্রমের কথা বলে শেষ করা যায় না। একদিন বিভিন্ন দেশীয় ছেলে-মেয়েদের ব্যায়াম ও খেলাধূলা দেখলাম। ৮০।৯০ বছরের বৃদ্ধেরাও ব্যায়াম করেন নিয়মিত। মেয়েদের লেখাপড়া কাজকর্মের সাথে বিকেল ৪টার সময় খেলা ও ৬টার সময় সমুদ্র স্নানও রুটিন বাঁধা। ভোর থেকে ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে তাল রেখে কাজ হয়। তার ফলে তাঁরা সারাদিন প্রচুর কাজ করতে পারেন। ওখানে যারা ছোটবেলা থেকে থাকে তাদের পড়াশুনার জন্য বাবা-মাকে ভাবতে হয় না। ওখানেই লেখাপড়া শেষ করে ওখানেই তারা কাজ করার সুযোগ পায়। এদের জন্য বাড়ী, গাড়ী, খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ডাক্তার লণ্ড্রী সবই ফ্রি। এদের টাকাপয়সার প্রয়োজনও বোধ হয় কম। আরও কতো বলার আছে, কতো জানার আছে, অনুভব করার আছে আশ্রমজীবন সম্পর্কে তা বাকী রয়ে গেল।

স্বামিজী বন্দনা

[করিমপুর থানা স্বামিজী সেবক সংঘ কর্তৃক স্বামিজীর ১১৯ তম জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত ও পঠিত ৮।২।৮১]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত

ভুবন নন্দিত, বিশ্ব ঝঙ্কৃত, তব দত্ত চেতনায়।
ঘুমন্ত ভারত, হইল জাগ্রত, তব ধ্যান সাধনায়॥
ভারত আত্মার, নব জন্মদাতা, হে বীর সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার জনমে, ধন্য হইল, এ বঙ্গ ভারতভূমি॥
মহা ভারতের, মহা জ্যোতিষ্ক, মহাত্যাগী মহা সূর্য্য।
বল বীর্য্য হারা, এ জাতির প্রাণে, এনে দিলে বল বীর্য্য॥
বিশ্ব ঘরে ঘরে, সবারি অন্তরে, জ্বেলে দিলে জ্ঞানদীপ।
মহা মিলনের, মহা মন্ত্রদাতা, পরালে মিলনটিপ॥
তব মধুমাখা, বেদান্তের বাণী, বিশ্বের সভাতল।
প্রাচ্যের প্রাণে জাগিল চেতনা, পশ্চিম টলমল॥
পাষাণ মানবে, জাহ্নবী যেমতি, প্রাণ সঞ্চারিল দেহে।
সেইমত তব, করুণার ধারা, ঢালিয়া পরম স্নেহে॥
পাষাণ সম, অচল জাতির, দেহে দিলে নব প্রাণ।
তোমার রুদ্র, বহ্নি শিখায়, হল সবে বলীয়ান॥
মহা বিশ্বের, মহান্ রুদ্র, মহা ভৈরব তুমি।
তব জ্ঞানালোকে, আলোকিত হ'ল, সোনার ভারতভূমি॥
পরম পুরুষ, রামকৃষ্ণের, অন্তরের মহামণি।
তব মুখ হ'তে, বাহির হইল, তাঁহারি অমৃতবাণী॥
জ্বলন্ত উল্কারমত, তব আবির্ভাব, মানব উদ্ধার হেতু।
বিদ্যুৎসম, কর্ম গতি নিয়ে, বাঁধিলে প্রেমের সেতু॥
মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি মহাবীর, মৃত্যুরে করি জয়।
মাভৈঃ মন্ত্রে, দীক্ষা দানিলে, তোমার বিশ্বময়॥

নির্ভিক তুমি, সাত্বিক তুমি, সত্যের ধ্রুবতারা।
ভ্রান্ত অন্ধে, দেখালে পন্থা, যারা ছিল পথহারা ॥
বিজয় শঙ্খ, বাজাইলে তুমি, কোন সে মোহন বাঁশী।
স্তব্ধ হইল, মুগ্ধ হইল, ঐ সে চিকাগোবাসী ॥
দিগ্ দিগন্তে, ঘোষিত হইল, জয়তু স্বামীজি জয়।
সর্ব ধর্ম সমন্বয় হেতু, তোমার অভ্যুদয় ॥
হিমাচল সম, ধ্যান গম্ভীর, সৌম্য শান্ত-মূরতি।
হেরিলে সবার, জুড়ায় পরাণ, প্রাণে জাগে মহা শকতি ॥
তুমি বিধাতার মঙ্গলদূত, জীবের মঙ্গল লাগি।
যুগে যুগে তাই, এসেছ ধরায়, সোনার স্বর্গত্যাগী ॥
হে মহান ঋষি, হে মহা তপস্বী, প্রাণে প্রাণে দাও শকতি।
দাও শুদ্ধা প্রেম, দাও ভালবাসা, দাও নিষ্ঠা, দাও ভকতি ॥
শ্রদ্ধা জানাই, ভকতি জানাই, প্রণাম জানাই চরণে।
তব অমৃতবাণী, চির শাশ্বত জানি, আজীবন রাখি স্মরণে ॥

প্রজাপতির আসর

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্র (২৮) বি. এস. সি, মেটালর্জিক্যাল ও কেমিক্যাল কেমিষ্ট (ট্রেণ্ড), সুস্বাস্থ্য, রেলওয়েতে কর্মরত (৫৭৫) কলিকাতার উপকণ্ঠে নিজস্ব বাড়ী। পিতাও রেল কর্মী। সুন্দরী সুগঠনা অন্ততঃ H. S. পাশ পাত্রী চাই। —শ্রীসত্যরঞ্জন দেব, ৭৩ জোনিক্স রোড, বেলুড়, হাওড়া।

পাত্রী (২৭) (৫'-২"), এম. এ. সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, গৌর বর্ণা, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও স্মার্ট, গৃহকর্ম সূচী ও বুননশিল্পে নিপুণা, বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় কথোপকথনে পারদর্শিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই —শ্রী এস. কে. নাথ প্রযত্নে এস. কে দালাল, ২নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬।

পাত্রী (২৬) এম. এস. সি। কলিকাতায় ব্যাঙ্কে কর্মরতা। প্রখ্যাত সমাজ সেবীর কন্যা। উপযুক্ত পাত্র চাই। আসর পরিচালক. ২৩/১ ফীয়ার্স লেন, কলি-১২।

পাত্র (২৯); টেলিকম্ ইঞ্জিনীয়ার। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত (১৬০০), পিতাও কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড অফিসার। উপযুক্ত পাত্রী চাই—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, ১ ব্যাপারী টোলা লেন, কলি১৩।

পাত্রী (২৬), হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, শ্যামবর্ণা, উত্তম মুখশ্রীযুক্তা, স্বাস্থ্যবতী, নম্রস্বভাবা। উপযুক্ত পাত্র চাই—ডাঃ এস. ডি. দেবনাথ, হোমিও ল্যাবরেটারী, হাওড়া সাবওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১।

পাত্র (২৭), (৫'-৭"), বি. কম, বেসরকারী চাকুরিয়া, অন্য আয়ও আছে। স্বাস্থ্যবান, বনেদী পরিবার। উপযুক্ত পাত্রী চাই—শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ। মনীন্দ্র ভাণ্ডার, ৫৭এ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলি-৭০।

পাত্রী (২৬), এইচ এস অনুত্তীর্ণা, শ্যামবর্ণা, ব্যাংক অফিসারের প্রথমা কন্যা। উত্তম মুখশ্রী যুক্তা, অতীব শান্ত স্বভাবা, স্বাস্থ্যবতী। গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। ব্যবসায়ী বা চাকুরে পাত্র চাই। শ্রীরাসবিহারী নাথ, স্কুল বাগান, বোলপুর, বীরভূম।

পাত্রী (১৯), মাধ্যমিক পরীক্ষার্থিনী, রবীন্দ্র সঙ্গীতে ডিপ্লোমা প্রাপ্তা। পাত্রী খুলনার বুধহাটা নিবাসী ৺কালিদাস নাথের পৌত্রী। ব্যবসায়ী বা চাকুরিয়া পাত্র চাই। শ্রীবিমলকুমার নাথ, ৪৪ সি রাণী হর্ষমুখী রোড, কলি-২

পাত্রী (২৬), ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ। গৌরবর্ণা, প্রিয়দর্শিণী, গৃহকর্মে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীমতী রেবা নাথ, ঈশান দালাল রোড, পোঃ বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

পাত্র (৩০), বি. এ. পার্ট ওয়ান, কো-অপারেটিভ ফার্মে কর্মরত। নিজস্ব বাড়ী ও জমি। স্বাস্থ্য মাঝারি। উপযুক্তা পাত্রী চাই—শ্রীবাবুল নাথ, বরিশাল পল্লী, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা।

পাত্রীদ্বয় বি. এ. পাশ। বয়স যথাক্রমে ২৩ এবং ২৫ বছর। ফর্সা, উত্তম মুখশ্রী যুক্তা, গৃহকর্মে নিপুণা। শিক্ষিত পরিবার। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীপ্রবীর দেবনাথ, স্কুল বাগান, বোলপুর, বীরভূম।

পাত্রী (২২) (৫'-৪"), বি. এ. গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা। নম্র স্বভাবা। চাকুরে পাত্র চাই—শ্রীমতি কমলা দেবনাথ, তাহেরপুর বি. ২৯, পোঃ তাহেরপুর, নদীয়া।

পাত্রী (২২) (৫'), দশম মান, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত স্বভাবা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। উপযুক্ত পাত্র চাই—শ্রীকার্তিক দেবনাথ, দি রিলায়েবেল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্, ১৩৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩।

পাত্র (২৭) (৫'-১০"), বি. কম, টুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে অফিসার (chief) (১৪০০), স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, ভুবনেশ্বরে কর্মরত। ফর্সা সুন্দরী স্মার্ট পাত্রী চাই—শ্রীমন্ত মোহন নাথ, হাটথুবা, ২৪ পরগণা, ৭৪৩২৬৯।

পাত্র B. Sc. পাশ ৩০ বৎসর বয়স্ক নিজ ব্যবসায়ে লিপ্ত যুবকের জন্য (৬' লম্বা) শিক্ষিতা সুন্দরী পূর্ববংগীয় পাত্রী চাই। পত্রালাপ করুন। শ্রীমতী কুন্তলতা নাথ, c/o অধ্যাপক ৺অমৃতলাল নাথ, রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদা, ৭৩২১০১।

পাত্রী (২০) (৫'-২") বি. এ. ফর্সা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, রুচীশীলা এবং পাত্রী (২২) (৫'-২"), বি. এ. সুগায়িকা, মধ্যম বর্ণা, স্মার্ট, স্বাস্থ্যবতী, রুচীশীলা। উপযুক্ত পাত্র চাই—সুহৃদ দেবনাথ, ২০৭/১৬২ বি. টি. রোড, কলি-৩৬।

পাত্রী (২০) (৫'-১"), ১২ ক্লাসে পাঠরতা স্বাস্থ্যবতী, ফর্সা, সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা, রামকৃষ্ণ ভক্ত পরিবারের পাত্র হইলে ভাল হয়। জি. সি. নাথ, c/o "রূপায়ন", ১৭০ ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী রোড, কলি-৮৫।

পাত্র (৩২) বি. এস্ সি মান, ওয়্যারলেস অপারেটর (পোলিশ) (৭০০), স্বাস্থ্যবান, কলিকাতায় বাড়ী। উপযুক্ত পাত্রী চাই এবং

পাত্রী (২৫) ৫'-২"), পি ইউ অনুত্তীর্ণা, সঙ্গীতে একাধিক ডিপ্লোমা প্রাপ্তা, ফর্সা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী, শান্ত স্বভাবা। উপযুক্ত পাত্র চাই—গুরুপদ ভৌমিক, ২০৭/৫৪ বি. টি রোড, কলি-৩৬।

পাত্রী সুন্দরী বয়স ২৯ বৎসর M. A. (Pol. Sc.), B. Ed. নৃত্যগীত পটিয়সী। সাংসারিক কার্য্যে পারদর্শিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীরামপদ দেবনাথ, নিউ ব্যারাকপুর, হরেন্দ্র মুখার্জী রোড, পোঃ নিউ ব্যারাকপুর, জিঃ-২৪ পরগণা।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা। আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত এক টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত হয়। রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ, দত্তঘাট, পোঃ চুঁচুড়া, জিলা—হুগলী

৭। গ্রাহক চাঁদা ও অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ

৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত এক টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৮

সম্পাদক—অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

ব্রহ্মাকৃত-শ্রীশিব-স্তোত্রম্

নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষু ষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥

নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রে লোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥

নমঃ সুরাধিনাথায় সোমসূর্যাগ্নিচক্ষু ষে।
ব্রহ্মণে চৈব রুদ্রায় বিষ্ণবে চৈব তে নমঃ॥

নমঃ সংখ্যায় যোগায় ভূতানাথয়ে বৈ নমঃ।
কপর্দ্দিনে কপালায় শঙ্করায় হরায় চ॥

বিরূপায় সুরূপায় শিবায় বরদায় চ।
ত্রিপুরঘ্নে মথঘ্নায় মাতৃনাং পতয়ে নমঃ॥

বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ।
লোকত্রয়বিধাত্রে চ শক্রস্থ বরদায় চ॥

অগ্রায় চ তথোগ্রায় ব্যাগ্রায়া নেক চক্ষু ষে।
রজসে চৈব সত্বায় তমসে অব্যক্তযোনয়ে॥

অনিত্যায় চ নিত্যায় নিত্যানিত্যায় তে নমঃ।
ব্যক্তায় চৈবাব্যক্তায় ব্যক্তাব্যক্তায় তে নমঃ॥

অচিন্ত্যায় চ চিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় নমঃ।
অসূক্ষ্মায় চ সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মাসূক্ষ্মায় তে নমঃ॥

ভক্তানাং আর্তিনাশায় প্রিয়নারায়ণায় চ।
উমাপ্রিয়ায় শর্বায় গণাধিশায় তে নমঃ ॥

পক্ষমাসার্দ্ধ পক্ষায় ঋতুসম্বাৎসরায় চ।
বহুরূপায় মুক্তায় দণ্ডিনেহ্থ বরূথিনে ॥

রথিনে ধ্বজিনে চৈব জটিনে ব্রহ্মচারিণে।
ঋগ্‌যজুঃ সামরূপায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥

ইত্যেবমাদিচরিতৈঃ স্তুতিস্তুত্য নমোহস্তু তে ॥

ইতি ব্রহ্মাকৃত-শ্রীশিব-স্তোত্রম্

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা-১২ হইতে ২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কালীমন্দির নিবাসী প্রবীণ সমাজ-সংস্কারক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র ৺শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে—

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা

নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

"সন্তান বাৎসল্য ও পিতৃভক্তি"

রচনাটি যেন কোনমতেই শৈবভারতীর চার পৃষ্ঠার অধিক না হয়।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৮

পুরস্কার প্রাপকদের নাম ও তাহাদের রচনা আগামী অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যায় ছাপা হইবে।

প্রথম পুরস্কার—পঞ্চাশ টাকা ★ দ্বিতীয় পুরস্কার—পঁচিশ টাকা

সম্পাদকীয়

হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতি অরণ্য-সম্ভব। অরণ্যেই প্রথম বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল ঋষিদের কণ্ঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে তার প্রসার ও প্রচার ঘটেছিল মঠ, মন্দির, গুহা, আশ্রম প্রভৃতি দেবস্থানকে আশ্রয় করে। সমগ্রভারত ও সন্নিহিত রাষ্ট্র বাংলদেশ, পাকিস্থান ও নেপাল এই সব হিন্দু মঠ-মন্দিরের সংখ্যা কত তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হিসাব অনুযায়ী এদের সংখ্যা লক্ষাধিক। গত এক হাজার বৎসর ধরে এদের উপর বহিরাগত বিধর্মীদের আক্রমণ হয়েছে বার বার; তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বহু মঠ, মন্দির ও বিহার। তবু খৃষ্টানদের ভজনালয় বা গীর্জার ন্যায় এরাই অব্যাহত রেখেছে হিন্দু ধর্মের প্রবাহটিকে যুগ যুগ ধরে। জনসাধারণের মধ্যে আজও ধর্ম-ভাবের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা টিকে আছে এইসব দেবস্থানকে আশ্রয় করেই।

বিপুল সংখ্যক এইসব মঠ-মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থস্থানে অবস্থিত অতি অল্প কয়েকটিরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। অগণিত সংখ্যক বাকী মঠ-মন্দিরগুলির অবস্থা কিন্তু খুবই নৈরাশ্যজনক। খৃষ্টান ভজনালয়গুলির ন্যায়, সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ অর্থানুকুল্য এদের পেছনে নেই, ফলে এদের অধিকাংশগুলিই বর্তমানে অর্থাভাবে দীন, সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। মুষ্টিমেয় ভক্ত বা তীর্থযাত্রীর প্রণামীর উপর নির্ভর করে কোন মতে টিকে আছে মাত্র।

এইসব মঠ-মন্দিরের মধ্যে মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ ও তাঁদের অনুগামী নাথ-যোগীদের প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত মঠ-মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য নয় ভারতের এমন কোন অঞ্চল বা প্রদেশ নেই যেখানে নাথ-যোগীদের মঠ, মন্দির, আশ্রম, গুহা বা টীলা দেখা যায় না। এমন কি ভারতের

বাহিরে—নেপাল, তিব্বত, আফ্‌গানিস্থান, ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ ও পাকিস্থানেও নাথ-পন্থীদের বহু মঠ-মন্দির বিদ্যমান। এইসব মন্দিরে শিব, কালী, ভৈরব, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের বিগ্রহ বা পাদুকা প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এইসব মঠ-মন্দিরে এসে ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়। বিশেষ তিথি-উপলক্ষ্যে এইসব স্থানে মেলা-মানৎ চলে।

এইসব নাথ মঠ-মন্দিরগুলির আর্থিক অবস্থা সাধারণ হিন্দু মন্দিরগুলির অনুরূপ। মুষ্টিমেয় কয়েকটি, যেমন উত্তর প্রদেশের গোরখপুরস্থিত 'গোরক্ষনাথ মন্দির,' হরিয়ানার 'বোহর মঠ,' কচ্ছে 'ধীনোধর নাথের মঠ', বিঠ্‌ঠলে 'যোগাশ্রম মঠ'. নেপালের 'মৃগস্থলী', হরিদ্বারের 'ভেষ বারহ পন্থেব মন্দির' প্রভৃতি অর্থসম্পদে স্বচ্ছল। বাকী কয়েকশত মন্দির অর্থাভাবে দীন ও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ।

পশ্চিমবাংলার নাথ-যোগীদের মঠ-মন্দিরগুলির চিত্রটিও কিন্তু সর্বভারতীয় চিত্রেরই একটি ক্ষুদ্র অনুকৃতি। সমগ্র পশ্চিমবাংলায় অন্যূন ত্রিশটি মঠ, মন্দির বা দেবস্থান আছে যেগুলি হয় নাথ-যোগীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কিম্বা যাদের সেবাইত নাথ-যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ। মুখ্য মন্দিরগুলির মধ্যে দমদমের নিকটবর্তী 'গোরক্ষবাসলী' বা 'গোরক্ষবাসী মঠ', হুগলী জেলার মহানাদে 'জটেশ্বর শিব মন্দির', মেদিনীপুরের পাশকুড়ার নিকটবর্তী 'সিদ্ধকুণ্ড ও সিদ্ধনাথের মন্দির' উল্লেখযোগ্য। চুনাগলির তিনশতাধিক বৎসরের প্রাচীন কালীবাড়ীটিও উল্লেখের দাবী রাখে। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত মন্দিরগুলি ছড়িয়ে আছে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন জেলায়। বীরভূম জেলার নন্দীগ্রামে জনৈক নাথ-যোগীর সমাধি, বক্রেশ্বরের 'বক্রনাথ' বাঁকুড়া জেলার বেহুলা-ডিতে অবস্থিত 'সিদ্ধাচার্য মন্দির ও নাথ-সিদ্ধ শিব-লিঙ্গ', হুগলী জেলার মহানাদের নিকটবর্তী দাসপুর ও দাবড়া গ্রামে নাথ-যোগী বংশীয়দের প্রতিষ্ঠিত মন্দির মণিরাম পুরের ধর্মঠাকুর, হাওড়া জেলার বেলুড়ের নিকটবর্তী সকীপুরে গোরক্ষনাথের মর্মর মূর্তিসহ যোগাশ্রম, বাউরিয়া গ্রামে নাথ মঠ, খুরট গ্রামে ধর্ম-ঠাকুর ও শীতলা দেবী,

২৪ পরগণার বড়শী মাধবপুরে 'বদরিনাথ মন্দির', দমদমে নাগের বাজারের নিকটে ঘাটগাছি-তে 'কালী মন্দির', কলিকাতার মানিকতলা ও মীর্জাপুরে শীতলা মন্দির, উল্টোডাঙ্গায় পদ্মনাথ প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির প্রভৃতি হয় নাথ-যোগীদের প্রতিষ্ঠিত অথবা নাথ-যোগী সেবাইত কর্তৃক পরিচালিত।

কিন্তু এদের সবক'টিরই আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। এমন কি, মহানাদে জটেশ্বর শিবের যে নিত্য পূজা হয়, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত অর্থাভাবে ভোগ নিবেদন হতো না। এইসব মঠ, মন্দির, দেবস্থানগুলি কোথাও কোথাও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ, কোথাও বা ধ্বংস প্রাপ্ত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় ভক্তের প্রণামীতে পূজা বা উৎসবাদি সম্পন্ন হয়।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসাবে যদি আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাই, তবে এইসব মঠ মন্দিরগুলির সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। স্বজাতীয় সকলের নিকট রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আবেদন তাঁরা যেন এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে অবস্থিত মঠ-মন্দিরগুলির জন্য যথাসাধ্য অর্থানুকুল্য করেন।

যোগ ও যোগী

ব্রহ্মচারী গোরক্ষ নাথ শাস্ত্রী

আমাদের দর্শন-শাস্ত্রগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা দেখি, সাংসারিক জন্ম মরণাদি দুঃখ নিবৃত্তি এবং অন্তে পরম পদ প্রাপ্তির উপায় হিসাবে যোগ শাস্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয় দর্শন নেই। বাস্তবিক পক্ষে, যোগজ-ধর্ম খুবই উৎকৃষ্ট বস্তু। ইহার প্রভাবে মহর্ষি বিশ্বমিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য এক দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মান করেছিলেন। এই ধনে ধনী বশিষ্ঠ মহারাজ দিলীপের সন্তান না হওয়ার অদৃশ্য কারণ বলে দিয়েছিলেন। এই অজেয় শক্তির বলে বলীয়ান হঠ-যোগ প্রবর্তক যোগাচার্য শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীগোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধদের অমিত প্রভাব আবাল-বৃদ্ধ সকলের অন্তরে অঙ্কিত হয়ে আছে। তাঁদের যশ অদ্যাপি সূর্যের প্রভার ন্যায় দেদীপ্যমান। এই যোগ-শাস্ত্রের কৃপায় ভক্তি ও মুক্তি দুই-ই সহজে লাভ করা যায়। সনাতন পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করার শক্তিও যোগাভ্যাসের দ্বারা লাভ করা সম্ভব।

অধিক কি, স্বয়ং শ্রীআদিনাথ মহেশ্বর ভগবতী ভবানীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, সকল প্রকার কল্যাণ সাধনে যোগই শিরোমণি বা সর্বোত্তম।

স্বামী শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী সকল সাধনের মূল এবং সর্বোৎকৃষ্ট সাধনরূপে যোগকেই স্বীকার করেছিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, বেদব্যাস পুত্র শুকদেব পূর্বজন্মে এক বৃক্ষের শাখায় লুক্কায়িত থেকে ভগবান শিবের মুখ-নিসৃত যোগোপদেশ শ্রবণ করে পক্ষী যোনি থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং পরজন্মে যোগী হয়েছিলেন। যোগোপদেশ শ্রবণেরই যদি এই ফল হয়, তবে যোগ-সাধনায় ব্রহ্মানন্দ ও সর্বসিদ্ধি লাভ হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যোগের বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—অবিদ্যায় বদ্ধ হয়ে আত্মা জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তিন তাপের অধীন হয়। এই তাপ থেকে মুক্তির উপায় হলো যোগ। যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির মায়াজালকে জানা যায় না। যিনি যোগী তাঁর কাছে প্রকৃতি তার মায়াজাল বিস্তার করতে পারে না। ঐ যোগী পুরুষে প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি লীন হলে সেই পুরুষ আর পুরুষপদ বাচ্য থাকেন না। তখন তিনি আত্মা নামে সৎস্বরূপে অবস্থান করেন। এই সৎস্বরূপে অবস্থান করায় বলে যোগকে শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হয়। যোগ ধর্ম-জগতের একমাত্র পথ। এই যোগ বিহীন সাংসারিক জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে অজ্ঞান। এতে কেবল সুখ-দুঃখেরই অনুভব হয়, মুক্তির-পথে চলার সহায়ক হয় না। পরম যোগী মহাদেব বলেছেন—

"যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদম্, ভগবতীশ্বরী।"

—হে পরমেশ্বরী, যোগবিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদায়ক হবে?

শিব সর্বদা পার্বতীকে যোগের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। যথা—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোঽপি ধর্মজ্ঞোঽপি জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা যোগেন দেবোঽপি ন মুক্তিম্ লভতেপ্রিয়ে॥
(যোগবীজ)

—হে প্রিয়ে, জ্ঞান নিষ্ঠ, সংসার-বিরক্ত, ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় বা কোন দেবতাও যোগ ব্যতিরেকে, মুক্তিলাভ করতে পারেন না। যোগরূপ অগ্নি সকল পাপরাশি দগ্ধ করে দেয় এবং যোগ সাধনার দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানেই লোক দুর্লভ নির্বাণ-পদ লাভ করে। যোগানুষ্ঠান দ্বারা সমাধি-অভ্যাস পক্ক হলে অন্তকরণের মালিন্য-দোষের নিবৃত্তি হয়। তখন বিশুদ্ধ অন্তকরণে আত্মদর্শন হওয়া মাত্রই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। ফলে স্বতঃই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বিচরণশীল হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বীর্যদৃঢ় হয় না। চিত্তও স্থির হয় না এবং চিত্তের ধ্যেয়াকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। ততক্ষণ পর্যন্ত যে জ্ঞান তা মিথ্যা

প্রলাপ মাত্র। উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্য বশীভূত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানের উদয় হয় না। কিন্তু চিত্ত তো সর্বদা চঞ্চল। কিভাবে চিত্ত স্থির হবে? উত্তরে শাস্ত্র বলছে—"যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্ যোগো মর্যৈকচিত্ততা।" যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগাভ্যাসেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তের একাগ্রতা হলেই জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন এবং আত্মা বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সেই সঙ্গে যোগ বলে অমানুষিক ক্ষমতাও লাভ হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন কেবল অলৌকিক শক্তি লাভের অভিলাষে যোগসাধনা করা উচিত নয়। দেশ, সমাজ ও জাতির মধ্যে প্রশংসাও অবশ্যই লাভ হয়। কিন্তু যে এই সবই চায়, সে ঐ সবই পায়। অতএব, ব্রহ্মকে লাভ করার উদ্দেশ্যেই যোগ-সাধনা করা উচিত।

সম্প্রতি এই বিনাশোন্মুখ জড় যুগে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈর্ষা, কলহ প্রবলরূপে বর্তমান যার ফলে প্রত্যেক মানুষ অপরকে হীন করতে সচেষ্ট। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় যোগ-সাধনার দ্বারাই সকল প্রাণীর কল্যাণ সাধন সম্ভব। ইহা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।*

* 'নাথ-সন্দেশ' মার্চ-১৫,'৮১ সংখ্যা থেকে শ্রীমতী শাশ্বতী নাথ কর্তৃক অনূদিত

কর্ণাটকে নাথ-সম্প্রদায়

ডঃ এম. এস. কৃষ্ণমূর্তি

'ভক্তি দ্রাবিড় উপজী'—এই উক্তিতে কবীর ভক্তির উৎপত্তিস্থলের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ভাগবত মাহাত্ম্যে ভক্তির বর্ণনা আছে। তদানুসারে ভক্তি দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন এবং কর্ণাটকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। উৎপন্না দ্রাবিড়ে সাহং বৃদ্ধি কর্ণাটকে গতা-ভা. মা ২।৪৮। কর্ণাটক কেবল ভক্তিরই নয়, অন্যান্য অনেক সাধন মার্গেরও বিহার-ভূমি। শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি না হলেও কর্ণাটক তাঁর তপোভূমি, রামানুজাচার্যের প্রপত্তি-ভূমি, মাধ্বাচার্যের জন্মভূমি, সন্ত বসবেশ্বরের কল্যাণভূমি। শুধু তাই নয়, সন্ধান করলে এটাও সুস্পষ্ট হবে যে নাথ-পন্থের উন্নায়ক গোরক্ষ-নাথের জন্মভূমি ও বিহারভূমিও এই কর্ণাটক। গোরক্ষ-সহ স্বনাম স্তোত্রে গোরক্ষনাথজীর জন্মস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

অস্তিযাভ্যাং দিশি কশ্চিদ্দেশো বড়বনামকঃ।
তত্রাজনি মহাবুদ্ধির্মহামন্ত্রপ্রসাদতঃ॥

ডঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর মতে এই বড়ব দেশ হলো গোদাবরী তীর। নাসিকের নিকটবর্তী ত্র্যম্বকেশ্বর বহু প্রাচীন শিবক্ষেত্র। ইহা গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থলও বটে। ব্রীগস্ মনে করেন, এখানে গোরক্ষনাথের একটি শিলামূর্তি বিদ্যমান। তাই গোদাবরী তীরকে গোরক্ষনাথের জন্মভূমি বলে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এই 'বড়ব' কন্নড় ভাষার 'বড়গ' (উত্তর) শব্দের রূপান্তর মাত্র। কন্নড় ভাষার আদিগ্রন্থ 'কবিরাজ মার্গে' কর্ণাটকের সীমা সম্বন্ধে লেখক বলেছেন—

কাবেরীয়িংদমা গোদাবরীবরামিদং নাড়দা কন্নড়দোল।
ভাবিষদ্ জনপদং বসুধাবলয় বিলীন বিশদ বিষয় বিশেষম্॥

(কবিরাজ মার্গ, ১।৩৬)

কর্ণাটক দেশ কাবেরী থেকে সুরু করে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর কর্ণাটককে আজও 'বড়্গানাড়ু' বলা হয়। আজও উত্তর কর্ণাটকে এমন কিছু স্থান আছে যেখানে নাথ-পন্থের অবশেষ দৃষ্ট হয়। বাদমী তালুকের মহাকূট, নাগনাথন্, কোল্ল, সিদ্দরপড়ে, সিদ্ধন কোল্ল, প্রভৃতি স্থান নাথ-পন্থীদের সাধন ক্ষেত্র ছিল। বেলগাঁও জেলাতেও কিছু সিদ্ধ ক্ষেত্র বর্তমান। 'বেড্কীহাক' নামক গ্রামে সিদ্ধদের এক মন্দির রয়েছে। লোংডার নিকটবর্তী দেবরাই নাগরাল স্টেশনের কাছে 'হণ্ডেবড়গনাথ' নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধ ক্ষেত্র। এখানে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে কুম্ভযোগে মেলা বসে। এই 'হণ্ডে কড়গনাথ' হণ্ডে কুরুণ নামক পশুপালক জাতির আরাধ্য দেবতা। ইহাদের সহিত হাড়ীপা, হাড়ী, ভড়ঙ্গনাথ প্রভৃতি নাথপন্থী যোগীদের সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয়। গদগতালুকে 'কপ্পত্গুড্ড' নামে যে পাহাড় আছে, তার সম্বন্ধে বলা হয় যে নাগার্জুন নামে রসসিদ্ধ এখানে ছিলেন। এই তালুকে 'নাগাই' নামক গ্রামে নাগার্জুনের একটি সুন্দর মূর্তি আছে। উমদীতে রয়েছে মল্লিকার্জুন এবং অমকসিদ্ধের মন্দির। এই মন্দির দুটির পূজারী 'হণ্ডে কুরুণ' নামক পশুপালক জাতির অন্তর্ভুক্ত। উমদীর নিকটবর্তী 'হুলজন্তি' নামক অন্য একটি গ্রামে সিদ্ধ মালপ্প বা মালিঙ্গ রায় নামক এক সিদ্ধের মন্দির বিদ্যমান। এই সিদ্ধ মালপ্প তাঁর বংশধর এবং অনুগামীগণ 'হণ্ডেকুরুণ' জাতিভুক্ত। ম্যাঙ্গালোরের কাদিরে এবং এই জেলার ধর্মস্থলে পূজিত শিবলিঙ্গের নাম 'মঞ্জু-নাথ'। শিবের এইরূপ নাম কোন অভিধানে বা প্রাচীন শিব সহস্র নামে পাওয়া যায় না। সমগ্র ভারতে শিবের মঞ্জুনাথ নাম ঐ দুই স্থানের শিবলিঙ্গের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। স্বর্গীয় শ্রীগোবিন্দ পাইজী প্রমাণিত করেছেন যে কাদিরে প্রথমে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। সেখানে পূর্বে বোধিসত্ত্ব বা মঞ্জু ঘোষের পূজা হতো। পরে গোরক্ষনাথের প্রভাবে দুই শিব-লিঙ্গই মঞ্জুনাথ নামে অভিহিত হন। কাদিরে লোকেশ্বরের একটি কাংস্য মূর্তি আছে। কিম্বদন্তী এই যে, পরম শিবভক্ত অলুপ

বংশীয় রাজা কুন্দবর্মা লোকেশ্বর নামক ঐ দেবমূর্তিকে কাদরি বা কদরিকা নামক মনোহর বিহারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শ্রীকুন্দবর্মা গুণবানলুপপেন্দ্রো মহীপতিঃ।
পাদারবিন্দ ভ্রমরো ভাল চন্দ্র শিখা মনেঃ॥
লোকেশ্বরস্য দেবস্য প্রতিষ্ঠামকরোৎ প্রভুঃ।
শ্রীমৎ-কদারিকা নাম্নি বিহারে সুমনোহরে॥

(সমর্পণ শ্রীধর্মস্থল মঞ্জুপ্য হেগড়ে কী
সমর্পিত অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ৬০)

শ্রীপাইজী এই ঘটনার সময় ১০৬৮ খৃঃ বলে স্থির করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, পূর্বেকার লোকেশ্বর পরে মৎস্যেন্দ্র নাথের সহিত একীভূত হয়ে যান। অতএব, এটি তাঁরই মূর্তি। অন্য এক সম্প্রদায় মনে করে 'শ্রীভারদ্বাজ সংহিতা'র অন্তর্গত 'কদলী-মঞ্জুনাথ-মাহাত্ম্য' অনুযায়ী কদলীতে পরশুরাম কর্তৃক মঞ্জুনাথ প্রতিষ্ঠিত হন। শক্তিরূপিনী বিন্ধ্যবাসিনী মঙ্গলাদেবী (যাঁর নামানুসারে ম্যাঙ্গালোরের নামকরণ হয়েছে) এখানেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই গ্রন্থে মঞ্জুনাথের সঙ্গে নবনাথের সম্বন্ধাদিও বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির ন্যায় মৎস্যেন্দ্রনাথও পরমতত্ত্বরূপে পূজ্য। নিম্নশ্লোকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যং বিষ্ণু প্রবদন্তি বৈষ্ণবগণাঃ
শৈবা শিবং শক্তিকাঃ শক্তিং
ভাস্করভক্তিকাঃ দিন মনিং, ব্রহ্মস্বরূপং দ্বিজাঃ
মৎস্যেন্দ্রং মুনয়ো বদন্তি সততং লোকেশ্বরং বৈরিকাঃ
অন্যে তং করুণাময়ং প্রতিদিনং তন্নৌ মি সিদ্ধেশ্বরম্॥

(নেপাল-সিদ্ধাচল-মৃগস্থলী-কদলী-মঞ্জুনাথ মাহাত্ম্য, পৃ. ১৪৫)

দক্ষিণ কন্নড় জেলায়ও কিছু নাথ-পন্থী মন্দির আছে। ম্যাঙ্গালোরের নিকটবর্তী কদরী পাহাড়স্থিত যোগী মঠ কর্ণাটকের সবচেয়ে বড় গোরক্ষ-মঠ। আজও এখানে গোরক্ষ-পন্থী মহন্ত রয়েছেন। এখানে

গোরক্ষনাথের একটি প্রাচীন সুন্দর কাংস্যমূর্তি এবং মনুষ্যাকার একটি শিলা মূর্তি বিদ্যমান। স্বর্গীয় গোবিন্দ পাইজী বলেন, প্রথমে ইহা কদরিকা নামে এক বৌদ্ধ বিহার ছিল। গোরক্ষনাথ স্বয়ং এখানে এসে এটিকে নাথ পন্থী মঠে রূপান্তরিত করেন। কদরীছাড়া উত্তর তালুকের বিট্‌ঠলেও নাথ-যোগীদের এক মঠ আছে। উড্‌পী তালুকের সুড়া গ্রামেও এক মঠ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কাসরগোড় তালুকে মঙ্গল পাডীর নিকট পীসড়িগুড়ে নামক পাহাড়ে পূর্বে বহু যোগীর বাস ছিল। এখানে আজও প্রচুর (চিতা) ভস্ম দেখতে পাওয়া যায়। লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা নিয়ে যায়।

মহীশূর জেলার কৃষ্ণরাজ নগরের নিকটবর্তী 'কপ্পড়ী' গ্রামে নাথ-পন্থীদের এক মঠ আছে। মহীশূরে 'যোগী' নামক এক জাতিও বাস করে। এই জাতির সাধুরা শিঙ্গা ধারণ করেন এবং কর্ণে কুণ্ডল পরেন। এই জাতি যে নাথ-পন্থী, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ইহা ছাড়া, কর্ণাটকের কোন কোন প্রাচীন শিলা-লেখেও নাথ-পন্থী যোগীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। চিত্রদুর্গ জেলার জগলুর শিলা লেখে (১২৭৬ খৃঃ) জনৈক শিব-যোগী চক্রবর্তী প্রসাদ দেবকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই শিব-যোগীর বর্ণনায় নাথ-পন্থী পঞ্চমুদ্রা এবং আদিনাথ, চতুরঙ্গীনাথ··· নরনাথ পন্থের কথা আছে। তা থেকে, তাঁর উপর নাথ-পন্থী প্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় * (আগামীবারে সমাপ্য)

* হিন্দী "যোগবাণী", ডিসেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যা থেকে শ্রীখুসীলাল নাথ কর্তৃক অনূদিত।

গ্রন্থ-পরিচয়

'ভারতবর্ষীয় নাথ-সংস্কৃতি পরিষদ' গোরখনাথ মন্দির, গোরখপুর। কর্তৃক প্রকাশিত নাথ-যোগ বিষয়ক মাসিক পত্র 'যোগ-বাণী' গত চার পাঁচ বৎসরে হিন্দীভাষাভাষী পণ্ডিত, গবেষক ও সাধকদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অধ্যাত্ম, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সদাচার বিষয়ক পত্রিকা বলে অভিহিত হলেও মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ প্রবর্তিত যোগ ও নাথ-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য প্রচারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গোরখপুর থেকে প্রকাশিত অপর একটি জনপ্রিয় হিন্দী মাসিক 'কল্যাণে'র ন্যায় 'যোগ-বাণী'র বৎসরের প্রথম সংখ্যাটি (জানুয়ারী) বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক ও সাধকের মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে বৃহদাকারে বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়। 'যোগবাণী'র পূর্ববর্তী চারিটি বিশেষ সংখ্যা 'গোরখ-বিশেষাংক', 'যোগাসন বিশেষাংক', 'গোরখ-বাণী বিশেষাংক' এবং 'গোরখ-সিদ্ধান্ত বিশেষাংক' এক হিসাবে যোগ বিষয়ে 'কোষ' গ্রন্থরূপে অভিহিত করা যায়।

বর্তমান বৎসরে (জানুয়ারী-'৮১) যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম 'হঠযোগ বিশেষাংক'। ৩১৮ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটি মূলতঃ দুটি অংশে বিভক্ত। ১৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রথম অংশটিতে প্রখ্যাত সাধক, গবেষক ও পণ্ডিতদের ২৫।২৬টি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলি মুখ্যতঃ হঠ-যোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক। দ্বিতীয় অংশ (১৫৪ পৃঃ) রয়েছে স্বামী স্বাত্মানন্দ যোগী রচিত হঠ-যোগ বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ 'হঠ-যোগ-প্রদীপিকা'র সংস্কৃত মূল ও হিন্দী ব্যাখ্যা। বলা বাহুল্য, হিন্দী ব্যাখ্যাটি অতি প্রাঞ্জল এবং অল্প হিন্দী জানা পাঠকের পক্ষেও সহজ বোধ্য। হঠ-যোগ প্রদীপিকায় বর্ণিত ১৫টি যোগাসন চিত্রের সাহায্যেও প্রদর্শিত হয়েছে। অধিকন্তু, সংখ্যাটিতে ভগবান শিব, মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষনাথের চিত্র ছাড়াও গোরখপুর মঠের পূর্বতন ও বর্তমান মঠাধীশ, যোগীরাজ গম্ভীর নাথ, মহন্ত দিগ্বিজয় নাথ, অমৃতনাথ,

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রেরণা

কৃষ্ণচৈতন্যানন্দ নাথ

জয় শৈব-নাথ-যোগী রুদ্রজ ব্রাহ্মণ।
'শৈবভারতী' আশা দিল হবে জাগরণ॥
স্বধর্ম লুপ্ত ছিল বল্লাল সেন হতে।
'যোগিসখা' নিল কিছু প্রগতির পথে॥
'শৈবভারতী' প্রকাশিছে যোগ ও যোগীর বাণী।
তারে তারে ঝঙ্কার মা তুমি বীণাপাণি॥
তেরশ চৌষট্টি সন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ।
স্বধর্মে ফিরিতে প্রথম করিলা সম্মেলন॥
তেরশ সাতাশি সন প্রথম বৈশাখ মাস।
মুখপত্র 'শৈববাণী'র প্রথম প্রকাশ॥
তেরশ অষ্টাশির বৈশাখ মাস হতে।
'শৈববাণী'র রূপান্তর 'শৈবভারতী'-তে॥
যোগধর্ম বিহনে হয় জগৎ-পতন।
যোগীশ্বর বিনা দক্ষযজ্ঞের মতন॥
যোগ-নিন্দায় প্রলয় নাচ নাচেন মহাকাল।
মাসিক 'শৈবভারতী' ভরসা কেবল॥
প্রতিদিন প্রাতে স্মরি শিব-শ্রীচরণ।
দীন অধমের এই সদা আকিঞ্চন॥

———

(৮১ পাতার শেষাংশ)

সুন্দরনাথ ও অবেদ্য নাথজীর চিত্র সংখ্যাটির বিশেষ সৌষ্ঠভ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। হিন্দী যোগ সাহিত্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে বিবেচিত হবে, একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। হঠ-যোগ বিষয়ে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা এই বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করলে লাভবান হবেন, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। পৃথকভাবে এই বিশেষ সংখ্যাটির মূল্য দশ টাকা। —শ্রীসুবল চন্দ্র দেবনাথ

জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

সুবোধকুমার নাথ এম. এ., বি. টি.

ভারতীয় হিন্দু সমাজেব জাতিভেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে,—আদি বৈদিক সমাজে কোন জাতিভেদ ছিল না। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে জাতিভেদ প্রচলিত হয়, সামাজিক প্রয়োজনে, বৈদিক যুগেব শেষ ভাগে। অন্ত্য বৈদিক যুগের এই জাতিভেদ জন্মগত বা বংশগত ছিল না,—ছিল গুণ ও কর্মগত। পববর্তীকালে, গুণ ও কর্মগত এই জাতিভেদ একরকম জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই সময়েও, এক জাতির কেউ যে অন্যজাতিভুক্ত হতে পারতেন না তা নয়; ইচ্ছা করলেই তিনি অন্য জাতির গুণ ও কর্ম আয়ত্ত করে ঐ জাতির অন্তর্ভুক্ত হতেন। আবো পরবর্তীকালে জাতিভেদের কড়াকড়ি দেখা দেয়। এর পর থেকে জাতিভেদ একান্তভাবে জন্মগত হয়ে পড়ে। এই জন্মগত জাতিভেদই বর্তমান হিন্দু সমাজে প্রচলিত। গুণ ও কর্ম যাই হোক না কেন, জন্মসূত্রে যার যে জাতি সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার "জাতিভেদ প্রথা, ধমগুরু ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র" প্রবন্ধে করা হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে বহুজাতির অস্তিত্ব থাকলেও জাতি মূলত চারটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারটি জাতিই পরবর্তীকালে আরো বিভাজনের ফলে বর্তমানের বহুজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে, সামাজিক প্রয়োজনে, যে জাতিভেদের প্রচলন হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল গুণ ও কর্ম। এই গুণ ও কর্ম স্বভাবতই, স্থূল অর্থে, সামাজিক কর্ম এবং ঐ কর্ম সম্পাদনের জন্য

প্রয়োজনীয় গুণ। তবে এই গুণ ও কর্মভিত্তিক জাতিভেদের পশ্চাতে যে তত্ত্ব ছিল তার সৃষ্টি হয়েছিল মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞায়। সেখানেও মনে হয়, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই জাতিভেদতত্ত্ব অনুভূত হয়েছিল। তবে এই গুণ ও কর্মকে মুনি-ঋষিরা সূক্ষ্ম অর্থেই প্রয়োগ করেছিলেন। গুণ ও কর্মের এই সূক্ষ্ম অর্থের ওপর ভিত্তি করেই বৈদিক সমাজে প্রথমে জাতিভেদের কাঠামো রচিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে, কিছুটা সমাজের বৃহত্তর জনসাধারণের অজ্ঞানতা ও কিছুটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থপর মানুষের ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগের জন্য, গুণ ও কর্মভিত্তিক জাতিভেদতত্ত্বের গুণ ও কর্মের সূক্ষ্ম অর্থের পরিবর্তে স্থূল অর্থ করা হতে থাকে। এই ভাবেই, কালক্রমে, স্থূল অর্থে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে রচিত জাতিভেদপ্রথা সমাজে দৃঢ়বদ্ধ হয়।

ভারতীয় বৈদিক সমাজের জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধ। এখন, যে সময় থেকে ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হতে থাকে, প্রাগ্‌বৈদিক যুগ তার অনেক আগেকার। সুতরাং এই আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্য আশা করা নিশ্চয় চলে না। কাজেই ভারতীয় শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে যে সমস্ত আভাস-ইঙ্গিত রয়েছে, প্রধানত তার ওপর ভিত্তি করেই একটি যুক্তি সিদ্ধান্ত গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই।

ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দুটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়,—(১) আর্য ও (২) দাস বা দস্যু। এই জাতিভেদ আলাদা আলাদা রক্তের ভিত্তিতেই ছিল বলে মনে হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের পরে এটা আরো নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর্যেরা যখন ভারতে এলেন তখন এদেশের প্রাগার্য জাতির সঙ্গে তাদের সংঘাত হয়। প্রাগার্য জাতির সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক আর আর্যেরা ছিলেন যাযাবর; তাঁদের জীবিকা ছিল প্রধানত পশুপালন। পরবর্তীকালে যখন এদেশে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, তখন কৃষিকার্যও এঁদের একটি প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাগার্য জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি ছিল

আর্যদের তুলনায় অনেক উন্নত। এই প্রাগার্য জাতিকে আর্যেরা বলতেন দস্যু বা দাস। এই দস্যু বা দাসদের সঙ্গে আর্যদের সংঘাতের ইঙ্গিত এবং আর্য কর্তৃক দস্যু বা দাসদের নগর সভ্যতার ধ্বংসের ইঙ্গিতও রয়েছে ঋগ্বেদে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে,—আর্য জাতি হচ্ছে বহিরাগত সেই মানবগোষ্ঠী আর্য-রক্ত যাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত এবং দস্যু বা দাস হচ্ছে সেই মানবগোষ্ঠী যাঁদের ধমনীতে বইছে ভারতের আর্যপূর্ব অধিবাসীর রক্ত।

এই সূত্র ধরেই, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে, কেউ কেউ, পরবর্তী কালের চারটি বর্ণ বা জাতির উদ্ভব-রহস্য ব্যাখ্যা করে থাকেন। এঁদের মত হচ্ছে,—দেশের কোন কোন অংশে প্রাগার্য জাতি, আর্য কর্তৃক বিজিত হয়ে, আর্যদের দাসত্ব স্বীকার করে দাসরূপে, আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালের শূদ্র হচ্ছেন এই দাসেরা এবং আর্যেরা হচ্ছেন পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ। পরে, সময়ান্তরে প্রাগার্য জাতির সঙ্গে আর্যদের একটা সমঝোতা হয় এবং প্রাগার্যদের উন্নত সংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। রক্তের মিশ্রণ শুরু হয় এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় সঙ্কর জাতির। এইভাবে বর্ণসঙ্কর হিসেবে মাঝখানের জাতিগুলির সৃষ্টি। এদের মতে, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সঙ্করজাতি শূদ্র অনার্য এবং ব্রাহ্মণ আর্য। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা চলে না। কারণ,—

বিজয়ী আর্যেরা (বিশুদ্ধ আর্য রক্ত যাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত) সঙ্কর জাতি কর্তৃক শাসিত হবেন এমন কথা বিশ্বাস করা চলে না। অন্ত্যবৈদিক যুগে এবং পরবর্তী সময়ে রচিত শাস্ত্রসমূহে যে সব রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে।

[ক্রমশঃ]

সামবেদীয় নিত্যপূজা পদ্ধতি

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কূর্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিতে হয়। কূর্মমুদ্রা, যথা—বাম হস্তের তর্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে এবং বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করিবে। পরে বাম হস্তের পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে সংলগ্ন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিলে কূর্মমুদ্রা হয়। ধ্যানান্তে পুষ্পটি স্বীয় মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে।

মানসপূজা ঃ হৃদয়ে প্রার্থনা মুদ্রা স্থাপন পূর্বক বাহ্যপূজার উপাচার উপকরণাদি বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানস পূজা করিবে।

প্রার্থনা মুদ্রা :—চিৎভাবে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া হৃদয়ে সংস্থাপন করিলে প্রার্থনা হয়।

পরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ভূতশুদ্ধি করিবে।

করন্যাস ঃ—আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উল্লিখিত অঙ্গুলিগুলি পর পর স্পর্শ করিবে এবং শেষ মন্ত্রে তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বামহস্ত তলদেশ বেষ্টন করিয়া করতল ধ্বনি করিবে।

অঙ্গন্যাস ঃ—আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। ঊং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট। পূর্ববৎ করতল ধ্বনি করিবে।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি :—রং মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জল ধারা দিয়া আপনাকে বহ্নি বেষ্টিত চিন্তা করিয়া নাসিকাদ্বয় টিপিয়া ধরিয়া নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করিবে।

(১) ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।

(২) ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।

(৩) ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।

(৪) ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন মূল শৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা।

পরে পুষ্প লইয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া পুষ্পটি দেবতার মস্তকে অথবা চরণে দিয়া পঞ্চোপচার, দশোপচার অথবা ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। উপাচার সমূহে প্রথমা বিভক্তি এবং দেবদেবীর নামে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া পূজা করিবে। যে উপাচার নিবেদন করিতে হইবে, তাহা পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপূর্বে এষ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপূর্বে এষা শব্দ এবং ক্লীবলিঙ্গবাচক হইলে তৎপূর্বে এতৎ অথবা ইদম্ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

পঞ্চোপচার :—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

দশোপচার :—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পানীয় পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার :—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, আচমনীয় তাম্বুল, অর্চনা, স্তোত্রপাঠ, তর্পণ ও প্রণাম।

পূজান্তে আরতি করিবে। প্রথমে দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ) অর্ঘ্য পাত্র (পানিশঙ্খ) বস্ত্র, বিল্বপত্র যুক্ত পুষ্প, চামর দ্বারা আরতি করিয়া

শেষে শঙ্খধ্বনি করিবে। পরে পুনরায় প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র : ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধি হীনঞ্চ মৎ ভবেৎ। পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ জনার্দ্দন। (মহেশ্বর, মহেশ্বরী, সুরেশ্বরি) দেবদেবী বিশেষে এই শব্দগুলির যে কোন একটি প্রয়োগ করিবে।

আরতির নিয়ম :—সকল দ্রব্যই অর্চনা করিয়া আরতি করিতে হয়। ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা মন্ত্রে ঘণ্টায় পুষ্প দিয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে দীপমালাদি লইয়া ক্রমান্বয়ে দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার এবং সর্বাঙ্গে সাতবার আরতি করিতে হয়।

সংক্ষেপে নিত্যপূজা পদ্ধতি এখানে সমাপ্ত।
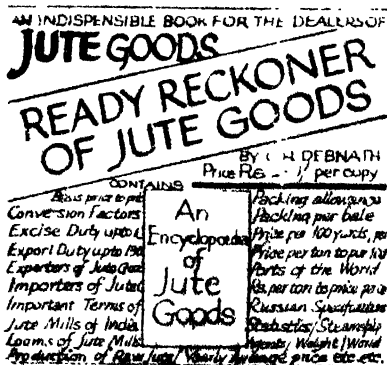
পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পরিচালনায়—**বি. নাথ**

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০ ০১২

পাত্র (৩২), বি. এস. সি, রেডিও ইঞ্জিনীয়ার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী। স্বাস্থ্যবান, বনেদী পরিবার। নিজস্ব বাড়ী ও জমি-জমা আছে। শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। এবং

পাত্রী (২২), বি. এ. পার্ট ওয়ান, মধ্যম বর্ণা, শান্ত স্বভাবা, গৃহ কর্মে নিপুণা, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। উপযুক্ত পাত্র চাই—শ্রীমন্মথ নাথ, ডাঃ এস. এন. ব্যানার্জী রোড, পোঃ গারুলিয়া বাবুঘাট, ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২৭), (৫'-২"), বি. এস. সি, বি এড, শিক্ষিকা (৭০০) সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারিণী। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীবাদল দেবনাথ, গ্রাঃ শালীপুর, পোঃ—নিভুজী বাজার, বর্ধমান।

পাত্রী (৩২) বি. এ, ফর্সা, উত্তম মুখশ্রী যুক্তা, হাওড়া নিবাসী, বর্তমানে বিহার সরকারের অধীনে কর্মরতা (৭৯৮), এবং কনিষ্ঠা (২৭) উজ্জল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রীযুক্তা উভয়ের জন্য পাত্র চাই। বি. নাথ, ২৩/১-এ ফীয়ার্স লেন, কলি-১২।

পাত্রী (২৩), (৫'-১") বি. এ. পার্ট ওয়ান। একমাত্র কন্যা, সুকেশী, নম্র স্বভাবা, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীনিলমণি নাথ, সুন্দিয়া হাউসিং স্টেট, কোয়াটার নং এ/৬, পোঃ জগদ্দল, ২৪ পরগণা, পিন—৭৪৩১২৫।

পাত্রী (২২), (৫'), দশম মান, সুশ্রী, গৃহকম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকার্ত্তিক দেবনাথ, ৪২/৬৭ বেদিয়াডাঙ্গা সেকেণ্ড লেন, কলি-৩৯।

পাত্র (৩১), (৫'-১০"), এম. এ., কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কর্মচারী (৮০০), স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, পিতামহ ও পিতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। বর্ধমানে এবং দিল্লীতে নিজ গৃহ। সম্ভ্রান্ত বংশ খেলাধুলা ও কলাশিল্পে পারদর্শী। সুশ্রী কালচার্ড গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। শ্রী এস. কে. নাথ, ১৬৮ নং টেগোর পার্ক, কিংওয়ে, পোঃ দিল্লী, পিন—১১০০০৯। [ফটো এবং জন্ম কুণ্ডলী সহ যোগাযোগ করুন]

পাত্রী ফর্সা সুদর্শনা, স্বাস্থ্যবতী, সুগায়িকা, সুরুচিসম্পন্না এবং অভিজাত পরিবারের কন্যা। বয়স ১৮ (৫'-২"), দ্বাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়াছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার অথবা প্রতিষ্ঠিত সুউপায়ী পাত্র চাই। শ্রীশচীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (মায়াভিলা) অরবিন্দ রোড, পোঃ নিউ ব্যারাকপুর, জিঃ ২৪ পরগণা।

পাত্রী ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, সিংহরাশি, রং ফর্সা, বয়স ২৩।২৪ মধ্যে, লেখাপড়া সামান্য, গৃহকর্মে সুনিপুণা, দেবগণ, উচ্চতা ৫', পাত্রীর জন্য সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পূর্ব অথবা পশ্চিমবঙ্গীয়ে কোন আপত্তি নাই। যোগাযোগের ঠিকানা: শ্রীজহরলাল সমদ্দার, ১৪ নং মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৭০০০০৯

পাত্রী নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছে। মাঝামাঝি চেহারা, বয়স ২০ বৎসর, মুখশ্রী সুন্দর গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীপরেশচন্দ্র নাথ, গ্রাম রাণীবান্ধা, পোঃ—শাহাজপুর, জিলা বর্ধমান।

পাত্রী দাশগুপ্ত, বয়স ২২ বৎসর, উচ্চতা ৫'-৪", গড়ন মাঝারি, গৃহকর্মে সুনিপুণা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষোত্তীর্ণা গোত্র মৌদগল্য, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত বৈদ্য অথবা ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা— শ্রীচঞ্চলকুমার দাশগুপ্ত। c/o— প্রফেসর ৺সুবোধকুমার দাশগুপ্ত। ৮০ নং রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, দমদম, কলিকাতা ৭০০০২৮।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত এক টাকা**।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা শৈব নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত হয়। রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ, দত্তঘাট, পোঃ চুঁচুড়া, জিলা—হুগলী

৭। গ্রাহক চাঁদা ও অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিঃ দ্রঃ: যাঁরা এককালীন **একশত এক টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৮৮

সম্পাদক—অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

শ্রীশ্রীশিব-স্তোত্রম্

পশূণাং পতিং পাপনাশং পরেশং
 গজেন্দ্রস্য কীর্ত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজুটমধ্যে স্ফুরদ্‌গঙ্গাবারিং
 মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥

পরেশং সুরেশং সুরারার্তিনাশং
 বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নি ত্রিনেত্রং
 সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং
 গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মবিভূষিতাঙ্গং
 ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধ মৌলে
 মহেশান্ শূলিনজটাজুটধারিন্।
ত্বমেকো-জগদ্ব্যাপকে বিশ্বরূপ
 প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং
 নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং
 তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥

ইতি শ্রীশ্রীশিব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সম্পাদকীয়

স্বধর্মাভিমানী প্রত্যেক হিন্দু কিছুদিন যাবৎ সংবাদপত্রে পরিবেশিত যে কয়েকটি সংবাদে বিচলিত বোধ করবেন সেগুলো হলো ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে হরিজনদের ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ। তিরুনেলিভেলি জেলার মীনাক্ষীপুরমে কিছুদিন আগে প্রায় দেড়হাজার হরিজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই গ্রামের নূতন নামকরণ করে রহমতনগর। চেষ্টা চলছে সেখানে একটি মসজিদ স্থাপনের। পরের সংবাদ আর্কট জেলার বিল্লপুরম ও তাঞ্জাভুরে দুই শত হরিজনের ধর্মান্তর গ্রহণ। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, তামিলনাড়ুতে আরও পাঁচ হাজার হরিজনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংকল্প ও প্রস্তুতি।

এই ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা হরিজনদের ধর্মান্তর গ্রহণ না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং বলেছেন এই গণ-ধর্মান্তর তাদের দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেবে না। আর্য-সমাজীরা সেখানে ছুটে গিয়েছেন ধর্মান্তরিতদের শুদ্ধি ক্রিয়া করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে। কিছুসংখ্যক ধর্মান্তরিতদের তাঁরা ফিরিয়েও এনেছেন এবং এদের পংক্তি ভোজনের অনুষ্ঠান করেছেন।

সংবাদে আরও প্রকাশ, এই ধর্মান্তর গ্রহণের সবটুকুই স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এর পেছনে জোর-জুলুম ও অর্থের প্রলোভনও রয়েছে এবং এই অর্থ আসছে কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে। তাই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সরেজমীন তদন্ত করে দেখছে এই বিপুল অর্থ আসছে কোথা থেকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও কড়া সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, জোর করে ধর্মান্তরকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু এ সবই তো রোগ নিরাময়ে বাইরের প্রলেপ। এতে ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ হয়ত বন্ধ হবে সাময়িকভাবে। সমাজ দেহ থেকে রোগ নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা এতে কতটুকু? দেশ স্বাধীন হয়েছে তিন দশকেরও বেশী আগে। অস্পৃশ্যতা বর্তমানে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবু হরিজনদের উপর ঘৃণা ও লাঞ্ছনা তো সমানভাবেই অব্যাহত। হরিজনরা আজও এদেশে কতখানি ঘৃণিত ও নির্যাতিত, তার একটি ঘটনা দক্ষিণ ভারতেই ঘটেছিল কয়েকবৎসর আগে। সামান্য পকেটমারের অপরাধে একটি হরিজন বালককে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গায়ে কেরোসিন ঢেলে। ঘটনাটি বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের পার্লামেন্টের টনক নড়েছিল। বৎসর খানেক আগে ১৪ জন হরিজনকে ঘরবাড়ী সহ পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বিহারে।

বিদেশী রাষ্ট্রের মদতে এই ধর্মান্তর করণ হয়েছে বললেই কিন্তু আমরা দায়মুক্ত হইনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডঃ. বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে পাঁচশত তপশীলি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। তার পিছনে বিদেশী মদত ছিল না। এর দায়-ভাগ আমাদের— তথাকথিত উচ্চবর্ণাভিমানী হিন্দুদের। আমরাই এদের মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রেখেছি; ঘৃণায় ঠেলে দিয়েছি দূরে। সরকার এদের আর্থিক অবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ার কথা যাদের তারা, তথাকথিত উচ্চবর্ণাভিমানীরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি। দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কাথিতর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন, এর পরিণামে ভারতে আবার বিদেশী শাসন কায়েম হতে পারে। কিন্তু হরিজনদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের বর্তমান মনোভাবের পেছনে ভারতের মঠ, মন্দিরের আচার্য, মহন্ত, সাধু সমাজ ধর্ম মহামণ্ডলেরও কি কিছু ভূমিকা ছিল না? শাস্ত্র-

ভগবান বলে, শাস্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যা দিয়ে তারাই তো একদিন নিষিদ্ধ করেছিলেন হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ।

পূর্বে আমরা এই কলমে যা বলেছি, উপসংহারে তারই পুনরাবৃত্তি করি। এর জন্য মূলতঃ যারা দায়ী, সমাজের সেই উচ্চবর্ণাভিমানীরা, আপনাদের মিথ্যা জাত্যাভিমান ত্যাগ করুন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এই মিথ্যা জাত্যাভিমান থেকেই জন্ম নিয়েছে বিদ্বেষ ও বৈরিতা, যার ফলে ভারতে গড়ে উঠেনি কোন সংহতি চেতনা। বার বার মুষ্টিমেয় বিদেশী আক্রমণকারীর কাছে ভারত হয়েছে পদানত। খৃষ্টানদের সংহতি চেতনাই একদিন তাদের ধর্মযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মূলেও আছে এই সংহতি চেতনা। বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধে এই মিথ্যা জাত্যাভিমানের কোন মূল্য নেই। আজিও যদি আমাদের মধ্যে সংহতি চেতনা না জাগে, আমাদের জাতীয় জীবনে নেমে আসবে চরম বিপর্যয়। ভারত তখন হয়তো শুধু দ্বিখণ্ডিতই নয়, বহু খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাবে।

তৃতীয় নেত্র উন্মীলন সম্বন্ধে

জনৈক যোগসাধক

প্রত্যেক জীবেরই ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র বর্তমান। দুটি নেত্র আমাদের প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু তৃতীয় নেত্র গুপ্তভাবে থাকে। যোগ-সাধনা দ্বারা তাকে উন্মীলিত করা যায়। যোগীদের ভাষায় ইহাকে শিব-নেত্র বলা হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে, ভগবান শিব এই তৃতীয় নেত্র সংযুক্ত। তাঁহার রূপ-বর্ণনায় তাঁকে 'ত্রিনেত্র' 'ত্র্যম্বক' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যোগীদের অভিমত হলো, ভগবান শিবের ললাট-দেশ তৃতীয় নেত্র শোভিত তো বটেই, সকল জীবাত্মার ললাটেই এই নেত্র বিদ্যমান এবং যৌগিক-প্রক্রিয়ার দ্বারা এই নেত্রকে উন্মীলিত করা সম্ভব। শিবের তৃতীয় নেত্র তেজোময়, তিনি কামদেব মদনকে এই নেত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করেছিলেন। তাঁর তৃতীয় নেত্র অকস্মাৎ উন্মীলিত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বিনির্গত হয়েছিল। মহাকবি কালিদাস শঙ্করের তৃতীয় নেত্র থেকে অগ্নি নির্গমনের বর্ণনা দিয়েছেন—

স্ফুরদুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদ্
ক্ষণা কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত।

(কুমারসম্ভব, ৩।৭১)

এই তৃতীয় নেত্র বা দিব্যচক্ষুর উন্মীলন যে কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব। যোগ-সাধক নিজ ইচ্ছানুযায়ী এই নেত্র থেকে অগ্নি নির্গত করতে পারেন। ইচ্ছা করলে জলও বাহির করতে পারেন। কারণ, সেখানে পঞ্চ-তত্ত্বের এক কেন্দ্র বর্তমান। শিব-নেত্রে (তৃতীয়) ব্রহ্মা, দক্ষিণ নেত্রে রুদ্র এবং বাম নেত্রে শক্তির অধিষ্ঠান বলে কথিত হয়। এই তিনের সংযুক্তাবস্থাই পরমেশ্বরের রূপ। বিরাটে যে আত্ম-মণ্ডলের ত্রিপুটী আছে, এই তিন নেত্রকে তার ছায়া বলা হয়। শিব-নেত্র ব্রহ্মমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত, দক্ষিণ চক্ষু সূর্য-মণ্ডলের সঙ্গে এবং বাম

চক্ষু চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে। জ্ঞান-বিচারের উৎপত্তি শিব-নেত্র থেকে, ইচ্ছার উৎপত্তি দক্ষিণ নেত্র থেকে এবং 'ক্রিয়া'র উৎপত্তি বাম-নেত্র থেকে। মহাযোগী গোরক্ষনাথ তৃতীয় নেত্রকে জ্ঞান-নেত্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন:—

সপ্তমং ভ্রূ-চক্রং মধ্যমমঙ্গুষ্ঠ মাত্রং জ্ঞাননেত্রং
দীপাকারং ধ্যায়েদ বাচাং সিদ্ধি ভবতি।

(সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি-২/৭)

প্রত্যেক দেহেই যে দিব্য-নেত্র (তৃতীয়) আছে তার প্রমাণ হলো এই যে, আমরা যখন নিদ্রিত থাকি তখন বাহিরের নেত্রদ্বয় বন্ধ থাকে। কিন্তু ঐ দিব্য-নেত্রের প্রকাশেই স্বপ্নে আমরা অনেক দৃশ্য দেখি। এই দিব্য-নেত্রেব দৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত সাধনা দ্বারা উন্মীলিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যজগতে এব প্রকাশ ঘটে না। ইহাব প্রকাশ আমাদের অন্তর্জগতে। সূক্ষ্ম কারণ ও আত্ম-জগৎ ইহার প্রকাশে পবিপূর্ণ। এই কারণেই স্বপ্ন ঘটিত দৃশ্য আমবা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। এটি একটি গুহ্য তত্ত্ব যে স্বপ্নে মন কিছুই দেখে না; মনের দেখবার শক্তি নেই। শিব-নেত্রের প্রকাশেব জন্যই আমরা স্বপ্নে মনের আকার পর্যন্ত দেখতে পাই।

তৃতীয় নেত্র উন্মীলনেব বিধি হলো: সাধক পদ্মাসনে উপবিষ্ট হবেন। তারপব বহির্নেত্রদ্বয বন্ধ করে, জিহ্বাকে তালুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করবেন। (তারপর) দুই ভ্রুর মিলন স্থানে, অর্থাৎ নাসিকা মূলের দুই অঙ্গুলী উর্ধে, মন সন্নিবেশ বা ধ্যান করবেন। ধ্যানের সময় 'ওঁ নমঃ শিবায়' অথবা নিজ ইষ্ট মন্ত্র মনে মনে জপ করবেন। নিরন্তর অভ্যাস করাব ফলে, যথা সময়ে তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হবে।

এই জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হলে মন বিষয়-বাসনায় লিপ্ত হবে না। চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হবে এবং মন সহজ শান্ত ভাব ধারণ করবে। মনে কাম-বিকারের পরিবর্তে পবিত্র সাত্ত্বিক পরমাত্ম-ভাবের উদয় হবে।

যাঁর দিব্য-নেত্র উন্মীলিত হয়েছে তিনি সর্বত্র যে সব ঘটনা ঘটছে তা দেখতে পান। তাঁর মন একাগ্র হয় এবং তাঁর আত্মিক-শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর কবলে পতিত হলেও তিনি স্বীয় শরীরকে রক্ষা করতে সমর্থ হন এবং নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন। জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হলে যোগী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, অনেক দেবদেবী দর্শন করতে পারেন। সুস্থ ও নীরোগ জীবনের অধিকারী হতে পারেন।*

অনুবাদ: মণিদীপা দেবনাথ

সৌজন্য—যোগবাণী (হিন্দী)

কর্ণাটকে নাথ-সম্প্রদায়

ডঃ এম. এস. কৃষ্ণমূর্তি

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীব-শৈব সন্তদেব মধ্যে বেবণসিদ্ধেব নামও কোথাও কোথাও নাথ-সিদ্ধদের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

গোরক্ষ জালন্ধরচর্পটশ্চ অডভঙ্গ
কানাফা মচ্ছীন্দ্রাদ্যাঃ।
চৌরঙ্গ বেবণ চ ভর্তৃসংজ্ঞা
ভূম্যাং বভূব নবনাথসিদ্ধাঃ॥

বীব-শৈব সন্তদের মধ্যে রেবণসিদ্ধ ছাড়া অলেখনাথ, মরুলনাথ, নাগির নাথ, কামহরপ্রিয় রমানাথ, নারায়ণপ্রিয় রামনাথ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। মনে হয়, এঁরা নাথ-পন্থের শেষপর্যায় ভুক্ত। অধ্যাপক কুন্দনগার বলেন, রেবনসিদ্ধ, মরুলসিদ্ধ, সিদ্ধরাম প্রভৃতি নাম থেকে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয যে এঁবা প্রথমে নাথ-পন্থানুসারী ছিলেন। কন্নডেব মহাকবি, হবিহব (১৩০০ খৃঃ) তাঁর রেবনসিদ্ধেশ্বর রগলে নামক কাব্যে রেবণসিদ্ধেব যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো— কন্থেয় কমনীয়রূপং বজ্রকুণ্ডলদ বজ্রধরং লাকুল লোকৈক, বন্ধু ভোটিদং পাবুগেয় কট্টধিকং, কোবনদ ভক্তং অঙ্গজবিপুবেনিসিদং রেবণসিদ্ধং।

—সিদ্ধকুল চক্রবর্তীব এই কন্থার কমনীয় রূপ। বজ্রকুণ্ডলের বজ্রধর লাকুল লৌকিক বন্দু, পাদুকা ও কৌপীন পরিধানে তাঁকে মনোহর দেখায় তিনি সিদ্ধ কুল চক্রবর্তী। কেবল তাই নয়, বীর-শৈব পন্থের সন্তসম্রাট অল্লম-প্রভুর নামও নাথ-সিদ্ধদের তালিকা-ভুক্তরূপে। হঠ-যোগপ্রদীপিকায় উল্লিখিত হয়েছে।

—অল্লামঃ প্রভুদেবশ্চ (ঘোড়াচোলী চ টিণ্টিনিঃ।

(হঠ-যোগপ্রদীপিকা ১।৬)

হরিহর রচিত 'প্রভুদেব রংগলে' অনুসারে অল্লমপ্রভু অভিনিষণ্য নামক যোগী থেকে লিঙ্গ-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিনিষণ্য মৎস্যেন্দ্রনাথেরই নামান্তর বলে মনে হয়। 'হঠ-যোগ প্রদীপিকা,' 'গোরখ-বাণী'র সঙ্গে বীর-শৈব সন্তদের বাণীর তুলনা করলে বীর-শৈবদের উপর নাথ পন্থের প্রভাব বুঝা যায়। 'হঠ-যোগপ্রদীপিকা'র রচনাকাল অনিশ্চিত। তাই এ সম্বন্ধে কিছু না বলে এ দুয়ের তুলনা করা যাক।

দিবান ন পূজয়োল্লিঙ্গং রাত্রৌ চৈব ন পূজয়েৎ।
সর্বদা পূজয়োল্লিঙ্গং দিবারাত্রিনিরোধতঃ॥
(হঠ-যোগপ্রদীপিকা, ৪।৪২)

এই শ্লোক চেন্ন বসরের এক বচনেও উদ্ধৃত হয়েছে :—

॥ সাক্ষি ॥ দিবা পূজয়োল্লিঙ্গং রাত্রির্নপূজয়েৎ।
সতঃং পূজয়োল্লিঙ্গং (দিবারাত্রি বিবর্জয়েৎ)।
— (ঐকান শিবলিঙ্গস্থল, পৃ. ২০৪)

পরমতত্ত্ব বিষয়েও নাথ-পন্থী ও বীর-শৈব সন্তদের মধ্যে অপূর্ব সাম্য রয়েছে।

মচ্ছীন্দ্র— অবধূ তিল মধে জথা তৈলং।
কাষ্ঠ মধে হুতাশনং।
পহুপ মধে জথা বাসং।
দেহী মধে তথা দেবতা॥
(গোরখবাণী, মচ্ছীন্দ্র-গোরখবোধ—৫০)

তিলদ মরেয়ং তৈলদন্তে,
পরদ মরেয়ং তেজদন্তে,
ভাবদ মরেয়ং ব্রহ্মবাগিপ্য……
(মহাদেবিয়ক্কন বচন গল্লু—ব. স. ৩)

গোরখনাথ— গুরুদেব স্যঁভ দেব সরীর ভীঁতরিয়ে।
আত্মা উত্তিম দেব তাহী কীন জানোঁ সেব।
জান দেবং পূজি হমহী মরিয়ে।
(গোরখবাণী, পদ ৬)

নিম্মলিন বীবু তিলিছু নোড়িরে অন্তবিল্ল কানিরল্লা অরিবু নিম্মল্লিয়ে তদ্‌গতবাগিরে, অন্য ভাবব নেনেয়দে তন্মোলগে তানে এচ্চরবিরবল্লরে তন্নল্লিয়ে তন্ময় ।

(গুহেশ্বর লিঙ্গবু—১৫)

(আপনাকে আপনি জানলে, আর কিছু থাকে না। যদি জ্ঞানে তদ্‌গত হই, তবে আমার গুহেশ্বর আমার মধ্যেই তন্ময় হয়ে থাকবেন।)

* * * *

গোরখনাথ— উত্তরখণ্ড জাইবা সুঁনিকল খাইবা
ব্রহ্ম অগনি পহারিবা চীরং ।
নীঝর ঝরণৈ অমৃত পীয়া যুঁমন হুবা থীরং ॥
নীঁঝর ঝরণৈ অমীঁরস পীবনাঁ ষটদল বেধ্যা জাই ।
চন্দ বিহুনা চাঁদিনাঁ তহা দেষ্যা শ্রীগোরখরাই ॥
উভাঁ বৈঠাঁ সূতাঁ লীজৈ । কবহু চিত্তভংগনকীজৈ ।
অনহদ সবদ গগন মেঁ গাজৈ ।

(গোরখবাণী. সবদী ৬৭, ১৭১, ১৭৭)

প্রভুদেব—গগন মণ্ডলদ সূক্ষ্মনাল দল্লি
সোহং সোহং এন্নুতলিদ্দিতু ঔঁদু বিঁদু
অমৃত বারিয় দণিযডংডু এনগে নিবাসবায়িত্তু ॥

(অল্লম বচন চন্দ্রিকে—ব. ২৪৭)

(গগন মণ্ডলের সূক্ষ্ম ন নাল মধ্যে এক বিন্দু 'সোহং' 'সোহং' করছিল। অমৃতবারি পান করার ফলে, হে গুহেশ্বর, নিজের মধ্যেই আমি আপনি বিকশিত হয়েছি।)

গোরক্ষনাথ রচিত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'-র প্রভাব চেন্ন সদাশিব রচিত 'শিব-যোগ প্রদীপিকা'য় পড়েছে। গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন যে তিনি 'সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র অনুসরণ করেছেন।

শিবাগমরহস্যার্থান্ সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিম্।
সংক্ষেপতঃ কৃতালোভ্য শিব-যোগ প্রদীপিকা॥

সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতির অবধূত লক্ষণকে এখানে শিব-যোগীর লক্ষণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নাথ-পন্থীরা যাকে সহজযোগ বলেন, বীর-শৈবগণ তাকে শিব-যোগ বলেছেন। চেন্ন সদাশিব যোগী কোথাও কোথাও সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতিব আক্ষরিক অনুগমন করেছেন।

দ্বিধা ভবতি যদ্‌ধ্যানং স গুণং নির্গুণং তথা (সি. সি.)
শিবজ্ঞানং দ্বিধা জ্ঞেয়ং সগুণং নির্গুণং তথা (শি. যো. প্র.)
প্রসাদাৎ স্বগুবোঃ সম্যক্ প্রাপ্যতে পবমং পদম্ (সি. সি.)
গুরুপ্রসাদাৎ ত্রিমলম্ ক্ষয়ত্বাৎ
ধ্যাত্বা যজ্জেন্মোক্ষসুখং স যাতি। (শি. যো. প্র.)

কোন কোন পণ্ডিতেব মতে নাথ-পন্থেব উপবই বীর-শৈবদের প্রভাব পড়েছে। তাঁদেব মতানুসাবে গোরক্ষনাথ বীর-শৈবদের প্রভাবে মৎস্যেন্দ্রনাথের কুল-তন্ত্রকে অকুল বীর তন্ত্রে পরিণত করেন। সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে বীর-শৈবদের কোন কোন প্রক্রিয়ার বর্ণনা আছে। অবধূত যোগীর লক্ষণ বীর-লিঙ্গধারীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই নিরূপিত হয়েছে।

বিলয়ং সর্বতত্ত্বানাং কৃত্বা সংধার্যতে স্থিরম্।
সর্বদা যেন বীরেণ লিঙ্গ-ধারী ভবেৎ সঃ॥

(সি. সি. প.—৬।৪৪)

ইহা ছাড়া, কোন কোন বীব-শৈব সন্তদের উক্তিতে যোগমার্গীয় প্রক্রিয়ার আক্ষরিক বর্ণনা দেখা যায়। বহুরূপী চৌড়য়ার (১২০০ খৃ.) প্রথম গুরু ছিলেন রেকন নাথাচার্য, জ্ঞান গুরু ছিলেন নাগি নাথ। সুতরাং রেকনপ্রিয় নাগিনাথ নাথ-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বলে মনে করা যেতে পাবে। তাঁর বচনে নাথ-পন্থী উক্তি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উক্তি :—

'ম্যায় ষট্‌চক্রবলয়মে করুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। কুণ্ডলী ভ্রুমধ্য মেঁ ম্যায় করুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। ভ্রুমধ্য মণ্ডলস্থিত হৃদয় কমলকে মণিপুরক পুরমে খেলুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। শূন্যমে স্থিত মরীচিকামে খেলুঙ্গা বহুরূপিয়া খেল। হে রেকন প্রিয় নাগিনাথ! ম্যায় বসবেশ্বর সেতর গয়া।'

এইরূপ অক্কমহাদেবী-চন্নবসব প্রভৃতির বাণীতেও যৌগিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেখা যায়। হুডপদ অপ্পন নামক এক সন্তের বাণীর এক উদাহরণ তাঁর মন্ত্রগোপ্য থেকে দেওয়া যাক:—'দ্বিঙ্গল বলয়কে নীচে হ্যায় ষোড়শদল, উস্‌কে মধ্য তথা অন্তমেঁ হ্যায় নাদব্রহ্ম, উস্ নাদ-ব্রহ্ম এবং ওঁকারকে একীকরণ অনাদি লিঙ্গকো দেখ ম্যায় সুখী বনা। আনন্দ সে অনাহত কী কালজ্ঞান সে তোড়কেঁককর উপর বিশুদ্ধি স্থান মেঁ হা স্থিত হোকর ম্যায় ভানুকে প্রকাশমেঁ বিলীন হো গয়া।'

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে কর্ণাটকে নাথ যোগী এবং ইহাদের যোগ-সাধনা প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব বহু শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে।*

অনুবাদ: শ্রীখুশীলাল নাথ

* সৌজন্য: যোগবাণী (হিন্দী)

'শৈবভারতী'র গ্রাহক—সদস্যদের প্রতি আবেদন

এখনো যাঁরা গ্রাহক-সদস্য পদ পুনর্নবীকরণ করেন নি তাঁরা অবিলম্বে আট টাকা নিম্নঠিকানায় পাঠিয়ে সদস্য-পদ পুনর্নবীকরণ করে নিন।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮
কলিকাতা-৭০০ ০৩৭

ভারতীয় সাহিত্যে নাথধর্ম তথা সন্তদের অবদান

শ্রীবীরেন নাথ

অনেক শতাব্দী আগে শিবের বংশধর তথা অনুগামী বলে কথিত নাথধর্মীয় সন্তরা তথা তাঁদের বিভূতির আধারে রচিত সাহিত্য, যা সাধারণভাবে নাথ-সাহিত্য নামে অভিহিত, ভারতের প্রধান প্রধান সাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও আর্য-পরিবারের ভাষা তথা সাহিত্যে, বিশেষত হিন্দী ও বাংলায় নাথ-সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে তবু মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাতী এবং দ্রাবিড় পরিবারেব ভাষাক্ষেত্রেও এব অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়।

বাংলা ভাষার ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এ ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং এর সাহিত্যও ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে এক প্রমুখ স্থানের অধিকারী। ভাষাবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন যে, বাংলা প্রায় হাজাব বছরের পুরনো ভাষা। মাগধী অপভ্রংশ-জাত এ-ভাষা অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার মতই দশম শতাব্দী নাগাদ আপনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয : এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ, এ থেকেই বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের আরম্ভ অনুমিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে সিদ্ধাচার্য লুই কর্তৃক উপর্যুক্ত কিছু দোহা রচিত হয়েছিল। লুই সহজিয়া নামক এক নব সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে স্বীকৃত। শাস্ত্রীজী বলেন: 'আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি (লুই) এ ভাষা লিখেছেন এবং বাংলার আশপাশের কোন প্রদেশের লোক ছিলেন তিনি। এঁদের (সিদ্ধদের) মধ্যে অনেকে বাঙালী ছিলেন। যদিও অনেকের ভাষায় ব্যাকরণিক পার্থক্য দেখা যায়,

তবু সব ভাষাকেই বাংলা বলা যেতে পারে।' এদিকে লুইদ্বারা রচিত অন্য গ্রন্থ 'অভিসময় বিভংগ'র রচনা কার্যে দীপংকর শ্রীজ্ঞান সহায়তা করেন বলে প্রকাশ, যিনি ১০৩৮ সালে বিক্রমশীলা বিহার থেকে তিব্বত যাত্রা করেন। উল্লেখ্য, পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন লুইর কাল সংবৎ ৮৩০র আশেপাশে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। যাইহোক, শাস্ত্রীজীর দাবী অনুসারে লুই রাঢ দেশবাসী তথা বাঙালী ছিলেন।

সিদ্ধাচার্য লুই (লুইপাদ লুইপা) যে সম্প্রদায় সংস্থাপন করেছিলেন, তাতে ৮৪ সিদ্ধ ছিলেন। বাংলায় এঁদের চৌরাশি সিদ্ধ বলা হয়। সরহ, সরহপা, সরহপাদ, সরোজবজ্র বা সরোরুহবজ্র ছিলেন প্রথম সিদ্ধ, যার নাম শাস্ত্রীজী দিয়েছেন পদ্ম, পদ্মব্রজ, রাহুলভদ্র। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যর মতে ইনি বিক্রম সংবৎ ৬৯০-র লোক। শুক্লজীও এ-অভিমতের ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেন, পরন্তু সাংকৃত্যায়ন ৭৬০ খৃষ্টাব্দকে এর কাল নির্ণয় করেছেন। যাই হোক না কেন, সাধারণভাবে এ কথা স্বীকৃত যে, বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক কালে সিদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভ কালকে, অতএব, আমরা অনায়াসে সিদ্ধ-সাহিত্য যুগ রূপে বর্ণনা করতে পারি।

যদি আমরা হিন্দী সাহিত্য বিশ্লেষণ করি তো দেখতে পাই যে, হিন্দী তথা বাংলা সাহিত্যর আদিকালে অপূর্ব মিল ছিল। হিন্দীর প্রারম্ভ কালকে যদিও পণ্ডিতরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, যেমন, কেউ বলেছেন বীরগাথা কাল, কারোর মতে সিদ্ধ-সামন্ত কাল, আবার কেউ একে নাম দিয়েছেন সান্ধ বা চারণযুগ। পরন্তু ডঃ হজারী প্রসাদ দ্বিবেদীজী এর নামকরণ করেছেন আদিকাল এবং এর পরিধি দশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ বার্ষ্ণেয় এই বক্তব্যর সঙ্গে একমত হয়ে অপভ্রংশ তথা লৌকিক সাহিত্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অপভ্রংশ সাহিত্যে তিনি সিদ্ধ, নাথ তথা জৈন সাহিত্যেরও উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ডঃ শিবকুমার শর্মাজীর মতে এ-সময়ে বজ্রযানী সহজযানী সিদ্ধ, নাথপন্থী যোগী, জৈন ধর্ম অনুগামী বিরক্ত মুনি তথা গৃহস্থ উপাসকদের সঙ্গে বীরত্ব ও শৃংগার রূপকার ভাটদের প্রাচীন রচনাবলীও উল্লেখযোগ্যভাবে নির্মিত হয়।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের সাহিত্য বিকাশে নাথ সন্তদের অবদান, বিশেষ করে, হিন্দী ও বাংলা ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডঃ মোহন সিংহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গোরখনাথ অ্যানড মেডিয়েভেল হিন্দু মিসটিসিজম'-এ স্বীকার করেন যে, গোরখনাথ হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় প্রথম গদ্য লেখক। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে গোরখনাথ এর সমকালীন তথা উত্তরকালীন নাথ সিদ্ধদের মধ্যে নাথপন্থ-প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রনাথ (মীননাথ/মীনপা), চৌরঙ্গীনাথ, কণেরীনাথ, কানুপা, গহিনীনাথ, গোপীচন্দ্র, ভর্তৃহরি প্রমুখের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। এ-নাথদের মধ্যে অনেকে আবার চৌরাশি সিদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত, মীননাথের নাম, অবশ্য, শীর্ষায়। দ্বিবেদীজী তাঁর 'নাথ সম্প্রদায়' গ্রন্থে নাথ সিদ্ধদের একটি সূচী দিয়েছেন। পরন্তু সাহিত্যকার রূপে তিনি গোরখনাথকে রীতিমত অস্বীকার করেছেন। তার মতে, গোরখনাথ এমন কোন গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন, এ-কথা বিশ্বাস না করাই সংগত। এসব গ্রন্থ গোরখনাথের অনেক পরে লেখা হয়ে থাকবে। উল্লেখ্য, গোরখনাথজীর লোকবাণী তথা নাথ সিদ্ধদের পদ, সবদী আদি 'জোগেস্বুরী বাণী'র দ্বিতীয় ভাগের সম্পাদন করেন দ্বিবেদীজী এবং নাগরী প্রচারিণী সভা-কাশী তা সংবৎ ২০১৪ সালে প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে, হিন্দী সাহিত্যের মধ্যকালের প্রথম ভাগ থেকেই অনেক সিদ্ধ, যোগী, সন্ত, মহাত্মা গোরখনাথের সবদী, পদ তথা অন্যান্য উপদেশ সংগ্রহ করার যে প্রয়াস পান, তারই সার্থকরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ডঃ পীতাম্বর বড়থ্বাল দ্বারা সংগৃহীত ও সম্পাদিত তথা হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রয়াগ দ্বারা প্রকাশিত 'গোরখবাণী'

এবং 'জোগেসুবী বাণী' প্রথম ভাগের মধ্যে, যা ১৯৯৯ সংবতে প্রকাশিত হয়।

ডঃ কল্যাণী মল্লিকের মতানুসারে গোরখনাথ বাঙালী ছিলেন না বটে, হিন্দীব মূল লেখকদেব মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই ছিলেন। এ বক্তব্যেব সমর্থনে তিনি বলেন যে, বাংলায় গোরখ-বচিত কোন পদ পাওয়া যায়না, পরন্তু হিন্দী, বাজস্থানী, সংস্কৃত আদি ভাষায় গোরখনাথ এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, নাথ পবম্পরানুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরখনাথেব গুরু ছিলেন। ডঃ মল্লিক মৎসেন্দ্রনাথকে বাঙালী বলে মান্যতা দেবাব প্রসঙ্গে বলেন : 'বাংলা-দেশেব সহিত নাথযোগীদেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় নাথপন্থের অনেক পুঁথি বাংলাভাষাতে রচিত হয়, সুদূব নেপালেও শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ বচিত বাংলা পদ পাওয়া গিযাছে। শ্রীমৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি, তিনি পূর্বভারতের সমুদ্র উপকূলে সন্দ্বীপ বা চন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। মতান্তরে বরণা বঙ্গদেশে তাঁহাব জন্ম। (এই স্থান বর্তমান বাংলা দেশের বাখরগঞ্জ জিলান্তর্গত বলে কথিত)।

আগেই উল্লেখ করা হযেছে যে, লুইপা চৌরাশি সিদ্ধদের অন্যতম মুখ্য সিদ্ধ ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার প্রাবম্ভকালে সার্থক অবদান রেখে গেছেন। গবেষকদেব মতে বৌদ্ধদেব লুই বা লুইপাদ বা লুইপাই নাথপবম্পবার মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। ডঃ মল্লিকও এই অভিমতেব অনুসাবী, যার পূর্ণ বিববণ তাঁব 'নাথ সম্প্রদাযেব ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী' গ্রন্থে বিধৃত আছ। পক্ষান্তবে, বৈষ্ণবাচার্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোব গোস্বামী মহাবাষ্ট্রেব নাথসন্ত জ্ঞানেশ্বর নাথজীর 'জ্ঞানেশ্বরী'ব বাংলা অনুবাদেব ভূমিকায় মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলে উল্লেখ কবেন। তাঁব মতে, এ-দুই নাথেব সঙ্গে গোরখনাথকে মিলিয়ে তিন নাথেব মেলা বাংলাব গ্রামদেশে বসে থাকে। তাঁদেব চেষ্টাতেই বাংলায় নাথ-সাধনার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

[ক্রমশঃ]

জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

সুবোধকুমার নাথ এম. এ., বি. টি.

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলা হয়েছে,—আর্যেরা যখন বাইরে থেকে ভারতে এলেন তখন তাঁদের গাত্রবর্ণ ছিল শুক্লাভ গৌর; আর এদেশের আদিম অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ। রক্তের মিশ্রণ না হলে গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হয় না—এমন ধারণা বহুজনস্বীকৃত। বলা হয়ে থাকে, শূদ্র বা অনার্যের বেদে অধিকার ছিল না। আবার স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে,—অনুলোম অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কনে) বিবাহ সমাজসিদ্ধ ছিল; কিন্তু এরূপ বিবাহে জাত সন্তান কেউই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হ'ত না—মাতৃবর্ণই হ'ত ঐ সব সন্তানের বর্ণ; আর প্রতিলোম অসবর্ণ (নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের স্ত্রী) বিবাহ সমাজসিদ্ধই ছিল না; এরূপ বিবাহ হলে সমাজে তাদের স্থান হ'ত না। তা'হলে, একমাত্র বিশুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী শুক্ল বা গৌরবর্ণের মানুষই বেদাধ্যয়নে পারদর্শিতা দেখাতেন এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন বলে সিদ্ধান্ত করতে হয়। কিন্তু অন্ত্যবৈদিক যুগে রচিত (উপনিষদসমূহ বৈদিকযুগের শেষ ভাগে রচিত হয় বলে অনুমিত হয়েছে) বৃহদারণ্যক উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক এই সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১৪শ শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়তে বেদমনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥"

অনুবাদ ঃ—"যদি কেহ ইচ্ছা করে, 'আমার গৌরবর্ণ পুত্র জন্মগ্রহণ করুক, এক বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা দুইজন (স্বামী-স্ত্রী) দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ একই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌবেদাবনু-ব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥"

অনুবাদ ঃ—"যদি কেহ ইচ্ছা করে, 'আমার পিঙ্গল চক্ষুযুক্ত ও কপিলবর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করুক—সে দুই বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন দধি-মিশ্রিত অন্ন ঘৃত সংযোগে রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ একই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লহিতাক্ষো জায়তে ত্রীন্বেদানু-ব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥"

অনুবাদ ঃ—"যদি কেহ ইচ্ছা করে, 'আমার লোহিতাক্ষ শ্যামবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হউক. সে তিন বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক'—তাহা হইলে তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) দুইজন ঘৃতসংযোগে অন্নকে জলে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিবে। (এই প্রকার করিলে তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে।"

ঐ উপনিষদেরই পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে,—

"অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিগীতঃ সমিতিংগমঃ শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্বান্বেদাননুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণবার্ষভেণবা।"

অনুবাদ :—"যদি কেহ ইচ্ছা করে আমার এমন এক পুত্র হউক যে পণ্ডিত, প্রখ্যাত ও সভায় বিচার সমর্থ হইবে, রমণীয় বাক্য উচ্চারণ করিবে, সর্ববেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হইবে—তাহা হইলে তাহারা উভয়ে ঘৃতসংযোগে মাংসমিশ্রিত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিবে। এই মাংস তরুণ বয়স্ক বলশালী বৃষের* কিংবা অধিক বয়স্ক বৃষের* হইলে (তাহারা উক্ত প্রকার সন্তান) উৎপাদনে সমর্থ হইবে।"

এখানে পুত্রেব গাত্রবর্ণের উল্লেখ নেই। কিন্তু কাম্যপুত্রের গাত্রবর্ণ যে ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—প্রথমে গৌরবর্ণ, তার পরে কপিলবর্ণ, তার পরে শ্যামবর্ণ—তাতে মনে হয় এক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলোর মধ্য দিয়ে একটা জিনিস অন্তত পরিষ্কার যে, তদানীন্তন সময়ে গৌর, কপিল, শ্যাম ইত্যাদি গাত্রবর্ণের পুরুষেরা বেদাধ্যয়ন করতেন। কাজেই কেবল বিশুদ্ধ আর্যরক্তের বেদাধিকার এখানে স্বীকৃত হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, যতই রক্তের মিশ্রণ ঘটায় গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হয়েছে ততই মানবের মেধা বৃদ্ধি পেয়েছে—এরূপ আভাসও এগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

আবার এটাও লক্ষণীয় যে, রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের গাত্রবর্ণ শ্যামল এবং মহাভারতের একটি বিশিষ্ট চরিত্র পরম পণ্ডিত সমস্ত শাস্ত্রবিদ্ গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণও শ্যামল বা কৃষ্ণ।

এছাড়া কেউ কেউ বলেছেন,—দাক্ষিণাত্য বিজয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর আর্য-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অনার্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে প্রচার করাব উদ্দেশ্যে বাল্মীকি রামায়ন রচিত হয়। এই মহাকাব্যের রাম-লক্ষ্মণ ইত্যাদিকে আর্যদের প্রতীক এবং রাবণকে অনার্যদের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে বলে এঁরা

---

* বৈদিকযুগে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল না, পরবর্তীকালে এটা নিষিদ্ধ হয়।

বলে থাকেন। কিন্তু এখানেও আর্য রাম-লক্ষ্মণাদিকে বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়।

রামায়ণ-মহাভারতে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ চরিত্রের বর্ণনা আছে, তাঁদের কেউই শাসন কার্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। বিশুদ্ধ আর্যরক্ত যাঁর ধমনীতে তিনি যদি ব্রাহ্মণ, অনার্যরক্ত যাঁর শরীরে তিনি শূদ্র এবং বর্ণসঙ্কর যদি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হয় তাহলে এমন হবে কি করে ?

অনেকে বলেছেন,—কেবল শূদ্র হচ্ছেন অনার্য আর বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ আর্য অর্থাৎ পরবর্তী বর্ণত্রয়ের প্রত্যেকের শরীরেই বিশুদ্ধ আর্যরক্ত বর্তমান। তাহলে প্রশ্ন জাগে,—ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পৌত্র ব্রাহ্মণ পরাশরের গাত্রবর্ণ ঘোর-কৃষ্ণ বলে, ক্ষত্রিয় দশরথের পুত্র ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের গাত্রবর্ণ শ্যামল বলে এবং ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ শ্যামল বা কৃষ্ণ বলে বর্ণনা করা হ'ল কেন ? ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকলেই যদি বিশুদ্ধ আর্যরক্তের অধিকারী তাহলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োত্তম, ক্ষত্রিয় বৈশ্যোত্তম হন কি করে ?

প্রাগার্যদের সঙ্গে আর্যদের একটা সমঝোতা হয়েছিল ঠিকই। এটাও ঠিক যে, প্রাগার্যদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং রক্তের সংমিশ্রণও ঘটেছিল। তবে রক্তের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ বা জাতির উদ্ভব হয়েছিল—এমন মনে হয় না। তাই এই চতুবর্ণের উদ্ভব রহস্য অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। [ক্রমশঃ]

"সত্যমপ্রিয়ম্"

শ্রীকুমুদিনী চৌধুরী, বিদ্যাভূষণ।

নাথ সাহিত্যের গবেষক ৺রাজমোহন নাথ, বি-ই সম্পাদিত কদলীরাজ্য-পুস্তকে কদলীরাজ্যের অবস্থান আসামের নওগাঁ অঞ্চলে বর্ণিত হইয়াছে। নাথযোগী ও দার্শনিক, অধ্যক্ষ ৺অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত The Nath-Yogi Sampradaya And the Gorkhnath Temple—পুস্তকে আসামের কামরূপ অঞ্চলকে কদলীরাজ্যের অবস্থানরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে নাথতীর্থ কদলীমঠ বা কেদ্রীমঠ মহীশূর তথা দক্ষিণ কর্ণাটক রাজ্যের মাঙ্গালোরে এবং রেলষ্টেশন হইতে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মঠে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথের নিয়মিত পূজার্চনা হয়। মঠ হইতে কানাড়ী ও হিন্দি ভাষায় নাথধর্ম ও সাহিত্যের বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭০-৭২ ইং আঞ্চলিক বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে মাঙ্গালোর হইতে কানাড়ী ভাষায় তথ্যবহুল একটি সম্মেলন পুস্তিকা চিত্র-সহ প্রকাশিত হয়।

কেদ্রীমঠের মহন্ত রাজা সোমনাথজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ও ব্যক্তিগত আলাপ আছে। মঠের পাশেই সুপ্রতিষ্ঠিত নাথ-দেবালয় মঞ্জুনাথ দেবস্থানম্ দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। প্রত্যহ যথারীতি পূজার্চনায় বহু লোকের সমাগম হয়।

*   *   *   *

নাথযোগী-সম্প্রদায়ের তথা ভারতবর্ষীয় যোগী সমাজের গৌরব রাজা ৺চন্দ্রনাথজী যোগী অস্থ্‌ দক্ষিণ কর্ণাটক রাজ্যের বিঠঠ্‌ল যোগেশ্বর মঠের মহন্ত ছিলেন। তিনি নাথ ধর্ম, সাহিত্য ও ইতিহাসের বহু পুস্তক নানা ভাষায় প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ কদলীযাত্রা, কদলীবন ও কেদ্রীমঠ সম্পর্কে তাঁহার লিখিত পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

যোগেশ্বর মঠ মাঙ্গালোর শহর হইতে ২৫ কিলোমিটার ও বিঠঠ্‌ল মটর ষ্টেশন হইতে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অধুনা রেল যোগাযোগ হইয়াছে—রেলষ্টেশন বিঠঠ্‌ল রোড।

রাজা চন্দ্রনাথজী হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৪ বৎসর বয়সে মাঙ্গালোর শহরে ১৬.৫.১৯৭৭ ইং দেহরক্ষা করেন। দিল্লী হইতে প্রকাশিত অখিল ভারতবর্ষীয় নাথ সমাজসংস্কার মুখপত্র 'নাথ-সন্দেশ' পত্রিকার সংবত ২০৩৪ গুরুপূর্ণিমা, ২য় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় "কৈলাসবাসী রাজা চন্দ্রনাথজী যোগী অস্থ" প্রবন্ধে সবিশেষ আলোচনান্তে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

দিল্লীর সন্নিকটে খুর্জাতে নাথসমাজের কার্তিক অধিবেশনে ১৩ই নবেম্বর ১৯৭৭ ইং নেপালের রাজগুরু নরহরি নাথজীর সভাপতিত্বে শোক প্রকাশ এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

রাজা ৺চন্দ্রনাথজীর সহিত আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয় এবং তাঁহার সস্নেহ আহ্বানে বিঠঠ্‌ল যোগেশ্বর মঠে গিয়াছি। সেখানকার অবস্থান বড়ই আনন্দদায়ক। এলাহাবাদে ত্রিবেণীসঙ্গমে গত পূর্ণকুম্ভে জানুয়ারী ১০-২৫, ১৯৭৭ ইং শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ 'ভেখ্‌বারপন্থ' ক্যাম্পে অবস্থান-কালে তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হয়। তৎপ্রিয় শিষ্য রাজা জনক নাথ যোগী বর্তমানে যোগেশ্বর মঠের মহন্ত।

অধুনা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র শৈবভারতীর ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ '৮৮ "রাজা চন্দ্রনাথজী স্মরণে"

প্রবন্ধে (৪০ পৃষ্ঠা) নাথজীর চিত্রসহ সুবিস্তারিত আলোচনান্তে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিত্র ৺রাজা চন্দ্রনাথজীর নহে উহা কেন্দ্রীমঠের মহন্ত সোমনাথজীর। *

---

* সম্পাদকের নিকট পরিবেশিত একটি ভুল তথ্যের জন্য জ্যৈষ্ঠ '৮৮ সংখ্যা 'শৈব-ভারতী'র "রাজা চন্দ্রনাথজী স্মরণে" রচনাটিতে রাজা চন্দ্রনাথজীর প্রতিকৃতির পরিবর্তে অপর একটি প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে। আমরা এই ভুলের জন্য আন্তরিক দুঃখিত এবং এই ভুল প্রদর্শনের জন্য লেখিকা শ্রীযুক্তা চৌধুরীর নিকট কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী আশ্বিন ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ হইতে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সাধারণ গ্রন্থাগার ২৩/১এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা - ৭০০০১২, কালীমন্দিরে স্থাপিত হইবে। সর্বসাধারণের নিকট ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও যোগ সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ মুক্তহস্তে দান করিয়া গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধির অনুরোধ জানাইতেছি। দান করা পুস্তক-পুস্তিকার প্রাপ্তিস্বীকার 'শৈবভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

চয়নিকা

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ

বিগত এক শতাব্দী ধরে বহু মনীষী ও গবেষক, যথা গ্রীয়াবসন্, ব্রীগস্, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, অমূল্য-চরণ বিদ্যাভূষণ, ডঃ মোহন সিং, হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, ডঃ কল্যাণী মল্লিক, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ, অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ স্বদেশীয় ও বিদেশীয পণ্ডিত নাথ-যোগি বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এঁদের রচনা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজলভ্য নয় আজকাল। তাই চয়নিকা স্তম্ভে এঁদেব রচনাব কিছু কিছু অংশ সংকলিত করা হচ্ছে, সাধারণ পাঠক-পাঠিকা অনুসন্ধিৎসু হয়ে অধিক-তর চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবেন।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ :

"নাথদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নাথেরা আপনাদিগকে কশ্যপ, সত্য, মীন, গোরক্ষ, আই, আদি, ভৈরব, বীর গোত্রের বলিয়া থাকে। এ ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য দুই একটি গোত্রের প্রচলন দেখা যায়। বটুক গোত্রের নাথ জুনাগড়ে আছে। বাঙলা দেশের নাথেরা অধিকাংশই কশ্যপ বা আই গোত্রের।"

(সংগ্রহ সূত্র-নাথপন্থ, প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৮ সাল)

ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় ঃ

"আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুর পাড়া। তারপর পশ্চিমপাড়া। ……এগুলি সব মুসলমানদের বসতি। এককালে ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান। তাই লোকে বলত—ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলের ভূমিরই অধিপতি ছিলেন না, মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের তামার ছাড়পত্র আজও এঁদের বাড়ীতে আছে। নানকার নিষ্কর জমির ছাড়পত্র। মূল বংশের আর কেউ আজ নেই। আমার বাল্য-কালেও কয়েকজনকে দেখেছি। মাথায় সাদা টুপী, সৌম্যদর্শন মুসলমান। কি মধুর ব্যবহার, কি মিষ্টি কথা।………

অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান করে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোনমতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় অপর কোন ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য, যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিল।"

(সংগ্রহ সূত্র—'আমার কালের কথা'-পৃ. ১৩৫-৩৬)

গ্রন্থ-পরিচয়

কাশীর যোগপ্রচারিণী সভা একসময় নাথ-যোগ তথা গোরক্ষ-যোগ সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছিলেন। যোগ প্রচারিণীসভা বর্তমানে বিলুপ্ত এবং তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদিও দুষ্প্রাপ্য। এ ছাড়া প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য সম্মিলন, হরিয়ানার বোহর মঠ, কর্ণাটকে যোগেশ্বর মঠ এবং কোন কোন প্রকাশন সংস্থা নাথ-যোগ সম্পর্কিত কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন বা করছেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ উত্তর প্রদেশের গোরখপুরস্থ 'গোরখনাথ মন্দিরে'র প্রকাশনা বিভাগ কিছু গ্রন্থ প্রকাশনায় ব্রতী হয়েছেন। দার্শনিক অধ্যক্ষ অধুনা প্রয়াত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত Philosophy of Gorakhnath and Gorakh-vacan Samgraha তাদের অন্যতম।

গ্রন্থকার ছিলেন মহাত্মা গম্ভীর নাথজীর সাক্ষাৎ শিষ্য এবং নাথ-যোগের বিশিষ্ট সাধক। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং হিন্দু ধর্ম সাহিত্যানুরাগী সাধারণ বাঙালী পাঠকের নিকট তাঁর নাম অপরিচিত নয়। বাংলাভাষায় রচিত তাঁর 'শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথ প্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীর নাথ উপদেশামৃত', 'সাধ্য-সাধন তত্ত্ব-বিচার' (১ম ও ২য় পর্ব) ধর্ম সাহিত্যানুরাগী বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থটি নাথ-যোগ তথা গোরক্ষ-যোগ দর্শন সম্পর্কে একটি সুবিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ গ্রন্থ। এ পর্যন্ত নাথ-যোগ সাধনা

সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শন সম্পর্কে কোন পৃথক গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ডঃ কল্যাণী মল্লিক তাঁর নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে নাথ-দর্শনের আলোচনা আছে বটে; কিন্তু তা সঙ্গত কারণেই সংক্ষিপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৺বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। তিনশত পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার বৃহদায়তন এই গ্রন্থটি ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ভূমিকা অংশ বাদে ১৬টি অধ্যায়ে লেখক গোরক্ষ-যোগের বিভিন্ন তত্ত্ব ও বৈশিষ্ঠগুলি উদ্‌ঘাটন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। মুখ্যতঃ গোরক্ষ-রচিত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র মূল দর্শন লেখকের ভিত্তি হলেও তিনি তাঁর গভীর, অধ্যয়ণ, মনন, বিচার নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সাক্ষর রেখেছেন প্রতিটি অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়ে (মহাযোগী গোরখনাথ) লেখক বলেছেন, গোরক্ষনাথ মুখ্যত যোগসাধনা প্রচার করলেও, তিনি প্রসঙ্গক্রমে একটি দর্শনও প্রচার করেছিলেন, যা ভারতীয় দর্শনে একটি বিশেষ স্থানের দাবী রাখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে গোরক্ষ-দর্শনের উৎস, বিশেষতঃ 'সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি'র মূল আলোচ্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গোরক্ষ-দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব, যথা পরমতত্ত্ব বা পরা সম্বিৎ, সং-চিৎ-আনন্দ, নিজশক্তিযুক্ত পরা সম্বিৎ, শিব-শক্তি-নিত্যযুক্ততা, শিব-শক্তি বিলাস, সমষ্টি ও ব্যষ্টি পিণ্ডোৎপত্তি, দেহরহস্য—চক্র, আধার, লক্ষ, ব্যোম, অবিদ্যা, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায়ে লেখক হিন্দুর অধ্যাত্ম সাধনার ক্রম বিকাশ সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গোরক্ষনাথের অবদান ও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে হিন্দু ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করণে তাঁর ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। পরিশিষ্টাংশে 'গোরক্ষ-বচন সংগ্রহ' নামে গোরক্ষোক্ত ১৭২টি সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এবং ভূমিকা লিখিয়াছেন রাজস্থানের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দ। গ্রন্থটির মূল্য ১৫ টাকা।

গোরক্ষ-যোগ দর্শনে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাকে আমরা এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে অনুরোধ জানাই।

—অধ্যাপক শ্রীশিশির কুমার মিত্র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা-১২ হইতে ২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কালীমন্দির নিবাসী প্রবীণ সমাজ-সংস্কারক শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচায মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে—

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতা

নামে একটি কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

"অতীত স্মৃতি"

—রচনাটি যেন কোনমতেই শৈবভারতীর পৃষ্ঠার ২৪ লাইনের অধিক না হয়।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৮

পুরস্কার প্রাপকদের নাম ও তাহাদের রচনা আগামী অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যায় ছাপা হইবে।

প্রথম পুরস্কার—**ত্রিশ টাকা** ★ দ্বিতীয় পুরস্কার—**পঁচিশ টাকা**

তৃতীয় পুরস্কার—**কুড়ি টাকা**

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পরিচালনায়—**বি. নাথ**

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্র (৩০) (৫'-১১") বি. এস-সি। সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুরুচী সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, ক্রীড়া ও কলাশিল্পে পারদর্শী। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সুপারভাইজারী পদে কর্মরত (১৩০০৲), পিতা ও পিতামহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। কালনা (বর্দ্ধমান) ও দিল্লীতে নিজগৃহ। ফর্সা, গ্রাজুয়েট ও কালচার্ড পাত্রী চাই। শ্রী এস. কে. নাথ। ১৬৮ নং টেগোর পার্ক। কিংওয়ে পোঃ দিল্লী পিনকোড ১১০০০৯ (সাম্প্রতিক ফটো ও জন্মকুণ্ডলী সহ যোগাযোগ করুন)।

পাত্রী (২২) (৫'-০") বি. এস-সি। শ্যামবর্ণা উত্তম মুখশ্রী স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সূচী ও বুনন শিল্পে অভিজ্ঞা। ইংরাজীতে টাইপ জানে এবং হিন্দীভাষা সম্পর্কে জ্ঞান আছে। পিতা রেলের অফিসার। উপযুক্ত পাত্র চাই। শিক্ষিত সরকারী বিদেশে কর্মরত (পঃ) আপত্তি নাই। শ্রীবিনয়ভূষণ দেবনাথ। ৩১।১৩ বেলেঘাটা মেন রোড। কলি-৭০০০১০।

পাত্রী (২৩) (৫'-৩") বি. এস-সি. ডিষ্টিংশন, গীটার শিল্পী, সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞা, সুন্দরী, মধ্যমবর্ণা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ অফিসারের কন্যা। শ্রীরাধেশ্যাম দেবনাথ, ১৮ আচার্য্য পাড়া লেন। হাওড়া—১

পাত্রী (২২) বি. এ. বেসিক ট্রেণ্ড, টাইপিষ্ট, শ্যামবর্ণা, মাঝারিগড়ন গৃহকর্ম ও হস্তশিল্পে নিপুণা। চাকুরীয়া বা ব্যবসায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীশশাঙ্কশেখর নাথ, নন্দন কানন, পোঃ নবপল্লী, বারাসত, ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২২) (৫') দশম মান, সুশ্রী গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকার্তিক দেবনাথ, দি রিলায়েবেল ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস। ১৩৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৩।

পাত্রী (২৯) প্রি. ইউ পাশ বেসিক ট্রেণ্ড প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। লম্বা, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী. সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুণা। সরকারী বা হাইস্কুলের শিক্ষক পাত্র চাই।

এবং

পাত্রী (২৬) বি. এ. বিএড্ পাশ, সুন্দরী দোহারা চেহারা সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকর্মে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীরাজমোহন চৌধুরী। গ্রাম ও পোঃ জাহান্নগর, জিঃ বর্দ্ধমান।

পাত্র (৩১) (৫'-১০") এম. এ. কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কর্মচারী (৮০০৲), স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, পিতামহ ও পিতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। বর্ধমানে ও দিল্লীতে নিজগৃহ। খেলাধুলা ও কলাশিল্পে পারদর্শী। সুশ্রী কালচার্ড, গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। শ্রী এস. কে. নাথ। ১৬৮নং টেগোর পার্ক, কিংওয়ে, পোঃ দিল্লী পিনকোড ১১০০০৯ (ফটো এবং জন্মকুণ্ডলীসহ যোগাযোগ করুন)।

পাত্রী (২২) (৫'-২") উচ্চমাধ্যমিক পাঠরতা, রং ফর্সা, উত্তম স্বাস্থ্য, গৃহকর্মে নিপুণা।

এবং

পাত্রী (২১) (৫'-১") রং ফর্সা, গৃহকর্মে নিপুণা, উচ্চমাধ্যমিক পাঠরতা, সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা। উভয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যাঙ্ক কর্মচারী সুউপায়ী পাত্র চাই। শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী, ৬০।২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১৩।

ফোন ২১-৩২৬০।

পাত্রী পূর্ব নিবাস ঢাকা জেলায়, অধুনা কলিকাতার উপকণ্ঠ নিবাসী সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র কন্যা। ১৯ বৎসর, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী, সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠনা, শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য উপাজনক্ষম সুপাত্র চাই। অনুসন্ধান করুন। —শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাথ। ৭৫।২এ রায় বাহাদুর রোড। বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৩৪।

বিঃ দ্রঃ পাত্র-পাত্রী বিভাগে বিবাহের বিজ্ঞাপনের হার পাঁচ লাইন পর্যন্ত পাঁচ টাকা। পরবর্তী প্রতি লাইনের জন্য এক টাকা।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে শৈবভারতীর বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশেষতঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা শৈব-নাথ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, জীবনী, আখ্যায়িকা, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি রচনা সাদরে গৃহীত হয়। রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—

শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া

পিন—৭৪১২৪৭

৭। গ্রাহক চাঁদা ও অন্যান্য বাবদ অর্থ পাঠাবার ঠিকানা।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ

৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিঃ দ্রঃ ঃ যাঁরা এককালীন একশত টাকা দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৯

সম্পাদক—সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

শ্রীশিব-স্তোত্রম্

প্রজেশং মহেশং মেশং সুরেশং
গণেশং দিনেশং নিশেশং পরং বা।
ন জানামি চান্যং শরণ্যং ভজামি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জল বানলে পর্বতে শত্রু মধ্যে।
অরণ্যে শ্মশানে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনস্তথা ক্ষীণচেতাঃ।
অঘোঘ প্রবিষ্টঃ সদা ত্বং ভজামি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

য ইহ পঠতি ভক্ত্যা স্তোত্রমেতৎ সমগ্রং
স ভবতি নরপূজ্যো মাননীয়ো নৃপাণাম্।
বহুকুলজনভর্তা পূর্ণকামঃ কবীন্দ্রঃ
সকল ভুবনধাতস্ত্রাহি মাং ভো নমস্তে ॥

ইতি শ্রীশিব-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

নববর্ষ

শ্রীচন্দ্রশেখর নাথ

কতকাল ঘুরি ফিরি হে অনন্তকাল,
রচিতেছ রাত্রিদিন, সকাল বিকাল।
দুঃখ দৈন্য ভাঙ্গাগড়া আশা ও নিরাশা
হারানোর পরিতাপ বিজয়ের হাসা।
ষড়ঋতু বারোমাস পর্য্যটন শেষে
যাত্রা ও সমাপ্তিরেখা একসাথে মেশে।
আবার করিব যাত্রা পথ পুরাতন—
বৈচিত্র্যের মাঝে খুঁজি নবীন জীবন।

আলোকবর্তিকা হাতে থাকি সাথে সাথে
স্খলনে পতনে যিনি ধরেন দু'হাতে,
খেয়াপারে তরী নিয়ে হয়ে কর্ণধার
জীবনের সিন্ধু যিনি করে দেন পার,
প্রণিপাত রাখি তাঁর চরণের পাশে
নূতন উদ্যমে যাত্রা নবীন বরষে।

— — —

সম্পাদকীয়

বাংলা ১৩৮৮ সালের শেষলগ্ন। পুরোনো বছরের শেষ হবে, শুরু হবে নতুন বছর। সারা বছর ধরে আমাদের জীবনে জমেছে অনেক আবর্জনা।

ভালো-মন্দ মিশিয়ে মানুষের জীবন। মানুষ মন্দকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারে না। আমরাও পারিনি আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অন্যায়-অনাচারকে বর্জন করতে। আমাদের সেই অন্যায়-অনাচার জমতে জমতে, বছরের শেষে, বিরাট আবর্জনা স্তূপে পরিণত হয়েছে। সেই পুঞ্জিভূত আবর্জনাস্তূপ অচলাসুরের রূপ ধরে আমাদের জাতীয়-জীবনকে করছে ভারাক্রান্ত।

এই পার্থিব জগতেও, বছরের শেষে, আবর্জনার পাহাড় তৈরী হয়, নিশেষিত হয় সকল প্রাণোচ্ছ্বাস। আবার আবর্জনার অপসারণের মধ্য দিয়েই, নতুন বছরের শুরুতে, নতুন প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে এই পার্থিব-জগৎ।

প্রকৃতিতে, বিশেষত বঙ্গ-প্রকৃতিতে, বর্ষশেষে মহা-মহেশ্বর রুষ্ট-রুদ্র-রূপ ধারণ করেন। সেই রুষ্ট-রুদ্র কালবৈশাখীর কালে আবির্ভূত হয়ে শুরু করেন তাঁর প্রলয়-নৃত্য। ফলে অচলাসুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অপসারিত হয় সকল আবর্জনা। প্রবল বর্ষণের পর রুষ্ট-রুদ্র আবার শান্ত-শিব-রূপ ধারণ করেন এবং নববর্ষের সূচনায় নবজীবনের আশ্বাস ধ্বনিত করেন, প্রবাহিত করেন নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার স্রোত, সৃষ্টি করেন প্রতিটি শিরা-উপশিরায় নতুন প্রাণ-স্পন্দন।

বর্ষশেষ এবং বর্ষারম্ভের এই সন্ধিলগ্নে, তাই আমাদের সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত হোক,—হে মহেশ্বর! তুমি রুষ্ট-রুদ্র-রূপে আবির্ভূত হও; তুমি আমাদের জাতীয় জীবনে পুঞ্জিভূত সমস্ত অন্যায়-অনাচার ধ্বংস কর, অপসারিত কর সকল আবর্জনা স্তূপ; তারপর তুমি বর্ষণ কর তোমার করুণা আমাদের ওপর এবং অবশেষে তুমি পরম-কল্যাণময় শান্ত-শিব-রূপ পরিগ্রহ করে, নববর্ষের সূচনায়, আমাদের জাতীয়-জীবনে নবজীবনের আশ্বাস ধ্বনিত কর, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহিত কর, সৃষ্টি কর চারদিকে নতুন প্রাণস্পন্দনের ঢেউ।

‘শৈবভারতী’র গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

‘শৈবভারতী’র গ্রাহকদের মধ্যে যাঁদের গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁরা অনতিবিলম্বে আট টাকা নিম্ন ঠিকানায় অথবা আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিব কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় ‘শৈবভারতী’ পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

টাকা পাঠাবার ঠিকানা:
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ
৫৭/এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
ক’লকাতা-৭০০০০৭

নাথগুরুগণ ও ভক্তিধর্ম

ডক্টর এম. সি. নাথ

প্রিন্সিপাল, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহারাষ্ট্রের সন্ত কবি জ্ঞানেশ্বরের নাম অনেকেই জানেন। ইনি প্রায় দশ সহস্র শ্লোকে গীতার মারাঠী ভাষ্য "জ্ঞানেশ্বরী" রচনা করেন। তাঁহাকেই মহারাষ্ট্রীয় ভক্তি ধর্মের আদি পুরুষ বলা হয়: "The unbroken tradition of the country is that the Bhakti movement beg an with a poet named Jnaneswara. ···There need be no doubt that he was the coryphaeus of the whole bhakti movement of the Maratha country.[৭] (ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কবি জ্ঞানেশ্বর হইতে, দেশে এই জনশ্রুতি একটানা চলিয়া আসিতেছে।···এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই যে ইনিই মহারাষ্ট্র জনপদে সমগ্র ভক্তি আন্দোলনের প্রধান নায়ক।) কিন্তু আমরা দেখিব জ্ঞানেশ্বর মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্মের আদি প্রচারক মাত্র, আদি প্রবর্তক নহেন। একথা জ্ঞানেশ্বর নিজেই জ্ঞানেশ্বরীতে বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানেশ্বরের গুরু তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তি নাথ। নিবৃত্তিনাথের গুরু গৈনি নাথ বা গহিনি নাথ। গৈনি নাথ গোরক্ষনাথের অন্যতম যোগ্য শিষ্য ছিলেন। নিবৃত্তিনাথ গৈনি নাথের নিকট যে ভক্তি ধর্ম প্রাপ্ত হন তাহাই তিনি নিজ শিষ্য ও অনুজ জ্ঞানেশ্বরে সঞ্চারিত করেন। জ্ঞানেশ্বর গীতা ব্যাখ্যাচ্ছলে উহাই প্রচার করেন। এ সম্পর্কে জ্ঞানেশ্বরী হইতে কিয়দংশ (বঙ্গানুবাদ) উদ্ধৃত হইতেছে[৮]: "বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থের যাহা কিছু মহত্ত্ব

৭। J. N. Farquher কৃত An Outline of the Religious literature of India, পৃ: ২৩৪-২৩৫ দ্রষ্টব্য।

৮. জ্ঞানেশ্বরী, ১৮শ অধ্যায়, উপসংহার।

তাহা সবই নিবৃত্তি নাথজীর। এই প্রবন্ধকে আপনারা পাঠকগণ আমার রচনা মনে করিবেন না, কারণ ইহা গুরুনাথের কৃপার ফল মাত্র।"

জ্ঞানেশ্বর কিভাবে গুরুনাথের (অর্থাৎ গুরু নিবৃত্তিনাথের) কৃপা প্রাপ্ত হইলেন তাহা বলিতেছেন[২]—

"অতি প্রাচীনকালে ক্ষীর সমুদ্রের তটে শিব পার্বতীর কর্ণে যে রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন, ঐ সমুদ্র তরঙ্গ নিবাসী মকরের উদরে অবস্থিত মৎস্যেন্দ্রনাথ তাহা অধিগত করেন। অতঃপর সপ্তশৃঙ্গী পর্বতে হস্তপদহীন চৌরঙ্গীনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথের সমীপে উপনীত হন। মৎস্যেন্দ্রনাথের দর্শন মাত্রই চৌরঙ্গীনাথের কর্তিত হস্তপদ পুনর্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মৎস্যেন্দ্রনাথ সদা সমাধি মগ্ন থাকিবেন এইরূপ নিশ্চয় করতঃ স্বীয় অধিগত যোগবিদ্যা গোরক্ষনাথকে শিক্ষা দেন। গোরক্ষনাথ ছিলেন যোগ-রূপী কমলের সরোবর (অর্থাৎ যোগবিদ্যার আকর) এবং বিষয় বিনাশক কাল (=পরম বৈরাগ্য সম্পন্ন)। মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করতঃ তাঁহাকে নিজ গদীতে অধিষ্ঠিত করিলেন। তারপর আদিনাথ শিবের সময় হইতে পরম্পরাক্রমে যে অদ্বৈতজ্ঞান চলিয়া আসিতেছিল। গোরক্ষনাথ উহা গৈনিনাথকে সমূল উপদেশ দিলেন। গৈনিনাথ দেখিলেন যে কলি-কাল ভূতমাত্রকে গ্রাস করিতেছে। তখন তিনি নিবৃত্তিনাথকে আদেশ করিলেন—"আদিশঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া শিষ্য পরম্পরায় আমা পর্যন্ত রহস্য বা যোগবিদ্যার যে সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, তুমি এই সম্প্রদায় গ্রহণ কর আর কলির গ্রাস হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া যাও।" নিবৃত্তিনাথ স্বভাবতঃই অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। ইহার উপর গুরুর ঈদৃশ আদেশ। জগৎবাসীকে শান্তির সন্ধান দিবার জন্য নিবৃত্তিনাথ বর্ষাকালীন মেঘের

২. ঐ; জ্ঞানেশ্বর কৃত "অমৃতানুভব" গ্রন্থ; J. N. Farquhar—Outline of Religious literature of India. p. 235 (১নং পাদটীকা সহ)

ন্যায় উদিত হইলেন। সেই সময় দুর্গত মানবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া গীতা ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি শান্তরসের যে বর্ষা সৃজন করেন, উহাই এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়া আছে। ঐ সময় আমি (জ্ঞানেশ্বর) জাতক-পক্ষীর ন্যায় সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। গুরুপরম্পরায় আত্মসমাধিরূপ যে বস্তু আমার গুরু মহারাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহাই এই গ্রন্থের মাধ্যমে উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে দান করেন। যদি তাহা না হইত, তবে লেখাপড়া না জানিয়াও আমি কিভাবে এই গ্রন্থ রচনা করিলাম? গুরুদেব আমাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া এই গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন।……আমাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার গুরুদেবই প্রকৃতপক্ষে এই সব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।…."

সুতরাং আর সংশয়ের অবকাশ নাই যে জ্ঞানেশ্বর প্রচারিত ভক্তিধর্ম নিবৃত্তিনাথ হইতে প্রাপ্ত এবং নিবৃত্তিনাথ উহা গৈনিনাথ হইতে প্রাপ্ত হন। নিবৃত্তিনাথ কিরূপে গৈনিনাথের কৃপা লাভ করে করেন এ সম্পর্কে কথিত আছে যে আট বৎসর বয়সে একদা নিবৃত্তিনাথ এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক পর্বতগুহায় প্রবেশ করেন। ঐ গুহায় গৈনিনাথ অবস্থান করিতেছিলেন। নিবৃত্তিনাথ তাঁহার চরণে নিপতিত হন। গৈনিনাথ বালক নিবৃত্তিনাথের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিয়া লন। তারপর জগতে কৃষ্ণ উপাসনা প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন।[১০] নিবৃত্তিনাথ কৃষ্ণভক্তি প্রচার মানসে অনুজ জ্ঞানেশ্বরকেও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় জ্ঞানেশ্বরী রচিত হয়। জ্ঞানেশ্বরী রচনাকালে জ্ঞানেশ্বর মাত্র পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক ছিলেন।[১১] আর নিবৃত্তিনাথের বয়স ছিল তদপেক্ষা দুই বর্ষ অধিক। জ্ঞানেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোপানদেব এবং সর্ব

১০. বাবু রামচন্দ্র বর্মা কৃত "হিন্দী জ্ঞানেশ্বরী", পৃ. ৪-৫।

১১. ঐ, পৃ. ৭।

কনিষ্ঠ ভগ্নী মুক্তাবাঈও নিবৃত্তিনাথের নিকট একই ভক্তিমার্গে দীক্ষিত হন।[১২] ইহারা ভ্রাতাভগ্নী সকলেই অবিবাহিত জীবনযাপন করেন। জ্ঞানেশ্বরী রচনার পর জ্ঞানেশ্বর তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং সর্বত্রই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। তীর্থযাত্রা সমাপনান্তে মাত্র একবিংশতি বৎসর বয়সে জ্ঞানেশ্বর যোগবলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের দুই বৎসরের মধ্যেই নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব এবং মুক্তাবাঈও পরপর দেহরক্ষা করেন।

বলা বাহুল্য, নাথ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়া এই ভ্রাতা ভগিনী সকলেই নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বর তাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেশ্বর নাথ। জ্ঞানেশ্বর নাথজীর পিতা ও পিতামহের আমল হইতেই এই পরিবারের সহিত নাথ সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়: "There were very close relations between Jnaneswar's for bears for two or three generations and the Nath sect".[১৩] (= জ্ঞানেশ্বরের উর্ধতন দুই কি তিন পুরুষ এবং নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল[১৪])।

এই আলোচনায় ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্ম প্রচারের মূলে তিন নাথ—গৈনিনাথ, নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বর-নাথ। গৈনিনাথের নির্দেশে, নিবৃত্তিনাথের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং জ্ঞানেশ্বরনাথের লেখনী ধারণে এই কার্য আরম্ভ হয়। [ক্রমশঃ]

১২. বাবু রামচন্দ্র বর্মা কৃত 'হিন্দী জ্ঞানেশ্বরী", পৃ. ৯।

১৩. George Weston Briggs—Gorakhnath and the Kanphata Yogis, p. 242; V. L. Bhave—Maharastra Saraswat, vol. I. p. 41.

১৪. কথিত আছে জ্ঞানেশ্বরের পিতা বিট্ঠল পন্থও গৈনিনাথের শিষ্য ছিলেন। (দ্রষ্টব্য গ্রন্থ: Briggs—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৪২; R. L. Paugarkar—শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ চরিত্র, পৃ. ৩২; অভঙ্গ গাথা, পৃ. ৪২)।

শিক্ষা ও স্বজাতীয় সংস্কৃতি

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির একমাত্র সহায়ক

—ধীরেন দেবনাথ, এম. এস-সি., বি. এড.

সমগ্র বিশ্বের হিন্দুধর্ম শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মের সমবায় এবং প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। নাথধর্ম হচ্ছে সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত শৈবধর্মের পাশুপাত শাখার একটি প্রশাখা মাত্র। এই শৈবনাথ ধর্মের আচার্যগণ ছিলেন আদি গুরু। পরবর্তীকালে শাক্তধর্মের আবির্ভাবে শৈব নাথ গুরুগণ দু'ভাগে বিভক্ত হন—শৈব গুরু ও শাক্ত গুরু। প্রথমে শৈব গুরুগণ সকলেই গৃহী ছিলেন এবং পিতা-পুত্র ক্রমে যোগসাধনা করতেন। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকে গৃহাশ্রম বর্জন করে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। এইভাবে শৈব নাথগণ দু'টি বংশে—যোনিবংশে এবং বিন্দুবংশে বিভক্ত হ'য়ে পড়েন। যোনিবংশে পিতা-পুত্র ক্রম বজায় থাকে; আর বিন্দুবংশে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যোগসাধনা চলতে থাকে। তাই বিন্দুবংশ ও যোনিবংশের নাথগণ জাতিগতভাবে একটি মৌলিক জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অপরাপর জাতির ন্যায় এই জাতিরও আছে সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ একটি নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি। বিতর্কিত বিষয় হলেও যোগীগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীন নাথই যে ছিলেন বাংলাভাষার জনক ও আদি কবি তা' শাস্ত্র প্রমাণ করে। নাথ-সাহিত্য, নাথ-গীতিকা ইত্যাদি এই জাতির সুমহান ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। শিক্ষায় এ জাতি আজ আর খুব পিছিয়ে নেই। কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, এড্‌ভোকেট, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার ইত্যাদির অভাব নেই আজ এই জাতির মধ্যে। কিন্তু এই জাতির মধ্যে স্বজাতীয় চেতনার অভাব আজ সবচেয়ে বেশী দৃষ্টিগোচর

হয়। এই জাতির ইতিহাস আজ এঁরা অনেকেই জানেন না; তাঁরা জানেন না তাঁদের জাতিগত পরিচয়। তাইতো যখন প্রশ্ন জাগে নাথদের জাতিগত পরিচয় কি? তখন অনেকেই অস্বস্তি বোধ করেন। কী পরিচয় দেবেন হঠাৎ ভেবে পান না। আত্মবিস্মৃত জাতির কলঙ্ক মেখে অজ্ঞের মত নিজেকে কেউ শূদ্র, কেউ কায়স্থ, কেউ তাঁতি—এমন কি কেউ প্রচলিত কথায় যুগী পরিচয় দিয়ে থাকেন। যদিও 'যুগী' শব্দটি 'যোগী' (যোগী ব্রাহ্মণ) শব্দেরই অপভ্রংশ তবু সমাজের এক শ্রেণীর লোক যুগী বলতে বোঝে—নীচ জাতিকে। এই জাতির কাছে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক আর কি হতে পারে? শিক্ষায়-দীক্ষায়, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-গুণে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি হওয়া সত্ত্বেও সে আজ জাতি-পরিচয়হীন অথবা বিজাতীয় পরিচয়ে পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকেই এই জাতির উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তবান সন্তানদের অনেকেই স্বজাতীয় বিশেষপদবা 'নাথ' ত্যাগ করে ভিন্‌জাতীয় পদবী গ্রহণ করে আসছেন। এঁদের কেউ কেউ আবার স্বজাতির পরিচয় দিতে অপমান বোধ করেন। কিন্তু যখন তাঁদের পুত্র-কন্যার বিবাহ স্বজাতির মধ্যেই হয়ে যায় তখন জাতীয় পরিচয় কি আর গোপন থাকে? আসলে এ গোপনীয়তা, অজ্ঞতা ও হীনমন্যতাপ্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এই জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষার সাথে সাথে জাতিগত পরিচয় তথা স্বজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। তা'হলে জানা দরকার নাথদের জাতিগত পরিচয় কি? স্বজাতীয় সংস্কৃতিই বা কি?

প্রথমেই আসা যাক্, নাথদের জাতিগত পরিচয়ের কথায়। ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদির মতে ব্রহ্মার ললাট থেকে রুদ্রতেজে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি। এই রুদ্রগণ হলেন—মহান্, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঋতুধ্বজ, উর্ধকেশ, পিঙ্গলাক্ষ, রুচি, শুচি ও কালাগ্নি। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর একাদশ কন্যাকে এই একাদশ

রুদ্রকে সম্প্রদান করেন। এই একাদশ কন্যারা হলেন যথাক্রমে কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, কলহপ্রিয়া, কন্দলী, ভীষণা, রাস্না, প্রাম্লচা, ভূষণা ও শুক্লী। একাদশ রুদ্রের বীর্যে ও একাদশ রুদ্রপত্নীর গর্ভে বহু শিবভক্ত রুদ্রসন্তান জন্মলাভ করেন। এই রুদ্রগণ থেকেই এই জাতির উৎপত্তি। রুদ্রগণ ছিলেন মহাযোগী। তাই বংশপরম্পরায় নাথেরা যোগী ও রুদ্রজ। একাদশ রুদ্রের নামানুসারে নাথদের গোত্র সংখ্যা একাদশ। যেমন—মহান্ শিবগোত্র, মহাত্মা শিবগোত্র, মতিমান শিব-গোত্র ইত্যাদি। যেহেতু একাদশ রুদ্রই ছিলেন শিবতুল্য সেহেতু, প্রতিটি গোত্রের সাথেই 'শিব'-নাম যুক্ত। রুদ্রগণের কর্ম ছিল ধ্যান, যোগসাধনা, গুরুগিরি, পৌরোহিত্য প্রভৃতি। পরিধেয় বস্ত্র শ্বেত বা গৈরিক এবং এরা পবিত্র উপবীত, যোগপট্ট, ত্রিশূল, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি ধারণ করতেন। বিন্দুবংশে এখনও এগুলো বহুলাংশে বজায় থাকলেও, যোনিবংশে এগুলো বিশেষতঃ বাংলাদেশে, অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছে বলা চলে। বর্তমানে বাংলাদেশে যোনিবংশের একটা অংশ কেবলমাত্র পবিত্র উপবীত ধারণ করেন। যোগীনাথাচার্যগণের মধ্যে সবগুরু আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, গম্ভীরনাথ, জ্ঞানেশ্বরনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাথযোগীরা গুরুস্থানীয়। অতীতকালে বিভিন্নজাতির লোক কর্তৃক নাথযোগীরা পূজিত হতেন এবং তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন। ভারতের কোথাও কোথাও এবং নেপালে এখনো নাথ যোগীরা পূজ্য। নেপাল রাজের রাজমুকুটে যোগী গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের পদচিহ্ন একথার সত্যতা প্রমাণ করে। প্রাচীনকালে যোনি ও বিন্দুবংশের নাথগণ যোগবলে যোগী হয়ে 'নাথত্ব' লাভ করতেন। (ন+অথ)—নাথ কথার অর্থ গুরু, প্রভু, স্বামী ইত্যাদি অর্থাৎ যার আর পর নেই। গৃহী নাথেরাও যোগী হতেন যোগসাধনার মাধ্যমে। কিন্তু গৃহী নাথদের ক'জন আজ যোগসাধনায় অভ্যস্ত? যাঁরা সংসারী হয়েও যোগাভ্যাস করে থাকেন তাঁরাই কেবল নিজেদের যোগী বলে

পরিচয় দিতে পারেন ; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। অপরপক্ষে, যে নাথেরা যোগসাধনার ধারই ধারেন না তাঁদের যোগী বলে পরিচয় দেওয়াটা হাস্যকর। 'বৃক্ষ তোমার নাম কি, ফলে পরিচয়।' কাজেই যোগ না করে যোগী পরিচয় দিলে অন্য জাতির মানুষ দ্বারা যোগীর পরিবর্তে যুগীরূপে আখ্যায়িত হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আধুনিক কালের সংসারী নাথদের পক্ষে যোগাভ্যাস সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তবে কি পৃথিবী থেকে যোগী পরিচয় মুছে যাবে ? না, যাবে না ; যদি যোগ সাধনার মাধ্যমে নাথেরা যোগী হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও ধর্মালম্বী লোকেরা যোগ বলে যোগী হতে পারেন। তাঁদের সাথে নাথ যোগীদের পার্থক্য হ'ল—নাথ যোগীদের জন্ম যোগী কুলে ; আর তাঁদের জন্ম যোগী কুলে নয়। ঋষি অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে যোগী কিন্তু এঁদের কারোরই জন্ম যোগী কুলে হয়নি। পবিত্র গীতায় আছে—

"অথবা যোগিনামেব কুলেভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম॥"

অর্থাৎ যাঁরা যোগীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁরা বুদ্ধিমান হন এবং এরূপ দুর্লভ বংশে জন্ম সচরাচর দেখা যায় না। এখানে 'যোগিকুল' বলতে রুদ্রজ-নাথ-যোগীদের কুলকেই বোঝান হচ্ছে। কারণ, যুগযুগ ধরে পুরুষানুক্রমে চলে আসলেই কুল বা বংশ সৃষ্টি হয়। এক পুরুষেই কুল সৃষ্টি হয় না। তাই যতদিন নাথেরা যোগাভ্যাস করেছেন ততদিন তাঁদের যোগীকুল নাম সার্থক ছিল। আজ নাথদের একটা ক্ষুদ্র অংশ যোগাভ্যাসদ্বারা যোগীকুলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই যা। শাস্ত্রানুসারে নাথ, যোগী ইত্যাদি কোন জাতি নয়। সম্প্রদায় মাত্র। কারণ, বেদ-পুরাণাদিতে উল্লেখিত জাতিগুলির মধ্যে নাথ, যোগী প্রভৃতি নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলে নাথ-যোগীরা (রুদ্র থেকে যাঁদের উৎপত্তি) বেদ বহির্ভূত আধুনিক জাতিও নয়। প্রাচীনকালে অব্রাহ্মণদের যোগ-সাধনার কোন অধিকার ছিল না। সুতরাং, রুদ্রজ-

নাথ-যোগীগণ যে ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত তাতে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। কাজেই যাঁরা নাথ বা যোগী সম্প্রদায়'কে—'জাতি'রূপে চিহ্নিত করে বেদ বহির্ভূত জাতি হিসেবে দেখাতে চাচ্ছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে মূর্খের রাজ্যে বাস করছেন। অপর পক্ষে, নাথদের বেদ হ'ল—'সাম', দশদিনে অশৌচ পালন, পাঁচতান্নে পিণ্ডদান, দেবদেবীকে অন্ন-ভোগ প্রদান, নারায়ণ শিলার অর্চনা, উপনয়ণ, পৌরোহিত্য ইত্যাদি ব্রাহ্মণেরই পরিচয়। বর্তমানকালে নাথদের অনেকেই শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে উপবীত ধারণ করছেন। এ অধিকার ব্রাহ্মণদেরও রয়েছে। নাথেরা যেহেতু রুদ্রের সন্তান সেহেতু তাঁরা রুদ্রজ। আবার রুদ্রগণ যেহেতু ব্রহ্মার মুখ মণ্ডলের সর্বোচ্চস্থান ললাট থেকে জাত সেহেতু রুদ্রসন্তান নাথগণ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ। আবার রুদ্রগণ শিব হতে অভিন্ন তাই তাঁরা শৈব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নাথদের জাতিগত পরিচয় 'রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ' হওয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসম্মত।

এবার আসা যাক্ নাথদের স্বজাতীয় সংস্কৃতির কথায়। এর আগে আমাদের পরিচিত হতে হবে স্বজাতীয় সংস্কৃতির সাথে। কোন জাতির ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, জীবনযাত্রা নির্বাহ প্রণালী, সঙ্গীত-কাব্য-সাহিত্যচর্চা, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাদক, বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য ইত্যাদি ঐ জাতির স্বজাতীয় সংস্কৃতি। হিন্দু ধর্মের অধীন প্রতিটি জাতির নিজনিজ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতিরও আছে একটি নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি। এই নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতিকেই বলে স্বজাতীয় সংস্কৃতি।

একদা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতি সমগ্র ভারতবর্ষে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও গুরুকুল হিসেবে চিহ্নিত ছিল। বৈদিকযুগের অন্তিমকালে ব্রাহ্মণগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল বেদের কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী হয়ে যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকেই ধর্মবলে গ্রহণ করেন। এই দল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হন। অন্যদল, যজ্ঞকে অস্বীকার না করেও

বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অবলম্বন করে যোগ সাধনাকে প্রাধান্য দিয়ে যোগ বলে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন। এঁরাই যোগী ব্রাহ্মণরূপে পরিচিতি লাভ করেন। এই যোগী ব্রাহ্মণ-গণের আদি পুরুষগণকেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রুদ্রগণের সন্তানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যোগি বংশের নাথগণ (গৃহস্থ) আসলে যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ঋক বেদেও এই রুদ্রের উল্লেখ আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি শৈব নাথ গুরুগণ সর্ব-সাধারণের মধ্যে অহিংস শৈব-যোগ ধর্ম প্রচার করেন এবং এই প্রচারাভিযান ১১৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। এ যাবৎকাল যোগিবংশের শৈব নাথেরা ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারাদি এবং যোগ ধর্ম পালন করেন। এর পরবর্তী ইতিহাস কলঙ্কময় অর্থাৎ ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই জাতির অধঃপতন শুরু হয়। বঙ্গাধিপতি অত্যাচারী বল্লাল সেনের পুরোহিতদের সঙ্গে জটেশ্বর শিব মন্দিরের নাথ পুরোহিতদের মধ্যে বিবাদ, বল্লালের পিতৃশ্রাদ্ধের দান গ্রহণে অস্বীকৃতি ইত্যাদি কারণে নাথ পুরোহিতগণ রাজা বল্লাল কর্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পতিত হন এবং নাথদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। এই অপমানে পিতাম্বরনাথসহ কেউ কেউ বাংলা ছেড়ে উত্তর ভারত ও নেপালে চলে যান যাঁরা যেতে পারেননি তাঁদের অধিকাংশই শত অপমান সহ্য করে, সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে শূদ্রের জীবিকা গ্রহণ করেন। এই ভাবে প্রায় আটশ বছর কেটে যায় এবং এই জাতি এরই মধ্যে একটা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়। এই সুদীর্ঘকালে বঙ্গদেশে এই জাতির ইতিহাস লোক সমাজে প্রায় লুপ্ত হয়ে পড়ে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ৺ভরত চন্দ্র শিরোমণি মহোদয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই চৈত্র তারিখে সর্ব প্রথম এই জাতিকে শ্রেষ্ঠজাতি বলে এক ঘোষণা প্রকাশ করেন এরপর বিভিন্ন স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও জমিদারগণ এই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন এবং উপনয়নের অনুমতি প্রদান করেন। এইসব স্বীকৃতির পরেই

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই জাতির পুনরুত্থান সূচিত হয়। এই সময় নাথদের কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক উপনয়ন সংস্কারাদি গ্রহণ করেন—এমন কি পৌরোহিত্য কার্যেও ব্রতী হন। আজ অবধি ঐ নিয়ম বলবৎ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপনয়ন, যা' ব্রাহ্মণের অবশ্যই গ্রহণীয়, তা' নাথদের ক'জন গ্রহণ করেছেন? নাথদের ক'জন তাঁদের মূলধর্ম শৈব ধর্মের আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন? যোগ সাধনার জন্য যে নিরামিষাশী হওয়া প্রয়োজন তা' ক'জন মেনে চলছেন? বল্লালের রাজত্ব পর্যন্ত নাথদের কাব্য-সাহিত্য চর্চার যে স্রোতধারা প্রবাহমান ছিল তা' আজ আর নেই বললেই চলে। আজ নাথদের অনেকে শৈব-নাথগুরু গণকে ভুলে শাক্তগুরুর নিকট শাক্তমতে, বৈষ্ণব (গোস্বামী) গুরুর নিকট বৈষ্ণবমতে, অথবা অন্য কোন শ্রেণীর গুরুর নিকট গুরুর নিজস্ব মতে দীক্ষা গ্রহণ করছেন। অথচ, একদিন শৈব-নাথ গুরুগণের নিকট সর্ব শ্রেণীর লোকেরা দীক্ষা গ্রহণ করে কৃতার্থ হতেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিপতি যে শিব নাথদের উপাস্য দেবতা ও ত্রাতা সেই শিবকে ভুলে নাথেরা আজ পূজা করছেন বিভিন্ন দেবদেবী ও মহা-পুরুষদের। অধিকাংশ নাথদের গৃহে আজ শিবের প্রতিকৃতি (ফটো) বা মূর্তির পরিবর্তে এঁদের প্রতিকৃতি বা মূর্তি শোভা পাচ্ছে। যে নাথদের পূজা-পার্বণ একদিন স্বশ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা সম্পাদিত হত, অন্য শ্রেণীর পুরোহিতদের এ সকল কাজের কোন অধিকার ছিল না, সেই নাথদের অনেকেই আজ অন্য শ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা নিজেদের সামাজিক ও ধর্মীয় কাজগুলো সম্পন্ন করিয়ে থাকেন। অনেকদিন আগে থেকেই এই সকল পুরোহিতদের কেউ কেউ আবার নাথদের সামাজিক ও ধর্মীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পরোক্ষভাবে নাথদেরই অপমান করে আসছেন। এই অপমান হজম করেও এঁরা অন্য শ্রেণীর পুরোহিত বর্জন করে নিজেরা উৎযোগী হয়ে পৌরোহিত্য কর্মে এগিয়ে আসছেন না। আর যোগাভ্যাস নাথেরা তো এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছেন। আজ যে যোগ-ব্যায়াম

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্নদেশের লোক কর্তৃক গৃহীত ও প্রসংশিত হচ্ছে, সেই যোগ-ব্যায়াম নিজেদের হওয়া সত্ত্বেও তা' থেকে নাথেরা আজ বিরত। যোগাসন নাথদের অবশ্য করণীয়। এক কথায় নাথেরা আজ অনেকেই স্বজাতীয় সংস্কৃতি বর্জিত। তাই বলতে ইচ্ছে হয়—

রুদ্র-সন্তান নাথ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ,
ভুলেছে সংস্কার তাই এ অধঃপতন।

পরিশেষে একথা বলা সঙ্গত যে, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার সাথে স্বজাতীয় সংস্কারাদি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যদি নিজস্ব জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কার সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান না থাকে তবে পদে পদে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। এটা কোন সাম্প্রদায়িকতা নয়। স্বামীজী বলেছেন—আগে নিজেকে জানতে, তারপর অন্যকে। নিজেকে না জেনে অন্যকে জানা যায় না। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিজেকে জানার তো প্রয়োজন আছে। তাই আজ নাথদের অবশ্য প্রয়োজন উপনয়ন গ্রহণ পূর্বক পৈতা ধারণ. শৈব-নাথগুরুর নিকট শৈবমতে দীক্ষা গ্রহণ, খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে শৈব-নাথ ধর্মের রীতিনীতি অনুসরণের চেষ্টা. অন্ততঃ দৈনিক এক সন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও শিবনাম —'ওঁ নমঃ শিবায়' উচ্চারণ, কাব্য-সাহিত্য সঙ্গীত চর্চা, ধর্মালোচনা, স্বশ্রেণীর পুরোহিত দ্বারা পূজা-পার্বণ সম্পাদন, স্বশ্রেণীর পুরোহিতের অভাবে নিজে পুরোহিতের কাজ শিখে পৌরোহিত্য, অহিংস নীতি অবলম্বন, অন্য সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে ভদ্র ব্যবহার ও বন্ধুত্ব স্থাপন. স্বজাতীয় সম্প্রীতি, গৃহে শিবের প্রতিকৃতি বা মূর্তি রাখা ও পূজা করা (গৃহে অবশ্য অন্য দেব-দেবী বা মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি বা মূর্তি রাখার বা পূজা করার কোন মানা নেই।), নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি। উপনয়নের মাধ্যমে পৈতা ধারণ করলে ও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিলে অজ্ঞ, নিন্দুকেরা হয়ত বলবে, যুগীরা ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করছে। এ কথার উত্তরে বলা যায়, নাথেরা ব্রাহ্মণ

ছিলেন, আছেন, থাকবেন ; ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা করছে—এটা সর্বৈব মিথ্যা। সগর্বে নিন্দুকদের নিন্দার জবাব দিয়ে যদি এই জাতির প্রতিটি লোক তাঁর নিজনিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে অবিচল থাকেন তাহলে একদিন আসবে যেদিন ঐ নিন্দুকেরাই আবার নাথদের ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করবেন। কারণ, 'Practice makes a man perfect.' অর্থাৎ অভ্যাসই মানুষকে নিখুঁত করে।

—ওঁ শিবম্ সত্যম্ সুন্দরম্!

নিম্নলিখিত ছাত্রদিগের শিক্ষার নিমিত্ত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে

শ্রীবিমলেন্দু দেবনাথ
গোসাবা, ২৪ পরগণা — ৪১'২০ টাকা

শ্রীদেবতোষ দেবনাথ
S/o, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ
হরিপুর, হাবরা,
২৪ পরগণা — ১৯০'০০ টাকা

বিঃ দ্রঃ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র অথচ মেধাবী রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ছাত্র/ছাত্রীকে পঁচিশ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হইবে। ১৯৮১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হইবার পর রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ ছাত্র-ছাত্রীগণ এই বিষয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশীটের প্রত্যয়িত নকল সহ আবেদন করিতে হইবে। ঐ আবেদন পত্রের সহিত প্রধান শিক্ষক এবং 'শৈবভারতী'র একজন গ্রাহকের সুপারিশ থাকিতে হইবে।

জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এবারে চড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যেতে পারে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ :—

প্রাক্-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মানব-শিশুই শূদ্র। এই শূদ্রের উপাস্য দেবতা গণপতি। গণপতি হচ্ছেন গণের পতি। 'গণ' শব্দের অর্থ সমূহ। শৈশবে প্রবৃত্তিসমূহ দেহকে কেন্দ্র করেই ক্রিয়াশীল হয়। তাই মনুষ্যদেহই আসলে গণপতি। মানব-শিশু তার আপন দেহের সেবার মধ্য দিয়েই গণপতির উপাসনা করে। আবার গণপতিই হচ্ছেন গণেশ। এই দেবতার অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ মানবের মতো, কিন্তু মস্তক করিমুণ্ড অর্থাৎ হাতীর মাথা। হাতী বিরাটকায় শক্তিশালী পশু। পশুর মুখমণ্ডল যেমন একমাত্র জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রেই ব্যাপৃত থাকে, মানব-শিশুর মুখমণ্ডলও তেমনি কেবলমাত্র জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে নিয়োজিত থাকে। হাতী যেমন কর বা শুড়ের সাহায্যে আকর্ষণ করে তার বিশাল-উদর-পূর্তির জন্য মুখগহ্বরে সমস্ত কিছু নিক্ষেপ করে, অতি শৈশবে, মানব-শিশুও তেমনি যা পায় তাই হাতে ধরে মুখে পোরে। উদর-পূর্তিই শিশুর একমাত্র লক্ষ্য। তাই তো, বোধ হয়, গণেশ লম্বোদর। শৈশবে শিশুর প্রধান কাজ আপন দেহের সেবা করা। সুস্থ দেহ ধারণ করেই তো সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় এবং সিদ্ধিলাভ করা চলে। তাই, এক অর্থে, সুস্থ মানব-দেহকেই সিদ্ধিদাতা বলা চলে। তাই তো, বোধ হয়, বলা হয়ে থাকে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

যাঁরা সংস্কৃত হন না, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সাধনা করেন না অথচ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন অর্থাৎ, তত্ত্বগতজ্ঞান অর্জন না করেই কর্ম-সাধনায় ব্রতী হন, তাঁদের প্রবৃত্তি সমূহ একান্তভাবে দেহকেন্দ্রিকই থেকে যায়। এঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমের সকল কর্মই করেন; তবে পেছনে তত্ত্ব-জ্ঞান না থাকায় এই সমস্ত কর্ম কিছুটা পশুকর্মের ন্যায় অচেতন ভাবেই সম্পাদিত হয়। তাই বোধ হয়, গণেশও বিষ্ণুর ন্যায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁর মস্তক ও মস্তিষ্ক শক্তিশালী পশু হস্তীর ন্যায়।

সাধনার চরম স্তর পর্যন্ত সুস্থ দেহ-ধারণ অত্যাবশ্যক। সুস্থ-দেহ-ধারণ ব্যতিরেকে কোন স্তরের কোন সাধনা বা উপাসনাই চলতে পারে না। তাই, বোধহয়, বলা হয়েছে,—সকল দেবতার পূজার আগেই গণেশের পূজা করণীয়।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সাধক হচ্ছেন বৈশ্য। এই আশ্রমে সাধনার সিদ্ধিতে তিনি ব্রহ্মা আর সিদ্ধির আগ পর্যন্ত ব্রহ্মা তাঁর উপাস্য দেবতা। এই আশ্রমে সাধনার মধ্যে দিয়ে তিনি লাভ করেন যে শক্তি তা হচ্ছে তত্ত্বগতজ্ঞান (theoretical knowledge)। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে সরস্বতী কল্পিত। তাই, বোধ হয়, ব্রহ্মার পত্নী হিসেবে দেবী সরস্বতীকে কল্পনা করা হয়েছে। এই শক্তি কিন্তু পূর্ণ বা আদ্যা-শক্তি নন, আদ্যাশক্তির অংশ মাত্র।

গার্হস্থ্যাশ্রমের সাধক হচ্ছেন ক্ষত্রিয়। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আগ পর্যন্ত তাঁর উপাস্য দেবতা বিষ্ণু এবং সিদ্ধিতে তিনি নিজেই বিষ্ণু। এই আশ্রমে সাধনার মধ্য দিয়ে দুটি শক্তি অর্জন করা যায়—একটি সম্পদ (wealth) [কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সম্পদ অর্জিত হয়], অপরটি ব্যবহারিক জ্ঞান (practical knowledge)। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী এবং আগেই বলা হয়েছে, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। সম্ভবত এই কারণেই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনেই বিষ্ণুর পত্নী হিসেবে কল্পিত হয়েছেন। এই শক্তিদ্বয়ও পূর্ণ বা আদ্যাশক্তি নন, আদ্যাশক্তির অংশমাত্র।

বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রমের সাধক হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। বানপ্রস্থাশ্রমের সাধক সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং যতি আশ্রমের সাধক যতি বা যোগী এই দুই আশ্রমের সাধকের উপাস্য দেবতা পঞ্চানন-শিব। সিদ্ধিতে তিনিই হয়ে যান পঞ্চানন-শিব। যোগ সাধনার মধ্যে দিয়ে যে শক্তি এই আশ্রমদ্বয়ে সাধক লাভ করেন তাই পূর্ণ বা আদ্যাশক্তি; তাই, বোধ হয়, আদ্যাশক্তি মহামায়া পরম যোগী শিবের পত্নী হিসেবে কল্পিত হয়েছেন। একমাত্র যোগের মাধ্যমেই প্রজ্ঞা আসতে পারে; আবার তৃতীয় নয়নকে প্রজ্ঞানেত্র বলা হয়েছে। তাইতো দেখা যায়, একমাত্র যোগীন্দ্র শিব ও আদ্যাশক্তি মহামায়ার তৃতীয় নয়ন রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী কারো ক্ষেত্রেই তৃতীয় নয়ন দেখা যায় না। বর্তমান কল্পে অবশ্য গণেশেরও তৃতীয় নয়ন দেখা যায়; তবে ধ্যানমন্ত্রে দেখা যায়, কেবল শিব ও দুর্গারই তৃতীয় নয়ন রয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী মহেশ্বর শিবের ঔরসে আদ্যাশক্তির গর্ভজাত সন্তান—এরকম কল্পনাও লক্ষ্য করা যায়। এই কল্পনার মধ্য দিয়ে, বোধ হয়, এই বলতে চাওয়া হয়েছে যে, মূলশক্তি একমাত্র যোগ সাধনার মধ্য দিয়েই অর্জন করা যায়; অন্য সাধনার মধ্য দিয়ে ঐ শক্তির একটা বা দুটো অংশ মাত্র অর্জন করা যায়। শুধু তাই নয়, জ্ঞান ও কলাবিদ্যার প্রতীক সরস্বতী, রূপ ও সম্পদের প্রতীক লক্ষ্মী, পরাক্রমের প্রতীক দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় এবং যে কোন বিষয়ে সিদ্ধির প্রতীক গণেশ সকলেই মহেশ্বরের ঔরসজাত, সকলেই আদ্যাশক্তির গর্ভজাত বলে কল্পিত—এটাও লক্ষণীয়। এটাও লক্ষণীয় যে, ব্রহ্মার ঔরসে সরস্বতীর গর্ভজাত কোন সন্তান বা বিষ্ণুর ঔরসে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর গর্ভজাত কোন সন্তানের পরিকল্পনা কোথাও পাওয়া যায় না। এর মধ্য দিয়ে কি এই বলতে চাওয়া হয়নি যে, যোগসাধনা ছাড়া অন্য সাধনা প্রকৃত ফলপ্রসূ নয়। পরবর্তীকালে, বোধ হয়, আরো অনুভূত হয় যে, যে কোন সাধনাতেই কিছু না কিছু যোগ (নিয়ম নিষ্ঠা মনঃসংযোগ, একাগ্রতা ইত্যাদিও এক ধরণের যোগ)-এর আবশ্যকতা রয়েছে।

তাই, বোধ হয়, বলা হয়েছে,—শিবহীন যজ্ঞ হয় না ; শিবহীন যজ্ঞ করলে তা পণ্ড হবেই।

এই হ'ল জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্য। অন্ত্যবৈদিকযুগে যখন জাতিভেদের উদ্ভব হয় তখন অন্তত এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই এই উদ্ভব ঘটেছিল মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞায়। তার পরে কিছুটা অজ্ঞানতার জন্য, কিছুটা ইচ্ছাকৃত অশুভ প্রয়োগফলে তত্ত্বের সূক্ষ্ম অর্থের জায়গায় স্থূল অর্থ এসে দাঁড়ায়। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের এই কর্মসকল পূজা-পার্বণে, পৌরোহিত্য, শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান—এই সমস্ত সামাজিক কর্মে পর্যবসিত হয় ; রাজ্য-শাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ—এই সামাজিক কর্ম সমূহ নির্দিষ্ট হয় ক্ষত্রিয়ের জন্য ; ভূমিকর্ষণ, গবাদি পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য—এই সামাজিক কর্মসকল নিরূপিত হয় বৈশ্যের জন্য এবং শূদ্রের জন্য কর্ম হিসেবে নির্ধারিত হয় সমাজের সকলের সেবা করা। এই ভাবে, স্থূল অর্থে, চারবর্ণের কর্মসকল সমস্তই সামাজিক কর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয় ; জীবন-সাধনার সূক্ষ্ম অর্থ বাদ পড়ায়, যিনি যে সামাজিক কর্মের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন সেই কর্মের ভিত্তিতেই তার জাতি নিরূপিত হতে থাকে। এই পর্যায়েও জাতিভেদ জন্মগত ছিল না। আরো পরবর্তীকালে জাতিভেদ একরকম জন্মগত হয়ে পড়ে। আরো পরে জন্মগত জাতিভেদের কড়াকড়ি দেখা দেয় এবং অস্পৃশ্যতা আমদানী হয়।

কর্মের সূক্ষ্ম অর্থে, মুনি ঋষিদের নির্দেশিত ধাঁচে, সমাজে যে জাতিভেদের কাঠামো রচিত হয়েছিল, তা অনিষ্টকর ছিল না ; বরং তা মানব-গোষ্ঠীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উন্নয়নের সহায়ক ছিল। পরে, কর্মের স্থূল অর্থে, যে জাতিভেদ প্রচলিত হয় তাও তৎকালীন সমাজের প্রয়োজন অনেকটা সিদ্ধ করেছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে জাতিভেদ একরকম জন্মগত হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্তেই হিন্দু সমাজের বুকে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয় ; আর যখন এটা একান্ত জন্মগত হয়ে যায়, তখন ঐ ক্ষত দুষ্টক্ষতে রূপান্তরিত হয়। সর্বশেষে যখন এই একান্ত জন্মগত জাতিভেদের

কড়াকড়ি দেখা দেয় এবং অস্পৃশ্যতা আমদানী হয়, তখনই ঐ দুষ্ট ক্ষত ক্যান্সারে পর্যবসিত হয়। তাই তো এখন, এই প্রথাকে কুপ্রথায় আখ্যায়িত করা হলেও, হিন্দু সমাজের বুক থেকে একে নির্মূল করা যাচ্ছে না। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক চেতনা রূপ রশ্মি (ray)-র প্রভাবে হিন্দু সমাজের ঐ ক্যান্সার কিছুটা (কোথাও বেশী, কোথাও কম) প্রশমিত। ভবিষ্যতে আরো হয়তো প্রশমিত হবে। তবে ক্যান্সারের মতো এই কুপ্রথার মূল সহজে উৎপাটন যোগ্য নয় বলে, জাতিভেদ প্রথার অবলুপ্তির জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও সরকারী শাসন যন্ত্রের মাধ্যমে সেই আইন কার্যকরীকরণরূপ অপারেশনের প্রয়োজনীয়তাও, বোধ হয়, অস্বীকার করা যায় না।

পরিশেষে বলতে হয়,—আজকের দিনে ভারতের হিন্দুসমাজে যে ধরণের জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে তা দেখে এই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভবের প্রকৃত রহস্য অনুমান করাও কষ্টকর। তবে একথাও স্বীকার্য যে, প্রকৃত নিরপেক্ষ যুক্তিবাদী মন নিয়ে ভারতীয় শাস্ত্র সমূহে এ বিষয়ে যে সমস্ত আভাস-ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

— ——

৺শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতায়
দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

সন্তান বাৎসল্য ও পিতৃভক্তি

শ্রীমতী শিপ্রা গাঙ্গুলী

আর্যসভ্যতা বিস্তারের কাল হইতে সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ বা ভালবাসা বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এই স্নেহ, মোহ, মায়াকেই সন্তানবাৎসল্য বলিয়া গণ্য করা হয়। পিতামাতার এই আকর্ষণকে সহজাত প্রবৃত্তিও বলা চলে। এই সন্তানবাৎসল্য চিরশাশ্বত দীপশিখার ন্যায় চিরদেদীপ্যমান। কালের কপোলতলে মহীতল হইতে সর্ববিধ্বস্ত হইলেও মানুষের বাৎসল্যবোধ কোনদিনই লুপ্ত হইবে না।

ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত যুগেও এই সন্তানবাৎসল্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণের যুগে দৃষ্ট হয়, ঘটনাচক্রে রামচন্দ্রকে বনবাস দেওয়ার জন্য পিতা, দশরথ শোকার্ত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। দশরথ কৈকেয়ীর নিকট সত্যরক্ষা করিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁহার মোহ বা মায়াকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সন্তানবিরহ যে পিতার নিকট কত মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক তাহা তাঁহার প্রাণত্যাগের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়।

আবার মহাভারতের আমলে আমরা কৌরবপক্ষের দুর্যোধনপিতা ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানবাৎসল্য অতিমাত্রায় দেখিতে পাই।

ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র মধ্যেও দুর্যোধনের প্রতি তাঁহার দুর্বলতা ছিল অত্যধিক। পুত্র দুর্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় ছলকৌশল অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের ন্যায্যপ্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া

বনবাসে পাঠাইতেছেন। কিন্তু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাস্তবিকই পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্যোধন তাঁহার পাপাচার দ্বারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন আর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া পুত্রের অধর্মাচরণে সহায়তা করিতে বাধ্য হইতেছেন। তিনি পুত্রস্নেহে এমনই দুর্বল যে সুহৃদদিগের সুপরামর্শও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রস্নেহবশতঃ তিনি দুর্যোধনের পাপাচারকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন কিন্তু ইহাতে পুত্রের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই যে বেশী হইবে সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ সচেতন, তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি। অন্ধ আমি অন্তরে॥
বাহিরে চিরদিন।

সুতরাং, ইহা হইতে বোঝা যায় যে, স্নেহ কত দুর্বল, কত অসহায়। মানুষ এই স্নেহের বশে ধর্ম হইতেও বিচ্যুত হন।

অন্ধ মুনির সন্তানবাৎসল্যের পরিণতি আমরা দেখিতে পাই বড় মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক। দশরথের শব্দভেদী বাণদ্বারা পুত্রসিন্ধুর মৃত্যুতে অন্ধমুনি ও তাঁহার স্ত্রী শোকাতিশয্যে প্রাণত্যাগ করেন

পুত্রশোক মাতাপিতার নিকট এতই প্রবল যে তাহা বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া দেয়। পুত্রবিরহ পিতার নিকট বড়ই অসহনীয় ও তীব্র। একমাত্র সদ্যপুত্রহারা মাতা ও পিতা ইহার যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন।

সন্তানবাৎসল্যের ন্যায় পিতৃভক্তিও সৃষ্টির আদিকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ইহার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় রামায়ণ যুগে রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে। পিতা দশরথ বিমাতা কৈকেয়ীর নিকট যে সত্য করিয়াছিলেন তাহা বড়ই নিষ্ঠুর! কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদের সকল ভোগসুখকে তুচ্ছাতিতুচ্ছজ্ঞানে পরিহার করিয়া

চীরবাস পরিধানপূর্বক বনবাস গমনকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনের দাবী, রাজ্যসুখ, ঐশ্বর্য, মাতার স্নেহ, ভ্রাতার ভক্তি, প্রজাগণের ভালবাসা সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করিয়া পিতৃসত্যকে পালন করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার পিতৃভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াই তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যতদিন এই পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য বিরাজ করিবে ততদিন শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি লোকমুখে প্রচারিত হইবে।

আবার মহাভারতের যযাতির কাহিনী হইতে পুত্র পুরুর পিতৃ-ভক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অবিস্মরণীয়। পুত্র পুরু স্বেচ্ছায় তাঁহার যৌবন পিতা যযাতিকে সহাস্যবদনে দান করিয়াছিলেন। এতবড় দান কদাপি ভক্তিহীন পুত্রের দেওয়া সম্ভব নয়, পুত্র পুরু পিতার বার্ধক্যকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। পিতার প্রতি ভক্তি এমনই প্রবল হইতে পারে যে, পিতার জন্য সকল পার্থিব-সুখকে ত্যাগের বেদীমূলে বলি দিতে পারা যায়। পুরুর পিতৃভক্তি তাই চিরস্মরণীয়, চিরভাস্বরজ্যোতিতে যুগযুগ ঘোষিত হইবে। ইহা ছাড়া পিতৃভক্তির বহু নিদর্শন দেখিতে পাই। তবে বর্তমানে পিতৃভক্তি সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে বসিয়াছে। পুরাকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তি অপেক্ষা ভয়ই ছিল বেশী, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের নায়ক ব্রজেশ্বরের চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই পিতার আদেশ লঙ্ঘন হইবার উপক্রম দেখিলেই তিনি—"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ' এই শ্লোকটি বারংবার উচ্চারণ করিতেন। তবে এই পিতৃভক্তি সন্তানের তখনই থাকে যখন পিতা বা মাতার সন্তানবাৎসল্য সুগভীর ও দিগন্ত-ব্যাপী থাকে। তবে এই বাৎসল্য যাহাতে অন্ধ বা পক্ষপাতদুষ্ট না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহাতে কুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশী। মাতাপিতার সন্তানবাৎসল্যবোধ নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু তাহা প্রকাশ্য না হইলেই অধিক ভাল।

সন্তানের দৈহিক বৃদ্ধির সহিত মানসিক বিস্তৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং ইহাতে মাতার ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র মাতাই শিশুকে সুস্থ দেহ এবং মানসিক বিকাশের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে সমাজব্যবস্থার চিত্রটি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়েরা তাঁহাদের সন্তানের প্রতি এই দায়িত্ব সম্যক পালন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের (মায়েদের) দেহসৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য শিশুকে তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন ইহাতে শিশুর ভবিষ্যৎ ক্ষতি বৃদ্ধি পাইতেছে। মাতা বা পিতা যদি শিশুর প্রতি আবাল্য যত্নবান্ হন তাহা হইলে সেই শিশুই একদিন সমাজের মুখ উজ্জল করিবে এবং দেশের একটি করিয়া রত্নবৃদ্ধি হইবে, ইহাতে সবজনেরই যে কল্যাণ হইবে এবং বিশ্বজনীন হিতও যে সাধিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীনরেশ নাথ
সিনিয়র এসিসটেন্ট,
ভিক্টোরিয়া জুট মিল,
গণ্ডাল পাড়া, চন্দননগর,
হুগলী।

শ্রীমতিলাল নাথ
৭, সেন্ট্রাল পার্ক,
বাঁশদ্রোণী,
পিন-৭৪৩৫০১

শ্রীতরণীমোহন নাথ
৩/১৫, নেতাজী নগর,
কলিকাতা-৪০

শ্রীধীরেন নাথ
৬৩, কাকুলিয়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৯

জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত
ডঃ মাধব চন্দ্র নাথ

শ্রীসতীশ চন্দ্র নাথ ভক্তিরত্ন

১৯১৭ সাল, ঢাকা জেলার হাসারা গ্রামের এক দামাল ছেলে পড়ে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে। তাদের গ্রামে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা সঙ্গী প্রেমিক পুরুষ প্রেমানন্দ স্বামী। তিনি সেই দামাল ছেলে শ্রীমান মাধবচন্দ্র নাথকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দর পতাকা বহন করে দেশের কল্যাণ সাধন কর; জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

ইংরাজী ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সাধুর কৃপা সম্বল করে অতি গরীব ঘরের ছেলে শ্রীমান মাধবচন্দ্র নাথ এলেন, উচ্চ শিক্ষা লাভের দুর্জয় ব্রত নিয়ে ঢাকার কলেজে, এখানে তাঁর প্রতিভার বিকাশ হতে থাকে। এই সময় স্বামী প্রেমানন্দজীর প্রেরণায় ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের ছোট খাটো কাজে নিজেকে সংযুক্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিস্ময় সৃষ্টি করে, ১৯২৯ সালে M. Sc পাশ করার পর বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় মগ্ন হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা কালেই ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনে সমাগত প্রাচীন সাধুদের সঙ্গলাভ করেন এবং হরিদ্বারের এক ব্রহ্মজ্ঞ সাধু শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজেরও দর্শন লাভে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করেন ঢাকা শহরেই। ১৯৩৭ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে D. Sc ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর আরম্ভ হয় নাগপুরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের উৎকর্ষ সাধনের প্রাণপাত প্রচেষ্টা। বাংলার কৃতি পুরুষ শ্রীমাধবচন্দ্র নাথ বিজ্ঞান গবেষণায় নিমগ্ন থাকলেও নাগপুরের সর্বপ্রকার উন্নয়ন কাজে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাণ্ডারে ডঃ মাধব চন্দ্র নাথের দান দেশে বিদেশে অবিস্মরণীয়। ১৯৮১ সালে ভারত সরকার ডঃ মাধব চন্দ্র নাথকে তাঁর অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার দিয়েছেন, এটি তাঁর জীবন সাধনার স্বীকৃতি আর আমাদের গৌরবের।

নাগপুরের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে ঐ উপলক্ষে ডঃ মাধব নাথ প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছে। তারই খানিকটা লিপিবদ্ধ করছি :—

ঢাকা জেলার হাসারা গ্রামে জন্ম ১৯০৫ সনে। Dr. M.C. Nath D. Sc, FNA, FIC, FRIC (London) মহোদয়কে বায়োকেমিষ্ট্রী বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনের জন্য ভারত সরকার ৫০০০ টাকা পুরস্কার দান করেছেন। ইতিপূর্বে ১৯৪১ সনে Royal Asiatic Society of Bengal ডঃ নাথকে Elliot Prize দ্বারা সম্মানিত করেছেন। 1946 সনে Watnull Research Fellow of USA. বায়োকেমিষ্ট্রীর গবেষণার জন্য বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

ডঃ নাথ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভাণ্ডারকে ১৬৭টি গবেষণা প্রবন্ধ দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। সে সব প্রবন্ধ UK ; USA, USSR এবং অপর বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। সুইডিস একাডেমী অফ সায়েন্স, ডাঃ নাথকে ১৯৭৩ সনে রসায়ণ বিজ্ঞানে Nobel Prize (নোবেল প্রাইজ) প্রাপক মনোনয়ন করার জন্য সুইডেনে আমন্ত্রণ করেছিলেন। এটি ভারতের বিজ্ঞান জগতে গৌরবের কাহিনী। প্রাচীন ভারতের যোগী মুনি-ঋষিগণ যেমনি বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ সাধন করেছিলেন ডাঃ মাধব নাথও বিজ্ঞানকে জ্ঞান-ভক্তি লাভের সহায়ক রূপে স্বীয় জীবনে প্রয়োগ করেছেন তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "Science and philosophy of Life" গ্রন্থে।

ডঃ নাথের অবদানের জন্য ১৯৬৪ সনে USA. Watnull International Award এক হাজার ডলার মূল্য ও স্বর্ণ পদক দান করেছেন। সে দান গ্রহণ করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি Dr. Zakir Hossain এর কাছ থেকে নিউদিল্লীর বিশেষ অনুষ্ঠানে। ইতিপূর্বে কলকাতার ১৯৬২ সনের science congress এ physiology বিভাগে ডঃ নাথ সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

বিজ্ঞান জগতে তিনি বিরাট মহীরুহ। তাঁকে আশ্রয় করে অগণিত বিজ্ঞানী সৃষ্ট হয়েছে ; এবং তাঁর পুত্র কন্যাগণও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনির্মলেন্দু নাথ Ph D. এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মুক্তি নাথও Ph. D.। তাঁর মধ্যম জামাতা Dr. পরিমল রায় বিলেতে FRCS ডাক্তার রূপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

ডঃ মাধব নাথ, "অমানী এবং মানদ" তিনি, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির পরে আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্য নাগপুর থেকে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রণাম করে বলেছিলেন "আমি আপনার স্নেহধন্য ঢাকার ছেলে মাধব। আজ আপনাকে প্রণাম করতে পেরে গৌরব বোধ করলাম, কৃতার্থ হলাম!"

সমাজশিক্ষায় পি. এইচ. ডি.

আগরতলা রামঠাকুর কলেজের শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল ভৌমিক সম্প্রতি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Ph. D. ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ. জি. সি. অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র কর মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "The Development of Social Education in Tripura and Cachar." সমাজশিক্ষায় বিশেষতঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এধরণের গ্রন্থ এই প্রথম। সাউথ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের প্রধান বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ জি. বি. শাহ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস. কে. পাল শ্রীভৌমিকের নিবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ডঃ ভৌমিক আগরতলা এম. বি. বি. কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি রাণীর বাজার, ত্রিপুরার (পূর্বনিবাস ভাদুর, পোঃ রামগঞ্জ, জেলা নোয়াখালী, বাংলাদেশ) আজীবন শিক্ষক শ্রীমোহিনী মোহন ভৌমিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। বর্তমানে তিনি Post Doctorate গবেষণায় রত।

সংবাদদাতা
ডঃ এন. সি. নাথ
অধ্যক্ষ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত (১০০০) বয়স (৩০) উচ্চতা (৫'-৬") M. Sc. পাশ। প্রকৃত সুন্দরী অন্ততঃ গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। কেবলমাত্র পত্রে ফটোসহ যোগাযোগ করুন। চারুবালা চৌধুরী ৩৭ বেলগাছিয়া রোড, ব্লক আর ফ্লাট নং ১৫ (এল, আই, জি) কলিকাতা-৭০০০৩৭।

পাত্রী বি, এস, সি, ফর্সা, (২৩) (৫'-২") গৃহকর্ম নিপুণা। পূর্ব নিবাস কুমিল্লা। সুপাত্র চাই। শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভৌমিক। দক্ষিণ নন্দন কানন পোঃ রহড়া, জিলা ২৪ পরগণা।

পাত্রী। (১৯) (৫'-২") শ্যামবর্ণ বি. এ প্রথম বর্ষে পাঠরতা, গৃহকর্মে নিপুণা, নম্র স্বভাবা, পিতা মৃত মাতার মস্তিষ্ক বিকৃত, পরিবার বংশানুক্রমিক শিক্ষিত। সরকারী চাকুরে বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শাশ্বতী নাথ, গ্রাম ও পোষ্ট তেহট্ট, জেলা নদীয়া।

পাত্রী ২২ বৎসর (৫'-৩"), দ্বাদশমান, সুশ্রী, সুগঠনা, শান্ত, সুরুচিসম্পন্না, গৃহকর্মে ও হাতের কাজে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। কার্তিকচন্দ্র নাথ, ৭৩, সন্তোষ রায় রোড। কলিকাতা-৮।

পাত্র (২২) (৫'-৫") এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছে। পাত্রের পিতা সুউপায়ী ব্যবসায়ী। উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী চাই।

এবং

পাত্রী স্বচ্ছল ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা (১৮) (৫'-২") উজ্জল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী রবীন্দ্র সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীতে পারদর্শিণী গৃহকর্মে সুনিপুণা। এবার স্কুল ফাইনাল দিয়াছে। উপযুক্ত ব্যবসায়ী বা চাকুরে পাত্র চাই। শ্রীসুবল চন্দ্র দেবনাথ, ৬৮ নং টালা পার্ক এভিনিউ। ফ্লাট নং ১৮ কলিকাতা ৩৭।

পাত্রী (২৬) বি. এস. সি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সুলক্ষণা মধ্যমবর্ণা, শিক্ষিতা সঙ্গীতজ্ঞা, গৃহকর্মে নিপুণা, সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তত গ্রাজুয়েট উপার্জনশীল উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীললিত মোহন দেবনাথ, Accounts Section, CMERI Durgapur 9, Burdwan.

পাত্র (২৮) বি. এ. পাস সুপুরুষ ফর্সা সুউপায়ী ব্যবসায়ী। পিতা বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। সুন্দরী ফর্সা, কর্মশীল পাত্রী চাই। শ্রীপ্রমথ নাথ, ১৫ বিশ্বেশ্বর চৌধুরী লেন। কলিকাতা-৭০০০৩৫।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার **স্বতন্ত্র**। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ১৭/৩৮ দক্ষিণদাড়ী রোড, কলিকাতা-৪৮, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, ক'লকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

সম্পাদক—সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

বেদসারশিব-স্তোত্রম্

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-
র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো
ন যস্যাস্তি মূর্তিস্ত্রিমূর্তিং তমীড়ে ॥

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে,
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে।
নমস্তে নমস্তে তপযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥

॥ ইতি শঙ্করাচার্য বিরচিতং বেদসারশিব-স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্ ॥

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীসমর কুমার নাথ
৭৩ সন্তোষ রায় রোড
কলিকাতা-৭০০০০৮

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র নাথ
কালিতারা বোস লেন
বেলেঘাটা, কলিকাতা-৭০০০১০

শ্রীসুনীলবরণ নাথ
৩৬, কবি ভরতচন্দ্র রোড
কলি-৭০০০২৮

শ্রীনরেশ চন্দ্র নাথ
"হরিহর নিবাস"
৩০/৫ বারিকপাড়া রোড
বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৩৪

সম্পাদকীয়

বর্তমান-ভারতবর্ষে তত্ত্বগতভাবে দুটি জিনিস প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। জিনিস দুটি হচ্ছে—(১) হিন্দু-সমাজে জন্মগত-জাতিভেদের অবলুপ্তি ঘটাতে হবে এবং (২) সকলকে সমানভাবে অগ্রসর করাতে হবে। এই দুটি জিনিস দেশের সরকারও স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারত-সরকার এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

ভারত-সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে একদিকে বলা হচ্ছে, জন্মগত-জাতিভেদ থাকবে না; কিন্তু অপরদিকে জন্মগত-জাতিভেদের ভিত্তিতে তপশীল-জাতি, তপশীল-উপজাতি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর-জাতি সমূহকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অগ্রসর করাতে চাওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে,—জন্মগত দিক থেকে তপশীল-জাতি, তপশীল-উপজাতি বা অনগ্রসর-জাতির ছাপ লাগিয়ে সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে অনগ্রসরদের অগ্রসর করাতে থাকলে জন্মগত-জাতিভেদ বহাল-তবিয়তে বর্তমান থেকে যাবে না কি?

জন্মগত-জাতিভেদের বিলোপ-সাধন এবং সকলকে সমানভাবে অগ্রসর যদি একই সাথে করাতে হয়, তাহলে এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে একটা আর একটার বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কি সেই পথ? আমার মনে হয়—জন্মগত-জাতি হিসেবে নয়, পরিবার হিসেবে অনুন্নত বা অনগ্রসর পরিবারদের অগ্রসর করানোর জন্য সরকারী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। যে সকল পরিবারের মাসিক আয় মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকার কম সেই সকল পরিবারকে অনুন্নত বা অনগ্রসর পরিবার হিসেবে ধরে সেই অনুন্নত বা

অনগ্রসর পরিবারগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্যের এবং উন্নত জীবিকার জন্য চাকুরী-সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এতে তথাকথিত তপশীল-জাতি, তপশীল-উপজাতি বা অনগ্রসর-জাতি সমূহের পরিবারগুলিই বেশী বেশী সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে অথচ জন্মগত-জাতিভেদের ছাপ ঐ সমস্ত পরিবারের মানুষের গায়ে লাগানো হবে না। অপরদিকে তথাকথিত উন্নত জাতিগুলির মধ্যেও কিছু কিছু অনুন্নত বা অনগ্রসর পরিবার আছে; সেই সমস্ত পরিবারগুলিও অগ্রসর হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না।

—শ্রীসুবোধকুমার নাথ
২/৫/১৩৮২

ভ্রম-সংশোধন

কোন সংখ্যা	কোথায়	কি ছাপা আছে	কি হবে
১৩৮৯ বৈশাখ সংখ্যা	১৯ পৃষ্ঠায় বিঃ দ্রঃ এর প্রথম বাক্যে।	রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র অথচ মেধাবী রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ ছাত্র / ছাত্রীকে পঁচিশ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হইবে।	রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত দরিদ্র অথচ মেধাবী রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ ছাত্র/ছাত্রীকে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হইবে।
ঐ	২২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় বাক্যে	বানপ্রস্থাশ্রমের সাধক সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং যতি আশ্রমের সাধক যতি বা যোগী।	বানপ্রস্থাশ্রমের সাধক সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং যতি আশ্রমের সাধক যতি বা যোগী ব্রাহ্মণ।

যোগিসখা বৈশাখ ১৩৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ হরিহর নাথের "একটি প্রতিবেদন"-র উপর রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কার্যপরিচালক সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাব

যোগিসখার ১৩৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত আসাম-বঙ্গ যোগিসম্মিলনীর সম্পাদক ডাঃ হরিহর নাথ মহাশয় লিখিত "একটি প্রতিবেদন" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর নাম উল্লেখ করিয়া যে সকল প্রশ্ন, অভিযোগ, বিবৃতি, উপদেশ এবং উপসংহার মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করিয়া রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কার্যপরিচালক সমিতির এই সভা উক্ত ব্যাখ্যার কোন সদুদ্দেশ্য থাকিতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না।

অনবধানতাবশতঃ কোন কোন ব্যাপারে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সামান্য ভুল-ত্রুটি হইয়া থাকিতে পারে। রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে অবহিত আছেন ও প্রয়োজনমত তাঁরা সংশোধন করিয়া লইবেন। কিন্তু আসাম-বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয় তথাকথিত ত্রুটি-বিচ্যুতি রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবার পরিবর্তে তাহা যোগিসখা পত্রিকার মারফত বহুল প্রচারে সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া এই সভা যুগপৎ বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ।

সম্পাদক মহাশয় তাঁর উপসংহার মন্তব্যে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়া সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন দেখিয়া এই সভা আনন্দিত। এই কারণে সম্পাদক মহাশয় তাঁর প্রতিবেদনে যে সকল বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন এই সভা তন্মধ্যে প্রবেশ করা হইতে বিরত থাকা সমিচীন বলিয়া মনে করে।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী জাতির সামগ্রিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই সম্পর্কে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তথা প্রতিটি ব্যক্তির সক্রিয় সহযোগিতা পাইবার জন্য আগ্রহী।

এই প্রস্তাবের কপি যোগিসখার সম্পাদকের নিকট 'যোগিসখা'-য় প্রকাশের অনুরোধসহ পাঠান হউক ও 'শৈবভারতী'তে প্রকাশ হউক।

Annrinya

A MONTHLY MAGAZINE ON SCIENCE & LITERATURE IN BENGALI

Registered with the Registrar of Newspapers for India

R. N. 18265/69

International Standard Serial Number (ISSN) 0003-5203

Office : 50/8A, Gouribari Lane, Calcutta-700 004

Phone : 55-7340

সহ-সম্পাদক (শ্রীমৃত্যুঞ্জয় নাথ)
কুলব্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী
২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন
ক'লকাতা-১২

মহাশয়,

আপনার চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরি হল। কিছু ঝামেলায় বিব্রত ছিলাম।

আপনাদের প্রতিবাদপত্র ছাপা হবে এপ্রিল / ৮২ সংখ্যায়। চিঠির শেষ লাইনের অসৌজন্যমূলক বাক্যগুলি আমার ব্যবহার দেখে লিখলে শোভন হত—এবং এ ধরণের ক্ষেত্রে সেরকমই করা হয়ে থাকে। যাই হোক, আমার নমস্কার রইল।

সুধীরকুমার পোদ্দার

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী

প্রতিষ্ঠাব্দ ১৩৬৪

Rudraja Brahmin Sammilani
23/1A, Phears Lane
Calcutta-700012

প্রধান কার্যালয়ঃ
সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির
২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

Ref. No............ *Date 19. 4. 82.*

মাননীয়
শ্রীসুবীরকুমার পোদ্দার
সম্পাদক, 'আনৃণ্য' মাসিক পত্রিকা
৫০/৮এ, গৌরীবাড়ী লেন
কলিকাতা-৪

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা আনৃণ্য আগষ্ট ১৯৮১ (দ্বাদশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা)-তে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "বঙ্গ সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান" শীর্ষক প্রবন্ধের কয়েকটি তথ্য ও মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রবন্ধটি লেখকের "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব" (১৯৪৫) বই-এর মুখবন্ধ থেকে সংগৃহীত। কিন্তু বর্তমানে যখন ওটাকে পুনরায় প্রচার করা হচ্ছে, তখন এর মধ্যে সন্নিবেশিত কয়েকটি তথ্য ও মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

১৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় বা শেষ কলমে একস্থানে বলা হয়েছে,—

"তুর্কী আক্রমণের পূর্বে আমরা বাংলায় তান্ত্রিকধর্ম, লৌকিক ধর্ম (বাসুলি, মনসা, বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতির পূজা), নাথধর্ম[১] (ইহা মহাযানের একটি শাখারূপে আরম্ভ হয়—তারানাথের পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য) ও পশ্চিমবঙ্গে নিরাকারবাদীয় "নিরঞ্জনের পূজা" যাহা ধর্ম ঠাকুরের পূজা নামে খ্যাত হয়, তাহা ছিল।

---

১. B. N. Dutta/Mystictales of Lama Taranath দ্রষ্টব্য।"

এই অংশটুকুর মধ্য দিয়ে নাথধর্মকে বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের একটি শাখারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। নাথধর্ম শৈবধর্মের পাশুপাতশাখার একটি প্রশাখা মাত্র। শৈব-নাথ-ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধ-তন্ত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখে প্রথম দিকে অনেক গবেষক এই ধর্মকে বৌদ্ধধর্ম থেকে আগত বলে অনুমান করেছিলেন এবং সেইভাবে তাঁরা অনেক লেখাতে লিখেওছিলেন। কিন্তু ইতঃমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। গবেষণার ফলে পরবর্তীকালে এটা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, নাথধর্ম বৌদ্ধধর্ম থেকে আসেনি—এসেছে শৈবধর্ম থেকে। আমি কয়েকজন গবেষক-মনীষীর লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

(১) "নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধেরা মৎস্যেন্দ্রকে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বলিয়া যত গৌরবই করুক না কেন, আসলে তিনি বৌদ্ধ মোটেই ছিলেন না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, মৎস্যেন্দ্রের সুবিখ্যাত কৌলগ্রন্থ আলোচনা করিলে তাঁহাকে কখনই বৌদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায়, নাথ-সাধকদের পরমশ্রদ্ধেয় গুরুরূপে পরিচিত হইয়াও মৎস্যেন্দ্র বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন, অসামান্য মর্যাদা পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বড় বৈশিষ্ট্য।"

—শাস্ত্রী/বৌদ্ধ গান ও দোহা

(২) "নাথধর্মের তত্ত্ব ও সাধনের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে ধারণা পোষণ করেন, বৌদ্ধতন্ত্র হইতে কালক্রমে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং পরিগ্রহ করিয়াছে শৈবধর্মের রূপ। কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। আসলে নাথধর্ম ভারতের সুপ্রাচীন সিদ্ধমত হইতেই উদ্ভূত এবং ইহা তাহারই এক বিবর্তিত রূপ।"

—শঙ্করনাথ রায়/ভারতের সাধক ৭ম খণ্ড

(৩) "অষ্টম শতাব্দী বা তারও পূর্বে থেকে বাংলা দেশে বিশেষ করে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিকভাবের দুটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল—শৈব নাথ মত এবং বৌদ্ধ সহজ মত।"

—সুকুমার সেন/প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী

(৪) "রাঢ়েই তিনি (গোরক্ষনাথ) শৈবধর্ম প্রচার করেন।...... নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবে বাংলায় বহু শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়/প্রবাসী পত্রিকা বাং ১৩২৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যা

(৫) "গোরখনাথ মূলত শৈবমার্গী মহাযোগী। নাথ যোগীদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে শিবত্ব লাভ করা, মহেশ্বর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া। গোরখনাথ তাই চাহিয়াছিলেন, নাথ সাধনের লক্ষ্য হোক ইষ্টের স্বরূপ অর্জন করা—জীবন্মুক্তি বা পরামুক্তির মধ্য দিয়া মহেশ্বরের চিরন্তন সত্তায় সে স্থিতিলাভ করুক, পরমশিবে হোক প্রতিষ্ঠিত।"

—ডাঃ দাসগুপ্ত/অবস্‌কিওর রিলিজিয়াস্ কাল্টস্

(৬) "রাশিয়ায় জ্বালামুখী দেবীর এক মন্দির আছে, জনৈক নাথপন্থী এবং শৈবসাধক ইহার প্রতিষ্ঠাতা—একথা মন্দিরগাত্রে খোদিত দেখা যায়।" —শঙ্করনাথ রায়/ভারতের সাধক ৭ম খণ্ড

(৭) "গোরখনাথী কান্‌ফাটাদের মধ্যে কয়েকটি দল ৩য় ও ৪র্থ শতক হইতে বামাচারের সাধনা গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা ও হিমালয় অঞ্চলেই ইহাদের প্রভাব পূর্বে বেশী ছিল। ইহাদের পঞ্চ-মকার সাধনে আছে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন—মদ্যং মাংসমৎস্যঞ্চ মুদ্রা

মৈথুনমেব মকার পঞ্চকঞ্চৈবচ মহাপাতকাশনম্—যোগ, তন্ত্র ও বৌদ্ধ-বাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল পরবর্তীকালে।” —ব্রীগস্

(৮) নাথধর্ম ও দর্শনের ওপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ কল্যাণী মল্লিক ডক্টরেট হয়েছেন। তিনি তাঁর বিশালাকার গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেছেন, নাথগণ মূলত বৌদ্ধ নন—তাঁরা মূলত শৈব। তিনি বলেছেন,—

“নাথযোগীরা প্রধানত শৈব; তাই ইঁহারা শৈবতান্ত্রিক নামে পরিচিত। আবার যোগীশ্রেষ্ঠ শিব পশুপতি বলিয়া যোগীদের পাশুপাতশৈব নামেও প্রসিদ্ধি আছে। পাশুপাত শৈবদের সহিত নাথদের সাধনার সাদৃশ্য ছিল। নাথেরা শিব বা আদিনাথের উপাসক, পাশুপাতেরা পশুপতির উপাসক, এই পশুপতিই শিব। নাথেরা মূলত শৈব।” —ডঃ কল্যাণী মল্লিক/নাথপন্থ

২০ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে একস্থানে বলা হয়েছে,—

“নাথ-পন্থীয়েরা নিজেদের “জুগী” (যোগা) বলেন এবং এক সময়ে বস্ত্র-বয়ন করাই তাঁহাদের বৃত্তি ছিল এবং এখনও অনেকস্থলে আছে। ইঁহারাই মুসলমান হয়ে ‘জোলাহা’ নাম গ্রহণ করেন। এই শব্দটি ফার্শী ভাষা উৎপন্ন, ইহার অর্থ তাঁতী। কথায় বলে ‘জুগীজোলা’।”

এই অংশটুকুর মধ্যে নাথপন্থীয়েরা যে নিজেদের ‘জুগী’ (যোগী) বলেন সেই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সংবাদ বিকৃত। নাথ-পন্থীয়েরা নিজেদের বলেন ‘যোগী’; অন্যেরা কিছুটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েও হতে পারে, তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে গিয়ে এঁদের ‘জুগী’ বলে থাকেন। অবশ্য ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মানুসারে ‘রোগী’ থেকে যেভাবে ‘রুগী’ এসেছে, সেইভাবে ‘যোগী’ থেকে ‘যুগী’ এসে থাকতে পারে। কিন্তু কোন নাথপন্থীয়ই নিজেদের ‘যুগী’ বলেন না—বলেন ‘যোগী’।

ওপরে উদ্ধৃত অংশের মধ্যে আরো বলা হয়েছে যে, নাথপন্থীয়দের

বস্ত্রবয়ন করাই এক সময়ে বৃত্তি ছিল। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। নাথপন্থীয়দের গুরুগিরি ও যজন-যাজনই ছিল মূল বৃত্তি। তখন তাঁরা যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত টিল বয়েজ সাহেবের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। "ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থে তিনি বলেছেন,—"একশ্রেণীর সুপবিত্র উন্নত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে নাথ বা স্বামী বলা হইত এবং সকলেই তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত।"

আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথি গোপাল ভট্ট রচিত 'বল্লাল চরিতম্'-এর মধ্যেও স্পষ্ট আভাস রয়েছে যে, বাংলাদেশে রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণ বল্লাল সেনের পিতৃশ্রাদ্ধে দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় এবং শিব-মন্দিরের নাথ-পুরোহিত কর্তৃক রাজপুরোহিত অপমানিত ও মন্দির থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণেরা রাজরোষে পতিত হন; রাজ-ঘোষণায় গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আত্মরক্ষার্থে নানান নিম্নবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই নিম্নবৃত্তি-গুলোর মধ্যে বস্ত্রবয়ন ছিল অন্যতম। বল্লাল সেনের উপরোক্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত বস্ত্রবয়ন যোগীদের বৃত্তি ছিল না; বস্ত্রবয়ন ছিল হিন্দু তন্তুবায় বলে একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৃত্তি। এই হিন্দু তন্তুবায় সম্প্রদায় বা জাতি এখনো বর্তমান আছে।

নাথেরা মূলত ব্রাহ্মণ না হয়ে তাঁতী হলে ভারতের শিববিগ্রহ ও শৈবতীর্থ সমূহের নাম নাথ-নামান্ত (যেমন,—ভোলানাথ, অমরনাথ, পশুপতিনাথ, তারকনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি) হত না। নাথেরা মূলত ব্রাহ্মণ না হয়ে তাঁতী হলে শাক্তিতন্ত্র সমূহে বর্ণিত গুরুকুলের পদবী 'নাথ' হত না। নাথেরা মূলত ব্রাহ্মণ না হয়ে তাঁতী হলে শাক্ত-তান্ত্রিক-পূজা কালীপূজায় গোরক্ষানন্দ নাথ, মীনানন্দ (মৎস্যেন্দ্র) নাথ প্রভৃতি নাথ-গুরু-পঙ্‌ক্তির পূজা অবশ্য করণীয়রূপে বিধান (৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সঙ্কলিত শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ প্রকাশিত 'সনাতন

ধর্মানুষ্ঠান' নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) থাকতো না। নাথেরা মূলত শৈব ও শাক্ত গুরু; তাঁরা যোগীব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ।

ওপরে উদ্ধৃত অংশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে যা বলা হয়েছে তাতে মনে হতে পারে,—ফার্সী 'জোলাহা' শব্দ থেকেই 'জুগী' শব্দটা এসেছে। কিন্তু ধ্বনিতত্বের কোন নিয়মানুসারেই সেটা সম্ভব নয়। 'যোগী' থেকে 'যুগী' আসতে পারে ; কিন্তু 'জোলাহা' থেকে কোন ক্রমেই 'জুগী' আসতে পারে না। বল্লাল পরবর্তী যুগের যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের একটা অংশের তখনকার বৃত্তির সঙ্গে জোলাদের বৃত্তির সাদৃশ্য দেখিয়ে, যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের তাচ্ছিল্য করার জন্যই, বোধ হয়, 'জোলা'র সাথে 'জুগী' <যুগী<যোগী যুক্ত করে 'জুগী জোলা' কথার প্রচলন হয়।

ঐ ২০ পৃষ্টায় ঐ প্রথম কলমেই আরো বলা হয়েছে,—

"হিন্দু সমাজে এই ভূতপূর্ব বৌদ্ধধর্মীয় তাঁতী শ্রেণী যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে, মুসলমান সমাজেও এই শ্রেণী 'জোলাহ' নামধারণ করিলেও সেই সামাজিক সমস্যা অনেকাংশে বিদ্যমান আছে।"

এই অংশটুকুর মধ্যে একটা উদ্ভট-কল্পনা স্থান পেয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বৌদ্ধরা মিশে যাওয়ার জন্য যদি উভয় সমাজে একই ধরণের সামাজিক-সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে ওপরে উদ্ধৃত অংশ অনুযায়ী তো বলতে হয়, ভারতবর্ষে যত বৌদ্ধ ছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁতী। কারণ, ঐ প্রবন্ধের মধ্যেই ডাঃ শহীদুল্লাহ-এর একটি উদ্ধৃতি—"যে দেশে বৌদ্ধধর্মের এত নিবিড় প্রভাব ছিল, সে দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হইল কেমন করিয়া—এই প্রশ্ন অনেকের মনে উঠিতে পারে।······মোটের উপর বাংলার বিশাল হিন্দু ও মুসলমান মণ্ডলী এই বৌদ্ধগণকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে"—উদ্ধৃত করে বলতে চাওয়া হয়েছে, যে, বৌদ্ধগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ও মুসলমান সমাজে

প্রবেশ করেছেন। বৌদ্ধগণ সকলে তাঁতী না থেকে থাকলে তো হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু তা তো বলা হয়নি। ভারতের সমস্ত বৌদ্ধই তাঁতী ছিলেন—এমন কল্পনা কি উদ্ভট নয়?

ঐ ২০ পৃষ্ঠায় ঐ প্রথম কলমেই আরো বলা হয়েছে, —

"কানফট্টা" যোগীদের ব্যাপারে এই সন্দেহ ধরা পড়ে। শ্রুত হওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একটি শিশুর জন্ম হলে, গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথের মন্দিরে তাহাকে লইয়া গিয়া মন্ত্রপূত করা হয়। আবার তাহারা মুসলমানের কাছে "মুসলমান" এবং হিন্দুর কাছে "হিন্দু" বলে পরিচয় প্রদান করে।"

এই অংশটুকুর মধ্যেও একটা অসত্য-উদ্ভট কথা বলা হয়েছে। শৈবনাথ-যোগীদের দুটি বংশ। একটি যোনি বা বিন্দু বংশ, অপরটি বিদ্যা বা নাদ বংশ। যোনি বা বিন্দু বংশ পিতা-পুত্র ক্রমে যোগ-সাধনার মধ্য দিয়ে বিস্তারিত হয়েছিল এবং বিদ্যা বা নাদ বংশ গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় প্রসারিত হয়েছিল (গোরক্ষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ দ্রষ্টব্য)। যোনি বা বিন্দু বংশের সকলে গৃহী যাঁরা যোগীব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত এবং বিদ্যা বা নাদ বংশের সকলে সন্ন্যাসী। এই বিদ্যা বা নাদ বংশ কালক্রমে দ্বাদশ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এই দ্বাদশ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের একটি কানফট্টা সম্প্রদায়। সুতরাং কাণফট্টার যোগীরা সন্ন্যাসী; তাদের মধ্যে শিশুর জন্ম হবে কেমন করে? কোন কানফট্টা-যোগীই মুসলমানের কাছে মুসলমান বলে পরিচয় প্রদান করেন না। তবে তাঁদের মুসলমান ভক্ত বা শিষ্য থাকা অসম্ভব নয়। চৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য ছিল; রামকৃষ্ণদেবেরও মুসলমান ভক্ত ছিল; এমনকি রামকৃষ্ণদেব মুসলমান গুরুর কাছে সাধন-শিক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন।

ঐ ২০ পৃষ্ঠায় ঐ প্রথম কলমেই আরো বলা হয়েছে,—

"ইহাও লক্ষ্যের বিষয়, বর্তমানে 'জুগী' জাতীয় লোকেরা নিজেদের প্রাচীন নাথ-সম্প্রদায় ভুক্ত বলে অস্বীকার করেন এবং তাঁহারা আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব।"

এই অংশে " 'জুগী' জাতীয় লোকেরা" বলা ঠিক হয়নি। কারণ, আসলে তাঁরা যোগী বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক। বল্লালী অত্যাচারে, পরবর্তীকালে, নিজেদের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য বৃত্তি পরিত্যাগ করে বিভিন্ন নিম্নবৃত্তি গ্রহণ করে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হন এবং সেইভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁদের একটা অংশের আত্মবিস্মৃতি আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এই আত্মবিস্মৃত অংশটাই বোধ হয়, বৈষ্ণবগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিতে গৌরববোধ করেছেন। তাছাড়া 'যুঙ্গী' নামক আর একটা স্বতন্ত্র জাতির কথা 'জাতিতত্ত্ব কৌমুদী' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে। কালক্রমে এই 'যুঙ্গী'ও 'জুগী'তে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। 'যোগী' (আসলে যোগীব্রাহ্মণ) আর 'যুঙ্গী' আলাদা জাতি। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষেরা প্রায়ই অন্যদের হেয় করার প্রবণতার শিকার হন। সেই প্রবণতা থেকেই 'যোগী' ও 'যুঙ্গী' উভয়ের ক্ষেত্রেই 'জুগী' ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। আবার 'নাথ' এবং 'নট' আলাদা আলাদা দুটি জাতির পদবী। 'নট' পদবী এখন খুব কম দেখা যায়। 'নট' পদবীধারীদের একটা অংশের পদবী কালক্রমে 'নাথ' হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়।

স্মৃতি-শাস্ত্রগুলোতে সঙ্কর ও অন্ত্যজ জাতির যে সমস্ত তালিকা রয়েছে তার মধ্যে 'যোগী' বা 'নাথ' নেই।

ঋগ্বেদের ২।১২।৬ এবং ১০।৯০।১২ শ্লোক, শুক্লযজুর্বেদের ৫।৯ শ্লোক, অথর্ববেদের ৯।১।২।৭ শ্লোক, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ৮ম ও ৯ম অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১।৪২ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,

মহাবিরাটতন্ত্র, আগমসংহিতা, চন্দ্রাদিত্য পরমাগম, ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, বল্লালচরিতম, সাতাতপ সংহিতা, সনাতন হিন্দুধর্মের দীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, নাথদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন শৈব ও শাক্ত গুরু—তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—তাঁরা ছিলেন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বা যোগী ব্রাহ্মণ। যোগিনীতন্ত্রে তো পরিষ্কারভাবে বলাই হয়েছে,—

"যে তুরুদ্রোদ্ভবা বিপ্রাস্তপস সংযম সংযুতাঃ।
ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি সংযুক্তাস্তেতু নাথা প্রকীর্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ, অষ্টবিধ যোগ-ঐশ্বর্যে সিদ্ধ রুদ্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণকে নাথ বলা হয়।

কাজেই, বুঝতেই পারছেন, উল্লিখিত প্রবন্ধের আলোচিত তথ্য ও মন্তব্যগুলির প্রতিবাদ করা আমাদের পক্ষে কতটা অপরিহার্য। আশা করি, আমার এই প্রতিবাদ-পত্রটি আপনার সম্পাদিত মাসিক 'আনৃণ্য'-এর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করে নিরপেক্ষ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করবেন। অন্যথায় মনে করতে বাধ্য হ'ব, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে, আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে আপনিও সামিল হয়েছেন এবং আপনার সম্পাদিত 'আনৃণ্য'কেও সামিল করেছেন। এ ব্যাপারে কি করলেন তা পনের দিনের মধ্যে জানালে বাধিত হ'ব। নতুবা আমরা অন্য পন্থা নিতে বাধ্য হ'ব।

ধন্যবাদান্তে—
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় নাথ
সহ সম্পাদক

নাথগুরুগণ ও ভক্তিধর্ম

ডক্টর এন. সি. নাথ
প্রিন্সিপাল, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত শিষ্য পরম্পরা জ্ঞানেশ্বরীতেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমরা দেখিয়াছি। জ্ঞানেশ্বরের পরেও এই পরম্পরা প্রায় চারি শত বৎসর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক নামী দামী মারাঠা সন্ত ইহার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য। জ্ঞানেশ্বরের অধস্তন পরম্পরার শেষ সিঁড়ী বহিনা বাঈ (১৬২৪—১৭০০ খৃঃ) পরম্পরার এই অংশ এই রূপ দিয়াছেন :—

জ্ঞানেশ্বর (আনুমানিক ১২৭৫—১২৯৬ খৃঃ)
↓
সচ্চিদানন্দ }
বিশ্বম্ভর }
↓
রাঘব চৈতন্য
↓
কেশব চৈতন্য
↓
বাবাজী চৈতন্য
↓
তুকোবা [তুকারাম] (১৬০৮—১৬৪৯ খৃঃ)
↓
বহিনা বাঈ (১৬২৪—১৭০০ খৃঃ)

এই পরম্পরায় তুকারাম (নামান্তর তুকোবা) অন্যতম খ্যাতনামা সন্ত। নাভাজী কৃত ভক্তমাল গ্রন্থ অনুসারে নামদেব (১৪শ শতাব্দী)

জ্ঞানেশ্বরের শিষ্য এবং বল্লভাচার্য (১৪৭৯—১৫৩১ খৃঃ) নামদেবের প্রশিষ্য।[১৫] এই দুইজনও ভক্তিমার্গের খ্যাতনামা মহাজন।

জ্ঞানেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী পরম্পরায় যদিও 'নাথ' উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই, তবুও ইহারা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ জ্ঞানেশ্বর নিজে নাথ সম্প্রদায়ে দীক্ষিত একথা আমরা দেখিয়াছি। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন[১৬]—

১৫। ভক্তমালের মতে জ্ঞানেশ্বরের গুরু বিষ্ণুস্বামী। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি জ্ঞানেশ্বর নিজেই তাঁহার গুরুপরম্পরা জ্ঞানেশ্বরী এবং অমৃতানুভব গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বিষ্ণুস্বামী নহে। নিবৃত্তিনাথ তাঁহার গুরু। এমন হইতে পারে যে বিষ্ণুস্বামী তাঁহার বাল্যের শিক্ষাগুরু ছিলেন অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। Farquhar ভক্তমালের মতে সায় দিয়া বলিয়াছেন—'The story is probably true. (Outline of Rel. lit., পৃ. ২৩৯)। কিন্তু তিনি মনস্থির করিতে পারেন নাই। অন্যত্র বিষ্ণুস্বামীকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন ; তাঁহার প্রভাবের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গুরু বলেন নাই (He should have come under the influence of বিষ্ণুস্বামী who was probably lies senior by some thirty or forty years-ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৫)। ক্ষিতিমোহন সেনের মতে বিষ্ণুস্বামী নামদেবের শিষ্য এবং জ্ঞানেশ্বরের প্রশিষ্য (Medieval Mysticism of India, পৃ. ৫৬)। স্বামী তত্ত্বানন্দ বিষ্ণুস্বামীকে বল্লভাচার্যের (১৫শ শতাব্দী) নামান্তর মনে করেন (The Vaisnava Sects of India, পৃঃ ৩২)। মাধবের সর্বদর্শন সংগ্রহে বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য শ্রীকান্ত মিশ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং বিষ্ণুস্বামীকে জ্ঞানেশ্বরের গুরু মনে করার প্রশ্ন উঠে না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় নামদেব ও তুকারামকে এই পরম্পরার অন্তর্গত মনে করেন না। (দ্রষ্টব্য তৎকৃত গ্রন্থ : *Vaisnavism, Saivism and Minor* Religious Systems, pp. 87-99).

১৬। প্রাণকিশোর গোস্বামী অনূদিত জ্ঞানেশ্বরীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য (শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত)। আরও দ্রষ্টব্য : শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত—The Obscure Religious Cults, পৃ. ২০৮ ; ৩৭৪।

"মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত কিংবদন্তী মতে জ্ঞানেশ্বর ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক"। জ্ঞানেশ্বরীর অনুবাদক প্রাণকিশোর গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"মহারাষ্ট্র সাহিত্যে জ্ঞানেশ্বর নাথজী-র জ্ঞানেশ্বরী এক অপূর্ব অবদান"।[১৭] কাজেই জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী নামদেব, তুকারাম প্রভৃতি শিষ্যপরম্পরা নাথপন্থী বলিয়া পরিচিত না হইলেও এবং ইঁহাদের নাথ পদবী না থাকিলেও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট ইঁহাদের অন্য পরিচয় হইতে পারে না। ইঁহাদের নাথ পদবী না থাকিবার কারণ এও হইতে পারে যে ইঁহারা নাথ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত হঠযোগ এবং মন্ত্রযোগের (তন্ত্র) পরিবর্তে ভক্তিযোগের দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা এই সম্প্রদায়ে নূতন পদক্ষেপ। ইহাও হইয়াছিল নাথযোগী গৈনিনাথের নির্দেশে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হওয়াতেই তাঁহাদের মূল সম্প্রদায় ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। আধুনিক যুগে নাথ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই নানা ভক্তিমূলক সম্প্রদায়ে (চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, অনুকূল, নিগমানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রভৃতি) প্রবিষ্ট; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের নাথত্ব হানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে নামদেব, তুকারাম প্রভৃতিকে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তিমার্গের সাধক বলা চলে। ইঁহারা মহারাষ্ট্র দেশে এবং ভারতের অন্যত্রও ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। নামদেব শেষ জীবন পাঞ্জাবে অতিবাহিত করেন। পাঞ্জাবের ঘোমান গ্রামে অদ্যাপি তাঁহার মঠ বিদ্যমান। দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান শাহ আলম তাঁহাকে ঐ স্থানে একখণ্ড নিষ্কর ভূমি দান করেন। তাহারই উপর ঐ মঠ নির্মিত হয়।[১৮] এখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। এই মঠে ২০০ বৎসরের প্রাচীন একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে নামদেবের বাণী

১৭। দ্রষ্টব্য: তাঁহার অনূদিত জ্ঞানেশ্বরী; শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার কৃত নামামৃত, পৃ. ৪, পাদটীকা ১।

১৮। ক্ষিতিমোহন সেন—Medieval Mysticism of India, পৃ. ৫৬।

সংরক্ষিত হইয়াছে।[১৯] গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে নামদেব সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য হয়ত উদ্‌ঘাটিত হইত।

এই ভক্তিধর্ম প্রচারে মহাত্মা গৈনিনাথ সূত্রধর। তিনি যে যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গকেই যুগোপযোগী সাধন স্থির করতঃ নিবৃত্তিনাথকে সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং নিবৃত্তিনাথকেও এই ধারা অব্যাহত রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা সত্যই এই নাথ যোগীর এক বিরাট কৃতিত্ব এবং মহান্ নেতৃত্বের পরিচায়ক। দুঃখের বিষয়, এই মহাযোগী এবং পরম বৈষ্ণব মহাত্মা গৈনিনাথ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এত স্বল্প যে নাই বলিলেই চলে।[২০] তাঁহার জীবন সম্পর্কে পূর্ণ গবেষণা প্রয়োজন। মহারাষ্ট্র দেশে কিছু তথ্য মিলিতে পারে। দুঃখের বিষয়, মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা বিদ্বান ও গবেষক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বৈষ্ণব ধর্মের যে ইতিবৃত্ত[২১] লিখিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞানেশ্বর প্রসঙ্গ নাই বলিলেই চলে; তাই নিবৃত্তিনাথ ও গৈনিনাথ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ নীরব। তাঁহার মত একজন গবেষক কেন এ ব্যাপারটি চাপিয়া গেলেন বলা দুষ্কর। কিন্তু ইহাতে জ্ঞানেশ্বর বা

১৯। ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৫৭, সন্ত বাণী সংগ্রহ ও অভঙ্গচী গাথা এই দুইটি গ্রন্থে নামদেবের রচিত অভঙ্গ বা ভগবৎস্তুতি সংগৃহীত হইয়াছে। শিখ ধর্মগ্রন্থেও তাঁহার কিছু অভঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। অভঙ্গগুলিতে কিছু সাম্প্রদায়িক তথ্য পাওয়া যায়।

২০। গৈনিনাথ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য গ্রন্থাবলী: (১) জ্ঞানেশ্বর নাথজী কৃত জ্ঞানেশ্বরী, (২) অমৃতানুভব, (৩) R. L. Paugarkar কৃত শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ চরিত, (৪) V. L. Bhave কৃত মহারাষ্ট্র সারস্বত, (৫) নামদেবের "অভঙ্গচী গাথা" (পৃ. ৪২১ হইতে), (৬) Briggs—Goraknath and the Kanphata Yogis (Chap XI), (৭) হিন্দী জ্ঞানেশ্বরী (রামচন্দ্র বর্মা অনূদিত), (৮) J. E. Abbtt কৃত—The Poet Saints of Maharastra, 10 Vols. (বহিনা বাঈ-এর রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে) প্রভৃতি।

২১। Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems.

তাঁহার গুরু পরম্পরার মর্যাদা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। জ্ঞানেশ্বরীর হিন্দী অনুবাদক রামচন্দ্র বর্মা বলেন—

"মহারাষ্ট্র সন্তোঁকী মণ্ডলীমেঁ শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজকা স্থান সর্বোচ্চ ঔর সবসে অধিক মহত্ত্বকা হ্যায়। ইসকা কারণ যহ হ্যায় কি বে মহারাষ্ট্র দেশমেঁ ভক্তি মার্গকে আদ্যপ্রবর্তক ঔর সারে মহারাষ্ট্রকে ধর্মগুরু হ্যাঁয়। যদ্যপি মহারাষ্ট্র দেশমেঁ একনাথ, তুকারাম, রামদাস আদি অনেক বহুত বড়ে বড়ে মহাত্মা ঔর সন্ত হো গয়ে হ্যাঁয়। পরন্তু কালক্রমকে বিচারসে ঔর দূসরী অনেক দৃষ্টিয়োঁসে ভী সবসে অধিক মহত্ত্বকা স্থান শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজকো হী প্রাপ্ত হ্যায়।

শ্রীনিবৃত্তিনাথকো গহিনীনাথসে জো উপাসনা প্রাপ্ত হুঈ থী, বহী উন্হোঁনে জ্ঞানেশ্বর মহারাজকো দী থী। আদিনাথসে গহিনীনাথ তক জো পরম্পরা চলী আঈ থী, বহ মুখ্যতঃ যোগমার্গ পর চলতী থী। ইস পরম্পরাকে সভী মহাত্মা যোগেশ্বর থে। পরন্তু শ্রীনিবৃত্তিনাথনে অপনে গুরুকী আজ্ঞাসে অপনে ভাই-বহনোঁকো শ্রীকৃষ্ণকী উপাসনাকী দীক্ষা দী থী। ঔর অভী সে মহারাষ্ট্র দেশমেঁ ভাগবত ধর্ম যা ভক্তিমার্গকা প্রচার হুআ থা।

সুতরাং মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্ম প্রচারে নাথগুরু পরম্পরার অবদান অনস্বীকার্য।

—:০:—

ওঁ ভগবতে গোরক্ষনাথায় নমঃ

আগরতলায় 'শ্রীশ্রীগোরক্ষ নাথ মন্দির' নির্মাণকল্পে সাহায্যের

ঃ আবেদন ঃ

অমৃততপা ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—

মানুষ মাত্রেই বাঁচতে চায় এবং বৃদ্ধি পেতে চায়। এ হ'লো মানুষের আদিম চাহিদা। আদর্শ-কেন্দ্রিক জীবন-চলনার ভেতর দিয়েই মানুষের বাঁচা-বাড়ার পথ সহজতর ও সুন্দর হয়। যখনই কোন ব্যক্তি, দম্পতি ও সমাজ মহান আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক (spiritual) এবং পার্থিব (material) সম্পদে সমভাবে অগ্রসর হয় তখনই তার উন্নতি সুষ্ঠু ও স্থায়ী হয়। আবার বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন চলনার ভেতর দিয়েই নেমে আসে ব্যক্তি, দম্পতি ও সমাজের অধঃপতন এবং ধ্বংস। তাই যুগে যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, গোরক্ষনাথ, শ্রীচৈতন্য এবং রামকৃষ্ণ প্রমুখ মহামানবগণ ভারতের বুকে অবতীর্ণ হয়ে দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে মুক্তি পথের সন্ধান দিয়েছেন।

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। এখানে বিভিন্ন মহামানব বিভিন্ন যুগে জীব-জগতের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সাধনপথ উদ্ভাবন করেছেন। ফলে সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সাধনপথ গ্রহণ করতে পারেন। এমনিভাবে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, বাবা গম্ভীরনাথ এবং সুন্দরনাথ প্রমুখ সদ-গুরুগণ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত যোগ-কেন্দ্রিক 'নাথপন্থ'কে (nathism) গ্রহণ করে ভারতে এবং ভারতের বাইরের কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে আত্মানুসন্ধান করে চলেছেন এবং এ সাধন পন্থাকে কেন্দ্র করে ভারতে এবং বহির্ভারতে "কয়েকশ' মঠ-মন্দির গড়ে উঠেছে।

ভারতের প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরায় নাথ-পন্থে দীক্ষিত প্রচুর সংখ্যক শিষ্য ও ভক্ত থাকা সত্ত্বেও উদ্যোগের অভাবে এযাবৎ এখানে কোন

মঠ-মন্দির গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় একটি মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। ভারতের উত্তর প্রদেশস্থিত শ্রীশ্রীগোরক্ষ-নাথ মন্দিরের বর্তমান মহন্ত বাবা অবেদ্য নাথজী মহারাজের ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক শুভাগমন উপলক্ষে বিগত ১৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং রাত ৭ টায় আগরতলা, মোটরষ্ট্যাণ্ডস্থিত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভৌমিক মহাশয়ের বাস-ভবনে মহন্ত মহারাজের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এক ভক্ত সম্মেলনে ত্রিপুরার প্রাণকেন্দ্র আগরতলা শহরে "শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির" প্রতিষ্ঠার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য "মহাযোগী শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির নির্মাণ কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হয়।

উক্ত কমিটির মুখ্য পৃষ্ঠ-পোষক নির্বাচিত হয়েছেন বাবা অবেদ্য নাথজী মহারাজ এবং নেপালের রাজগুরু বাবা নরহরি নাথ শাস্ত্রী এবং মুখ্য উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন উড়িষ্যার কেয়ারব্যাঙ্ক মঠের স্বামী শিবনাথজী।

এ মহান যজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কয়েক লাখ টাকার প্রয়োজন।

আসুন, এ পূতঃ আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে আমরা নিজেদের জীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক করে তুলি। ইতি—

বিনয়াবনত—

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক—সভাপতি

মহাযোগী শ্রীশ্রীগুরু গোরক্ষনাথ মন্দির নির্মাণ কমিটি

আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

[চিঠিপত্র অর্ঘাদি প্রেরণ : শ্রীহরিপদ দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক মহাযোগী শ্রীশ্রীগুরু গোরক্ষনাথ মন্দির নির্মাণ কমিটি, পূর্ব ধলেশ্বর (রোড নং—১২) পোঃ ধলেশ্বর, পশ্চিম ত্রিপুরা।]

উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরের জাতিভেদ

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

ভারতীয় হিন্দু-সমাজের জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে আমার "জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর" প্রবন্ধে। সেখানে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে,— অন্ত্যবৈদিক যুগে চতুরাশ্রমকে ভিত্তি করে জাতিভেদের কাঠামো রচিত হয় মুনিঋষিদের প্রজ্ঞায়। এই কাঠামো অনুযায়ী নির্দেশিত হয়,—প্রাক্-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ছেন শূদ্র যাঁর কাজ একমাত্র দেহকেন্দ্রিক বৃত্তিসমূহের সেবার মাধ্যমে আপন-দেহরূপ গণপতির উপাসনা; ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ছেন বৈশ্য যাঁর কাজ কৈশোরে গুরু-গৃহে গো অর্থাৎ গুরু-বাক্য পালন, গুরুর সাহায্যে বেদাধ্যয়নের মাধ্যমে জীবনভূমি কর্ষণ বা ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করার জন্য জীবন-কারবারে লাভবান হওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মার উপাসনা; গার্হস্থ্যাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ছেন ক্ষত্রিয় যাঁর কাজ যৌবনে ভার্যা গ্রহণ, সুসন্তান উৎপাদন, প্রজা অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন, পরম মঙ্গলকে লক্ষ্যে রেখে জীবন, পরিবার ও সমাজের অমঙ্গলকর শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিষ্ণুর উপাসনা, বানপ্রস্থাশ্রমের জীবন-সাধক হচ্ছেন সাধারণ-ব্রাহ্মণ যাঁর কাজ বিগত যৌবনাবস্থায় ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের অভিজ্ঞতাকে সংহত করণ, অধ্যয়ন ও মননের সাহায্যে প্রকৃত তত্ত্ব বা সত্যের উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি অনুযায়ী সমাজ-সংসারের মঙ্গলের জন্য নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরু হয়ে অধ্যাপনা আর গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্মযজ্ঞে পৌরোহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে পঞ্চানন-শিবের উপাসনা; যতি আশ্রমের জীবনসাধক হচ্ছেন যতি-ব্রাহ্মণ* বা

* মহাভারতের বনপর্বের ২৫তম অধ্যায়ে যতি-ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে।

যোগীব্রাহ্মণ যাঁর কাজ জীবনের শেষ স্তরে পূর্ণযোগের মাধ্যমে পরম তত্ত্ব বা সত্যে লীন হওয়ার সাধনার মধ্য দিয়ে মহেশ্বর-শিবের উপাসনা।

কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, জাতিভেদ একান্তভাবে জন্মগত। সেখানে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ-পুত্রের সাথে ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহের ফলে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ ; ক্ষত্রিয়-পুত্রের সাথে ক্ষত্রিয়-কন্যার বিবাহের ফলে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় ; বৈশ্য-পুত্রের সাথে বৈশ্য-কন্যার বিবাহের ফলে জাত পুত্র বৈশ্য এবং শূদ্র-পুত্রের সাথে শূদ্র-কন্যার বিবাহের ফলে জাত পুত্র শূদ্র।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, অন্ত্য-বৈদিকযুগে উদ্ভূত সূক্ষ্মার্থে গুণকর্মগত জাতিভেদ কিভাবে স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগের একান্ত-জন্মগত-জাতিভেদে রূপান্তরিত হয় তার আলোচনা।

স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগের একান্ত-জন্মগত-জাতিভেদের আগের স্তর হিসেবে যেটা সর্ববাদী সম্মতভাবে স্থিরীকৃত সেটা হ'ল স্থূলার্থে গুণকর্ম-গত-জাতিভেদ। এই স্তরে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতি সামাজিক-কর্মে যাঁরা নিয়োজিত থাকতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ ; রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সামাজিক-কর্মে যাঁরা রত থাকতেন তাঁরা ক্ষত্রিয় : ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকার্য, গবাদি-পশুপালন প্রভৃতি সামাজিক-কর্ম দ্বারা যাঁরা জীবিকা-নির্বাহ করতেন তাঁরা বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সেবা-মূলক-কর্ম যাঁদের জীবিকা ছিল তাঁরা শূদ্র নামে পরিচিত ছিলেন। এই স্তরে জাতিভেদ জন্মগত ছিল না ; জন্ম যেখানেই হোক না কেন যিনি যে ধরনের সামাজিক-কর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি সেই কর্মানুরূপ বর্ণ লাভ করতেন।

সকলেই জাতিভেদের এই স্তরটাকে আদি স্তর হিসেবে ধরে নিয়েছেন। এঁরা অনুমান করেছেন, বৈদিক-সমাজে কর্ম-বিভাজনের ফলে জাতিভেদের উদ্ভব হয়েছে। এটা দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে আস্তে আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে। এই জাতিভেদের উদ্ভবের মূলে কোন পরিকল্পনার কথা কেউই অনুমান করেন নি।

অথচ আমার "জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর" প্রবন্ধে জাতিভেদের উদ্ভব-রহস্য উদ্ঘাটন-প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে,—জাতিভেদের উদ্ভবের মূলে ছিল মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞা-প্রসূত পরিকল্পনা। শাস্ত্র-বর্ণিত চারটি বর্ণের গুণ ও কর্ম, চতুরাশ্রমের সাধন-প্রণালী এবং পৌরাণিক-যুগের তিন মূল-দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের রূপ-কল্পনা—এই তিনটি জিনিসের মধ্যে ঐক্য-সূত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমার ঐ প্রবন্ধে জাতিভেদ-প্রথার মূলস্থিত ঐ পরিকল্পনার কথা অনিবার্যভাবেই এসে গেছে।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে,—কোন পরিকল্পনা রচনার জন্য যে উন্নত-মানসিকতার প্রয়োজন হয়, সেই উন্নত-মানসিকতার অস্তিত্ব জাতিভেদের উদ্ভবের যুগে সম্ভব ছিল কি? ঐ যুগের চিন্তা-নায়কদের উৎকৃষ্ট-মানসিকতার অস্তিত্ব যদি একান্তই অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে জাতিভেদপ্রথার উদ্ভবের মূলে কোন পরিকল্পনার কল্পনা নিছক অলীক-কল্পনায় পর্যবসিত হয়, সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমরা উপনিষদে যে চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাই, তাতে সে যুগের মুনি-ঋষিদের উন্নত-মানসিকতা সহজেই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া চতুরাশ্রম তো উন্নত-মনন-প্রসূত পরিকল্পনার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কাজেই জাতিভেদের উদ্ভবের মূলে কোন পরিকল্পনার অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়। [ক্রমশঃ

৺শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য স্মৃতি-কবিতা প্রতিযোগিতায়

তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

স্মৃতিপট

শ্রীবিমান চক্রবর্তী

স্মৃতিপটের দরজা খুলে
মন, যায় যে ছুটে।
মনে পড়ে যায়,
সেই অতীত স্মৃতি।
সে যে কত নিষ্ঠুর,
কত বেদনাময়।

তোমার ক্লান্ত নয়ন
কত না কাতরে
ডেকেছিল সবারে
তোমার সঙ্গী করে
নিয়ে যেতে ওপারে।
ব্যর্থ তোমার দেহ,
ব্যর্থ তোমার মন,
ধরে রাখতে পারল না
নিষ্ঠুর আত্মাকে।

শ্যামের ঠোঁটের বাঁশি
বাঁ পাশে রাধার হাসি
যেমন ধরে রাখি হৃদয়ে
তেমনি—
তোমার কোমল মন,
আর আঁখি দুখানি
স্মৃতিপট হয়ে থাক
সবাকার হৃদয়ের মাঝখানে।

———

শান্তং-শিবমদ্বৈতম্

শ্রীচন্দ্রশেখর নাথ

অনন্ত বিশ্বে প্রবল শক্তি ছুটিয়া চলিছে দশদিকে,
কেন্দ্রে বসিয়া মহা-শান্তং বল্গা টানিছে প্রতিপাকে।
কত হানাহানি কত উঠাপড়া—
কত বিপ্লব কত ভাঙাগড়া,
মৃত্যু আসিয়া দেয় মাথাচাড়া
বিকল করিতে তাকে।
গ্রহ-তারা-শশী চলে যথাবিধি কেহ না ডিঙায় কাকে,
সবার মাঝারে মহান শান্তি সেই শান্তং ধরে রাখে॥

মোদের অন্তর আত্মার মাঝে বিরাজ করিছে নিত্য,
সে মহাশক্তি সেই শান্ত-স্বরূপ সে মহান্ চিরসত্য।
থামাও চিত্তের সব কোলাহল—
নানা প্রবৃত্তি চির চঞ্চল,
সকল শক্তি সব মহাবল
সকল সাধন বিত্ত।
সংহত কর বিধৃত কর একসূত্রে কর যুক্ত,
সে মহা-শান্তং আনন্দরূপ হৃদয়ে হইবে ব্যক্ত॥

যে দুর্জয় বেগ শক্তিরূপেতে মহাবিভীষিকাময়,
সংযমে তাহা আয়ত্ত অধীন কর্মে প্রকট হয়।
জ্বলে সারিসারি মঙ্গলদীপ—
বন্ধন পরে বিজয়ার টিপ,
যিনি শান্তং তিনি হন শিব
কল্যাণ অভ্যুদয়।
সব লাভক্ষতি সব ভয়-ভীতি হয়ে যায় বরাভয়,
অন্তরে রহি করেন রক্ষা তিনি শিব দয়াময়॥

কর্ম-বাধন লভে শিথিলতা মঙ্গল অনুষ্ঠানে,
সব অহং খর্ব করিয়া বিরোধ ঘুচায়ে আনে।
আত্মীয়পর রহে না তো কেহ—
ক্ষমানম্রতা প্রীতি আর স্নেহ
প্রেমের মাল্য গড়ে অহরহ
'অদ্বৈতম্' মহাধনে।
সব সাধনার সিদ্ধি মিলায় কর্মের অবসানে,
মানব জনম পূর্ণ বিকাশে অদ্বৈতের প্রেমগানে॥

চিঠিপত্র

······গতকাল আমার চেম্বারের ঠিকানায় প্রেরিত "শৈবভারতী" ১৩৮৯ বৈশাখ সংখ্যা পেয়েছি। উহাতে "জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত ডঃ মাধব চন্দ্র নাথ" প্রবন্ধে দেখলাম তাঁর মধ্যম জামাতা Dr. (MR) মনোজ কুমার রায়ের নাম ভুল করে "Dr. পরিমল রায়" বলে ছাপান হয়েছে। শ্রীমান মনোজকুমার রায় আমার দ্বিতীয় পুত্র এবং মাধববাবুর দ্বিতীয় (মধ্যম) জামাতা। শ্রীমান মনোজ F.R.C.S. (Eng.), Mch. Orthopedics (Liverpool), Bone Surgery তে Specialist করেছে পাঁচ/ছয় বছর আগে। ········

এন. এন. রায়
১১/১, সেন্ট্রাল রোড
এইচ বি টাউন,
সোদপুর, ২৪ পরগণা

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পাত্রী (২৫) (৫') বি. এ. উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা, স্বাস্থ্যবতী, সূচী শিল্প এবং গৃহকর্মে নিপুণা, রুচীশীলা। জীবনে প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র নাথ, ২৬বি, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলি-২৯।

পাত্রী (২৭) এম, এ (বাংলা) পরীক্ষা দিয়াছে। খেয়াল ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঙ্গীত বিশারদ, রং ফর্সা, উচ্চতা ৫ ফুট, দুই দাদা ইঞ্জিনিয়ার।

এবং

পাত্র এম, এ, (অঙ্ক) ও এল, এল, বি, XII class স্কুলের শিক্ষক। উভয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রী চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীগোষ্ঠবিহারী নাথ, কপাট হাট, P.O. ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা পিন—৭৪৩৩৩১।

পাত্রী (২৭) উচ্চতা (৫'-৩") রং ফর্সা সুন্দর মুখশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম নিপুণা, পি, ইউ মান। পূর্ব-নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা। সম্ভ্রান্ত বংশীয় উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগা-যোগ করুন, পি, এন, ভারতী, ১নং কালীবাড়ী রোড, সন্তোষপুর, কলিকাতা-৭৫।

পাত্র (২৮) (৫'-১০") বি, কম, টুরিজম ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনে প্রধান অফিসার (১৪০০ টাকা) স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। ফর্সা, সুন্দরী, স্মার্ট পাত্রী চাই। শ্রীমন্তমোহন নাথ, পোঃ হাটথুবা, জিঃ ২৪ পরগণা পিন—৭৪৩২৬৯।

পাত্রী (২৫) (৫'-২") এম. এ, পরীক্ষা দিয়াছে, গৃহকর্মে নিপুণা, ফর্সা, সুশ্রী। উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা, শ্রীহরিমোহন দেবনাথ, ৬৩, সেণ্ট্রাল রোড পোঃ নোনাচন্দনপুকুর ২৪ পরগণা পিন—১৪৩১০২।

পাত্রী (২৪) B. Sc. (D), টেলিফোন অপারেটিং ও রিসেপশনিষ্ট কোর্স পাশ। গীটার জানে। মধ্যম বর্ণা, সুশ্রী (১'৬০ মিঃ) গৃহকর্মে ও সূচী-শিল্পে সুনিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র ব্যাঙ্ক অফিসার। উপযুক্ত পাত্র চাই। R. DEBNATH, Giananey Travels & Tours. Commerce House 2nd. floor 2, Ganesh Chandra Ave, Cal-13, 235932, 237843, 221465/2661.

পাত্রী (২৩) B. A. ছাত্রী, সুশ্রী শ্যামবর্ণা (৫'-০")। সর্বপ্রকার গৃহকর্ম, সূচীশিল্পে নিপুণা। পিতা চাকুরে, আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর অধুনা বাঁশদ্রোণীতে নিজস্ব ত্রিতল বাড়ী, শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। শ্রীমতিলাল দেবনাথ ৫, সেণ্ট্রাল পার্ক, বাঁশদ্রোণী কলিকাতা-৭৪৩৫০১।

পাত্রী (২৬) কনভেন্ট শিক্ষিতা (৫'-১") B. Sc. (H), ফর্সা, সুশ্রী স্লিম। গৃহকর্মে, সূচীশিল্পে নিপুণা। পিতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফিসার। আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর, হাওড়া শিবপুরে নিজেদের বাড়ী। একমাত্র কন্যা ও একপুত্র। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীগোপাল চন্দ্র দেবনাথ। Dy. Director, Agriculural Research & Development Corporation. Lakshmi Bhavan, Pan Bazar, Gauhati-781001.

পাত্রের বয়স ২৮, শিক্ষাগত যোগ্যতা বি, কম, মান। ইলেক্‌ট্রিক্ সুপার ভাইজার প্রথম শ্রেণী, মাসিক আয় ৯০০। টাকা পূর্ব নিবাস নোয়াখালী। বর্তমানে সোনারপুর নেতাজী পল্লীতে নিজস্ব বাড়ী। অনূর্ধ ২২ বৎসরের অগ্রজ ব্রাহ্মণ (সংসঙ্গী) পাত্রী চাই। নিরামিষাশী হ'লে ভাল হয়। ফটোসহ যোগাযোগ করুন। শ্রীকৃষ্ণলাল দেবনাথ "স্বস্তিধাম" নেতাজী পল্লী, পোঃ সোনারপুর, জিলা—২৪ পরগণা।

পাত্রী (১৮) মাধ্যমিক পাশ। উচ্চতা (৫'-২") উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা। সরকারী বা ব্যাঙ্কের চাকুরে পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা শ্রীসুনীলবরণ নাথ, ৩৬, কবি ভরতচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০২৮। Phone : 34-2893

পাত্রী (২৬) এম. এ, বি,টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকুরীরতা। উচ্চতা (৫'-৫")। সুন্দরী ফর্সা। উচ্চপদস্থ সরকারী অথবা ব্যাঙ্কে চাকুরে পাত্র চাই। যোগাযোগের ঠিকানা: শ্রীঅজিত কুমার দেবনাথ কালীনগর, পোঃ ডায়মণ্ডহারবার জেলা ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২৮) গেঃ অফিসারের একমাত্র কন্যা, উচ্চতা (৫'-৩"), সুশ্রী দোহারা স্বাস্থ্য, ফর্সা সুকেশী, B.A, B. Ed সঙ্গীত প্রভাকর, কোবিদ, Spoken English, Type ইত্যাদি, গৃহকর্ম জানা। দুই-ভাই MS ডাক্তার ও LLB. প্রতিষ্ঠিত পাত্রের সন্ধান করিতেছি। শ্রীশচীনন্দন মজুমদার ২/৩৬, সংহতি কলোনী, কলি-৪০ (ফোন: ৭২-২৫০২)

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ১৭/৩৮ দক্ষিণদাড়ী রোড, কলিকাতা-৪৮, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ: যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৭

সম্পাদক—সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্রম্

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বর।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ 'ন'-কারায় নমঃ শিবায়॥

মন্দাকিনীসলিল-চন্দন-চর্চিতায় নন্দীশ্বর-প্রমথনাথমহেশ্বরায়।
মন্দারপুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায় তস্মৈ 'ম'-কারায় নমঃ শিবায়॥

শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ 'শি'-কারায় নমঃ শিবায়॥

বশিষ্ঠ-কুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য্য-মুনীন্দ্র-দেবার্চিত-শেখরায়।
চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচনায় তস্মৈ 'ব'-কারায় নমঃ শিবায়॥

যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায় তস্মৈ 'য়'-কারায় নমঃ শিবায়॥

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ শিবলোকমবাপ্নোতি
শিবেন সহ মোদতে॥

॥ ইতি শঙ্করাচার্য বিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্॥

আত্মভোলা

(সনেট)

অসিতবরণ নাথ

বিবেক, ভাবনাহীন—চির উদাসীন
ওহে ও আত্মভোলা মানব সকল,
কুড়িয়ে চলেছ মিছে সুখের ফসল
রঙের খেলায় মেতে শুধু নিশিদিন।
পৃথিবীতে জন্মিয়া চিনিলেনা তাঁরে
যাঁহার সৃষ্টি সুন্দর এ ভুবন,
হয়না কখনো কারো জনম-মরণ
ইচ্ছা বিহনে তাঁর ভব-সংসারে।

জ্ঞানের আলোতে মেল অন্ধ নয়ান
এখনো সময় আছে ভাব স্রষ্টায়,
রাতুল চরণে তাঁর সঁপ মন-প্রাণ
তিনি বিনে কোন গতি নেই দুনিয়ায়।
ধর্মের পথে চ'ল উন্নত শিরে—
চেতনার দীপ জ্বেলে মরমের তীরে।

———

সম্পাদকীয়

তত্ত্বগতভাবে এটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, হিন্দু-জাতিভেদ-প্রথার অবলুপ্তি প্রয়োজন। এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের প্রভাবে প্রায় সর্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরই একটা অংশ বর্তমানে উপনয়ন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন। আমাদের, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই মানসিকতা একটু বেশী মাত্রায় দেখা যায়।

হিন্দু-জাতিভেদ-প্রথার অবলুপ্তির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। আবার জাতিভেদের অবলুপ্তির জন্য ব্রাহ্মণদের অব্রাহ্মণ হয়ে যেতে হবে এমন মানসিকতারও কোন মানে হয় না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সংস্কার-সংস্কৃতিও বিভিন্ন। তাই জাতিভেদের অবলোপ ঘটলে কাউকে না কাউকে স্ব-সংস্কারাদি বর্জন করতেই হবে। কাজেই কে কোন সংস্কার-সংস্কৃতি বর্জন করে কোন সংস্কার-সংস্কৃতি গ্রহণ করবে সেটাই মূল প্রশ্ন।

ব্রাহ্মণদের সংস্কার-সংস্কৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ সন্দেহ নেই। সুতরাং কোন সংস্কার-সংস্কৃতিকে বর্জন করে অন্য কোন সংস্কার-সংস্কৃতিকে গ্রহণ

করতে হলে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টকে বর্জন করে সর্বশ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

হিন্দু-শাস্ত্র-সমূহে বলা হয়েছে,—আদিতে একবর্ণ বা একজাতি ছিল, তখন সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ; কালক্রমে বহুজাতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই জাতিভেদ-প্রথাব বিলোপ সাধন করতে হলে সকল হিন্দুকে ব্রাহ্মণ করে ফেলাই সঙ্গত।

বর্তমানে যে সমস্ত খ্রীষ্টান-সাহেব হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছেন তাঁদের উপনয়ন দিয়ে ব্রাহ্মণ করা হচ্ছে। তাই হিন্দু-সমাজের অব্রাহ্মণদেব (যাঁদের আদিপুরুষগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন) ব্রাহ্মণ করার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়?

সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে উপনয়ন-সংস্কার বর্জন করার মানসিকতা বিদূরিত হোক, তাঁদের মধ্যে সেই মানসিকতাই দৃঢ়বদ্ধ হোক যার ফলে উপনয়নাদি শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ-সংস্কার-সকল হিন্দু সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

শ্রীসুবোধকুমার নাথ
১৩ই জুন ১৯৮২

চতুর্বর্ণ ও রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-জাতি

আদিতে বর্ণ বিভাগ ছিল না। তখন সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন (স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড ৩৮ অং ৪৬ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী কালে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইল মানুষের গুণ ও কর্ম অনুসারে। আরও পরবর্তী কালে চতুর্বর্ণ হইতে বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির কর্ম নির্ধারিত হইয়াছে। বর্তমান ভারতে দেখা যায়, সকল জাতির লোকেরাই নিজ ক্ষমতানুসারে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাহা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহারও করিবার অধিকার ছিল না, তাহাও বিভিন্ন জাতির শিক্ষিত লোকেরা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিগ্রহ ও যাজন প্রভৃতি ক্রিয়া গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ সাহসী হন নাই।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় নাথ

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত নাথ সম্প্রদায়ের[১] লোকেরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ, যাজন সমস্ত ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। বল্লাল চরিতে গৃহস্থ যোগিগণকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে ; এবং ইঁহারা যে পৌরোহিত্য করিতেন তাহার ইঙ্গিতও এই গ্রন্থে রহিয়াছে। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী যোগিগণ একদা এই প্রবল পরাক্রান্ত বঙ্গদেশে ও পূর্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রাজাদের গুরু ছিলেন। বর্তমানে নাথ সম্প্রদায় তাঁহাদের এই সব অধিকার হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন ; তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নিজ ধর্মপথ ও সামাজিক আচার নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। অতীতে গুরুগিরি, পৌরোহিত্য ও ধর্মীয় ভিক্ষাবৃত্তিই এই সম্প্রদায়ের জীবিকা ছিল। বিহারে আজও এই সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগিবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা গোঁসাই বা গোস্বামী উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্বে আধ্যাত্ম-ধ্যান-ধারনাই এই সম্প্রদায়ের লোকদের একমাত্র ব্রত ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বৃত্তির সহিত আধ্যাত্ম জীবন-যাত্রার কোন সম্বন্ধ নাই ; বহুপ্রকার বৃত্তির লোক আমাদের সমাজে দেখা যায়। ইঁহারা কাহারা ?

১ নাথ-সম্প্রদায়ে দুইটি বংশ ছিল—(১) যোনি বা বিন্দু বংশ এবং (২) বিদ্যা বা নাদ বংশ। যোনি বা বিন্দু বংশের সকলেই ছিলেন গৃহস্থ ; তাঁহারা পিতা-পুত্র-ক্রমে শৈব-যোগ-সাধনা করিতেন। আর বিদ্যা বা নাদ বংশের সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী ; তাঁহারা গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় শৈব-যোগ-সাধনা করিতেন। যোনি বা বিন্দু বংশের গৃহস্থ নাথেরা যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন।

মনে হয়, শৈব নাথধর্মে দীক্ষিত হইবার বিধিনিষেধের[১] শিথিলতার সুযোগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গৃহস্থ লোক নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নাথ-পদবী ব্যবহার করিয়াছেন।[২] ইঁহাদের একটি অংশ পূর্ব-সম্প্রদায়ে থাকিয়া গিয়াছেন; কিন্তু অপর অংশ নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। নাথ-সম্প্রদায়ের যোনিবংশে অনুপ্রবেশকারী এই অংশটিই সংস্কার-হীন অবস্থায় থাকিয়া গিয়াছেন। অবশ্য বল্লালী অত্যাচারের কালে আত্মগোপন করিতে গিয়াও যোনি-বংশের অনেকে সংস্কার-হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এখনও সংস্কার-হীন অবস্থায় আছেন। ইঁহাদের ব্রাত্য-রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ বলা যায়।

বর্তমানে বর্ণভিত্তিক পেশা আর নাই; সকল বর্ণের মানুষই সকল পেশায় নিযুক্ত আছেন। আবার ব্রাত্যগণের ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংস্কার গ্রহণ করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে।

সুতরাং বঙ্গদেশে নাথ, দেবনাথ বা অন্যান্য উপাধিধারী যে সকল রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ ব্রাত্য অবস্থায় আছেন, তাঁহারা যে বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, তাঁহারা যদি ব্রাত্য-অবস্থা পরিহার করিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেন তাহা হইলেই রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজ-ভুক্ত হইতে আর তাঁহাদের বাধা থাকে না।

নাথ-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ রুদ্রজ-ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান প্রধান কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ, আর রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা কেবল কর্মকাণ্ডী।

১ যে কোন বর্ণের মানুষ নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে পারিতেন; কিন্তু রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন গৃহস্থ নাথ-গুরুর নিকট দীক্ষা লইলেও 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে পারিতেন না। একমাত্র সন্ন্যাস-দীক্ষার পরই তাঁহাদের 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিয়া নাথ-সম্প্রদায়ের বিন্দুবংশে স্থান লাভ করিবার অধিকার জন্মিত।

২ বণিক প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও 'নাথ' পদবী দেখা যায়।

নাথ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সামাজিক বৈদিক অধিকারগুলি প্রায় একই। এই দুই ব্রাহ্মণ জাতির সামাজিক বৈদিক অধিকারগুলির তুলনামূলক একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

নাথ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণগণের সামাজিক বৈদিক অধিকার	রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সামাজিক বৈদিক অধিকার
১। সামবেদ অনুসারে সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।	১। সামবেদ অনুসারে সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।
২। দশাশৌচ পালিত হয়।	২। দশাশৌচ পালিত হয়।
৩। মৃতকে শ্মশানে দক্ষিণ শিয়রে শায়িত করান হয়।	৩। মৃতকে শ্মশানে দক্ষিণ শিয়রে শায়িত করান হয়।
৪। পাচিত অন্নে পিণ্ডদান করা হয়।	৪। পাচিত অন্নে পিণ্ডদান করা হয়।
৫। বিবাহিতা মহিলাগণ শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিবার ও নারায়ণের মাথায় তুলসী দিবার অধিকারিণী।	৫। বিবাহিতা মহিলাগণও শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিবার ও নারায়ণের মাথায় তুলসী দিবার অধিকারিণী নহেন।
৬। বিবাহিতা মহিলাগণ ভগবানের ভোগ রান্না করিবার অধিকারিণী।	৬। বিবাহিতা মহিলাগণও ভগবানের ভোগ রান্না করিবার অধিকারিণী নহেন। অনেকক্ষেত্রে দীক্ষা-প্রাপ্ত বিবাহিতা মহিলাগণ ভগবানের ভোগ রান্না করিয়া থাকেন।
৭। বিবাহিতা মহিলাগণ প্রণব-উচ্চারণের অধিকারিণী।	৭। বিবাহিতা মহিলাগণও প্রণব উচ্চারণের অধিকারিণী নহেন।

শ্রীগুরু

(অদ্বৈতানুভূতি)

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় (আশ্রব)

"গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিস্তু কুর্বানো নরকং ব্রজেৎ।"

ওঙ্কারনাথম্ ভজ ত্রিলোকেশম্।

চৈতন্যরূপম্ সচ্চিদানন্দম্॥

'গু'-শব্দে তিমিরনাশে. 'রু'-শব্দে তেজ প্রকাশে।

চিৎ জগৎকে প্রকাশ করে মায়ার বাঁধন আর থাকে না॥

এ ধরার ধূলিমাখা দেহখানি যবে।

তোমারই শ্রীপদে আমি ন্যস্ত করি ভবে॥

মুগ্ধা জননীর মত ধূলিমাটি ঝেড়ে।

হে মহান্, স্নেহভরে স্থান দিলে ক্রোড়ে॥

পরম পাবন স্পর্শে না করিতে যদি।

সদ্যঃপূত মোর সব তনু-মন-আদি॥

মর্ত্য এ দেহখানি কতদিন নাহি জানি।

ঘুরিত পঙ্কিলাবর্তে পার্থিবেরে মানি॥

মূর্ত পরব্রহ্ম তুমি করকৃপা বিতরণ।

সর্বজীবে তরাইতে মোক্ষদানে এ জনন॥

ভক্তজনে কৃপা কর, অভক্তরে ভক্ত কর।

কৃপা তব ভবে বিতর সর্বজন পাপহর॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদি তোমার কৃপায়।

মৃণালের তন্তু বাহি সদা আসে যায়॥

তব কৃপা হলে কুলকুণ্ডলিনী জাগি।

সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধগা পরমশিব লাগি॥

মূলাধারে চতুর্দলে বিরাজিছ কত ছলে।
স্বাধিষ্ঠান ষড়দলে আরোহিছ কুতুহলে॥

নাভিদেশে মনিপুর শতদল সরসিজে।
দ্বাদশদল অনাহতে নাদরূপে রাজ' নিজে॥

কণ্ঠে ষোড়শদলে বিশুদ্ধেরে জাগাইলে।
ভ্রূমধ্যেতে বীজ তুমিই আজ্ঞাচক্র দ্বিদলে॥

শিরোদেশে সহস্রারে সহস্রদলে অবশেষ।
পরম গৌরবে সদা মূর্ত ওগো মহিমেশ॥

সুষুম্নার পথে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়ে।
সহস্রারে লগ্ন কর পরমশিবরূপী স্বীয়ে॥

উভযোগ হতে যে হয় পরম-অমৃতক্ষরণ।
তাহা পানে নির্বিকল্প সমাধিস্থ জীব তখন॥

ইত্থম্ভূত কতরূপে হারিয়া বাহ্য চেতন।
আত্মতত্ত্বজ্ঞান দানে কর জ্যোতিঃ প্রদর্শন॥

আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইষ্টদর্শন সার্থক হয়।
কৃপা তব প্রদানিলে শিষ্যকুলে, বিশ্বময়॥

একুশ দিনের অধিক তখন জীবদেহ রহে না।
নির্বিকল্প সমাধিতে যবে হরণ কর চেতনা॥

তাই যাচি হে অণীয়ান্, কৃপা কর মহীয়ান্।
লুপ্ত কর বাহ্য চেতন করি তন্ময়ীভবন॥

প্রদানিলে নরদেহ কর্ম করালে না সেহ।
পুনঃপুনঃ গতায়াত যাহে রোধ হবে ইহ॥

সুখদুঃখ দ্বন্দ্বাতীত ওহে বিমৎসর।
সবে তোমা কৃপা পরে করিছে নির্ভর॥

গুণীভূত সত্ত্বারূপে আবির্ভূত কৃপানাথ।
সর্বগুণাতীত ভাবে ভবে তব প্রতিভাত॥

বিশ্বব্যাপী দেব তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে।
সর্বক্ষেত্রে সদা ভবে রক্ষ শিষ্যচয়ে॥

জপ্যাদি বাঞ্ছিত যাহা লয় করি, হে মহেশ।
ভবাব্ধিপারঙ্গম শিষ্যে কর অবশেষ॥

ত্রিকালীন সন্ধ্যা জপে ব্রাহ্মণত্বে উত্তরণ।
এ হেন সঙ্করযুগেও শাস্ত্রপথাবলম্বন॥

যুগাবতার হয়ে ঘোষ' জাতিভাজী সে ব্রাহ্মণ।
যে জন ত্রিকাল নাহি করে সন্ধ্যা সম্বন্দন॥

শাস্ত্র মত, শাস্ত্র পথ, শাস্ত্র হয় ভগবান্।
বলদৃপ্ত বজ্রঘোষ কণ্ঠে তব নির্দেশন॥

দিনত্রয় যে-ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাদি না জপয়।
দেহতার শূদ্রবপুঃ প্রাপ্ত হয় সুনিশ্চয়॥

অন্তহীন কোটি কত লীলা ভবে অবিজ্ঞাত।
দীনতম সেবকাধম এ তনয় কি পরিজ্ঞাত॥

কে তোমারে বর্ণিবে হে, স্বয়ং বর্ণমালা।
যেটুকুই প্রকাশ' তা দীপ্ত হুতাশ-জ্বালা॥

সংখ্যাতীত মুখে তব অসম্ভব সে বর্ণন।
লীলা তব বর্ণিতেছ স্বয়ংরহি' সংগোপন॥

'ওঙ্কার' মাঝারে রহি একরূপে সদালীন।
সর্বশীর্ষে সহস্রারে তাই তব পীঠাসন॥

জন্মান্ধ এ জীব কাঙ্গালে যাচে সদা সকাল-সাঁঝে।
দেখা দিয়ে আশ্বাসিয়ে প্রশান্তি দাও চিত্তমাঝে॥

স্বজাতীয় সংহতি ও তার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীনরেশচন্দ্র নাথ

প্রশ্ন উঠতে পারে—মানবতামুখী আধুনিক কালে, স্বজাতীয় পরিচয় ও সংহতির কথা সংকীর্ণতার পরিচায়ক কিনা। এর যথার্থ উত্তর খুঁজতে গেলেই আরও কতকগুলো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। তা হচ্ছে—পিতৃ পরিচয়, বংশ পরিচয়, গোষ্ঠী পরিচয়—এসব কি দূষণীয়? তাছাড়া, আমরা বাঙালী; বাংলার পরিচয়, বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির চর্চা কি আমাদের পক্ষে দূষণীয়? তদুপরি যখন আমরা ভারতীয় তখন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা কি নিন্দনীয়? উত্তরটি কিন্তু বিনা দ্বিধায় বলতে হবে "নিশ্চয়ই না"। বরং আপন বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় কৃষ্টির চর্চা সব সময়েই গৌরবের।

বস্তুতঃ মানুষ হিসাবে মানুষের পরিচয়টা খুবই ব্যাপক। সংকীর্ণ অর্থে মানুষ সে তার নিজেকে নিয়ে নিজে একা। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সে বিশ্ব-মানব সমাজের অঙ্গ। তাছাড়াও এই ব্যক্তি মানুষ ও বিশ্ব-মানবের মধ্যে রয়েছে কতিপয় স্তর। এই স্তরগুলো হচ্ছে—পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, স্বজাতীয়, প্রাদেশিক ও জাতীয় স্তর। এই সবগুলোকে মিলিয়ে একটি মানুষের পুরো পরিচয়। এছাড়া যদি কোন ব্যক্তিকে, একজন আলাদা মানুষ হিসাবে, কিংবা একটি পরিবারের মধ্যে বা গোষ্ঠী, প্রাদেশিক, এমন কি জাতীয় স্তরের কোন বিশেষ একটিতে গণ্ডিবদ্ধ করা যায়—তবে কিন্তু তার পুরো পরিচয়টা পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই—সমাজের প্রাথমিক স্তরে এক একটি মানুষ হিসাবে এক একটি 'ব্যক্তিত্ব' ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও

যখন সে পারিবারিক ক্ষেত্রে পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে অবস্থান করে, তখন কিন্তু সে তার ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব বজায় রেখেই পরিবারের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করে।

আরও লক্ষ্য করা যায়, যেমন একজন বাঙালী ; ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে তার যেমন রয়েছে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব—যাকে হারিয়ে ফেললে যেন তার সব কিছুকেই হারিয়ে ফেলা হয় এবং যাকে হারিয়ে ফেললে যেন তার থাকে না কিছুই—সে রিক্ত—সে দীনতাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ; কিন্তু প্রাদেশিকতার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তিত্বের সহিত সামঞ্জস্য রেখেই গড়ে ওঠে বাঙালীত্ব বোধ ; যেমনভাবে গড়ে ওঠে পারিবারিক ঐক্য, গোষ্ঠীগত ঐক্য। তারপর প্রাদেশিকতার পরবর্তী ধাপে গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি। এখানে আমরা বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, আসামী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সবাই মিলে ভারতীয়—এক জাতি, এক প্রাণ। যদিও এর পরও আমাদের আরও একটি সংগঠন আছে, তা হচ্ছে—বিশ্ব-মানব সংগঠন। এখানে ভারতীয়, জাপানী, রাশিয়া-চীন-আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-বাসী সবাই মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

তাই যেমনি করে কোন একজন ছোটখাট ধর্মীয় সঙ্ঘ কিংবা কোন বিশেষ একটি ধর্মের লোক হয়েও সব ধর্মের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে ; যেমনি করে কোন একজন কোন বিশেষ প্রদেশের লোক হয়েও একটি দেশের হতে পারে ; তেমনি করেই ব্যক্তি মানব থেকে বিশ্ব-মানব পর্যন্ত সর্বস্তরেই মিলিয়ে রয়েছে এক আঙ্গিক যোগসূত্র—সেই সূত্রের দ্বারাই এক বহুতে এবং বহু একে আবদ্ধ হয়ে আছে। এমনি করেই, বংশ, স্বজাতি ও জাতীয়তার ক্ষেত্রেও আপন মৌলিকত্ব রক্ষা করেও ব্যক্তি-মানব বিশ্ব-মানব সমাজের মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি করেই পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তি মানুষ থেকে আরম্ভ করে সমাজের উচ্চ-উচ্চতর সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেমন প্রতিটি মানুষ পূর্ণতার দিকে

অগ্রসর হয়, তেমনি প্রতিটি সংগঠনও ব্যক্তিকে সৌহার্দের পথে, ঐক্যের পথে পরিচালিত করে মানবের মহামিলনের পথ প্রশস্ত করে তোলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কারো পুরো পরিচয় ও পূর্ণতা নির্ভর করছে ব্যক্তিত্বের সহিত সমাজের প্রতিটি স্তর—যথা, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, স্বজাতীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় প্রভৃতি সাংগঠনিক স্তরের সঙ্গে সংহতি উপলব্ধি করে—এদের কাউকে উপেক্ষা করে নয়।

আরও লক্ষণীয়—অধুনাকালেও কারো প্রাথমিক পরিচয় স্থিরীকৃত হয় যথাক্রমে বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় ভিত্তিতে। এমন কি এসব ক্ষেত্রে যে যত বলিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত সে ততই গৌরবান্বিত এবং তার পক্ষে বৃহত্তর সমাজে স্থান করে লওয়াটাও যেন অপেক্ষাকৃত সহজ। এমন কি, যে সবকিছু হারিয়েও নিঃস্ব—সেও তার নিঃস্বতার মাঝে বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় কৌলিণ্যের গর্বানুভব করে শান্তি ও তৃপ্তি খুঁজে পায়—মানব মনের বিবিধ নিয়মের মধ্যে এটিও একটি সাধারণ নিয়ম। তাই দেখা যায় বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় গৌরব যেমন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয় তেমনি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও তৎ তৎ বংশ, গোষ্ঠী, স্বজাতীয় ও জাতীয় গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া নিজের পরিচয়ই যদি নিজের অজানা—তাও কিন্তু মোটেই গর্বের নয় বরং অনেক সময় তা অক্ষম অসহায়তাকেই প্রমাণ করে। এমন কি, সে অবস্থাটাও যেন পিতৃপরিচয়হীনের চাপা দুর্বিসহ অস্বস্তির মতো। প্রসঙ্গক্রমে একটি সত্য কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তখন স্কুলে পড়ি। একজন সহপাঠী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমানের 'নাথ' জাতটা কেমন হে? এ জাতটা কোথা থেকে এলো?" আমি কিন্তু নাকাল। নিজ স্বজাতির পরিচয় সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন একটা প্রশ্ন হতে পারে, এরূপ ধারণাই আমার ছিল না। পরবর্তীতে সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও

আমাকে আরো দু' দুবার ঐ একই ধরণের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথম দুটো ঘটনার পরও আমার মনে হয়েছিল—এ প্রশ্ন অহেতুক ও অবাস্তব। বাবার নাম, বংশ পরিচয়, জাতি হিসাবে আমি বাঙালী বা ভারতীয়, ধর্মের দিক থেকে হিন্দু এবং জীব হিসাবে একজন মানুষ—ভেবেছিলাম, এই হয়তো আমার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তৃতীয় বারেও একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, আমার অনীহা ও ঔদাসীন্য সত্বেও, পরিস্থিতির চাপে, অন্তত জাত রক্ষার খাতিরে—মনে হচ্ছিল, নিজ স্বজাতি 'নাথ' সম্বন্ধে কিছুটা না জানলেই যেন নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে মনের কোণে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট বুঝতে পারি নি—তাহলো, ইতিমধ্যে যেমন আমাদের কেউ কেউ করছেন—নামের ডান পাশ থেকে 'নাথ' শব্দটা ছেটে ফেলে সেই স্থলে অন্য একটি পদবী ব্যবহার করলে মন্দ হত না। অন্ততঃ সুকৌশলে অনুরূপ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া থেকে গা-ঢাকা দেবার একটা আপাত উপায় হতো।

যাকগে সেকথা। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে—সব পরিচয়ের সঙ্গে স্বজাতীয় পরিচয়টি জানাও অপরিহার্য। এ পরিচয় কখনও সংকীর্ণতার পরিচায়ক হতে পারে না। সংকীর্ণতা তাহাই, যা নিজেকে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপনাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে। পক্ষান্তরে যা বৃহতের সঙ্গে যুক্ত—সেখানে সে উদার, সেখানে সে সার্থক।

যাহোক, জড়তা ও অনীহা পরিত্যাগ করে স্বজাতীয় ইতিহাস খুললে দেখা যায়—আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নাথ-সাধনতত্ত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য নিয়ে একদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়ে সেই জাতি (অবশ্য জাতি শব্দটি এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) পরবর্তীতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে স্বজাতীয় মহিমা ও সাধন-তত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে দীর্ঘকাল অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে কাটিয়েছে।

যদিও অধুনা স্বজাতির বাইরে থেকে বহু সুধী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি বিস্মৃতপ্রায় 'নাথ-ইতিহাস' ও 'নাথ-ধর্ম' গবেষণায় প্রয়াসী হয়েছেন এবং

এর দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, যোগ-বিষয়ক সাহিত্যিক ও মানবিক বিভিন্ন দিক থেকে গৌরবময় তত্ত্ব ও তথ্যাদির উদ্ঘাটন করে চলেছেন ; তবুও স্বজাতীয় স্তরে সুসংহত প্রচেষ্টা হারানো স্বজাতীয় সম্পদ পুনরুদ্ধার ও যুগের চাহিদায় পুর্ণমূল্যায়নে সাহায্য করবে। মুখ্যতঃ এভাবে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এই সংহতি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসাবে কাজ করতে পারলেই তা চরম' চরিতার্থতা লাভ করতে সমর্থ হবে। তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিস্মৃতপ্রায় আধ্যাত্মিক সাধন-তত্ত্ব—একটি ছিন্ন -বীণা আপন ছন্দ ফিরে পাবার সুযোগ পাবে—যা শুধু স্বজাতিরই গৌরব বৃদ্ধি করবে না ; পক্ষান্তরে বহু সাধনার পীঠভূমি বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ধারক ভারত মাতার পক্ষেও হবে মহা গৌরবের এবং এতে করে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে—যে সংস্কৃতি বহু সাধনার ধারায় রচিত করেছে অখণ্ড মনিহার—যেখানে শত-বীণা ধ্বনিত হচ্ছে অভিন্ন ঐক্যমন্ত্রে।

———

উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরের জাতিভেদ

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগের জাতিভেদ একান্ত-জন্মগত-জাতিভেদ। বিভিন্ন স্মৃতি-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণ বা জাতি নির্ণয়ক যে সমস্ত শ্লোক পাওয়া যায়, সেগুলোর মর্মার্থ গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়—

ব্রাহ্মণপুত্র + ব্রাহ্মণকন্যা = ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়পুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = ক্ষত্রিয়

বৈশ্যপুত্র + বৈশ্যকন্যা = বৈশ্য

শূদ্রপুত্র + শূদ্রকন্যা = শূদ্র

এই যুগে অনুলোম-অসবর্ণ (উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কনে) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু প্রতিলোম-অসবর্ণ (নিম্নবর্ণের বর ও উচ্চবর্ণের কনে) বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ-বিধি অমান্য করে প্রতিলোম-অসবর্ণ-বিবাহ হলে সমাজে তাঁদের স্থান হ'ত না।

স্মৃতি-শাস্ত্রে দেখা যায়,—অনুলোম বা প্রতিলোম, কোনপ্রকার অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তান, কখনোই পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হতেন না।

বিষ্ণু-সংহিতার ১৬শ অধ্যায়ের ১ম ও ২য় শ্লোকে বলা হয়েছে,—

"সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি ॥

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ ॥"

অর্থঃ—"সবর্ণাস্ত্রীতে সবর্ণপুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোমাস্ত্রীতে মাতৃ-সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়।" অর্থাৎ—

ব্রাহ্মণপুত্র + ব্রাহ্মণকন্যা = ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়পুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = ক্ষত্রিয়

বৈশ্যপুত্র + বৈশ্যকন্যা = বৈশ্য

শূদ্রপুত্র + শূদ্রকন্যা = শূদ্র
ব্রাহ্মণপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = ক্ষত্রিয়
ব্রাহ্মণপুত্র + বৈশ্যকন্যা = বৈশ্য
ব্রাহ্মণপুত্র + শূদ্রকন্যা = শূদ্র
ক্ষত্রিয়পুত্র + বৈশ্যকন্যা = বৈশ্য
ক্ষত্রিয়পুত্র + শূদ্রকন্যা = শূদ্র
বৈশ্যপুত্র + শূদ্রকন্যা = শূদ্র

এই অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তানের জাতি সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যা বলা হয়েছে তাঁর গাণিতিক-প্রকাশ নিম্নরূপ ঃ—

বিপ্র বা ব্রাহ্মণপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = মূর্দ্ধাবিষিক্ত
বিপ্রপুত্র + বৈশ্যকন্যা = অম্বষ্ঠ
বিপ্রপুত্র + শূদ্রকন্যা = নিষাদ বা পরাশব
ক্ষত্রিয়পুত্র + বৈশ্যকন্যা = মাহিষ্য
ক্ষত্রিয়পুত্র + শূদ্রকন্যা = উগ্র
বৈশ্যপুত্র + শূদ্রকন্যা = করণ

আবার পরাশর-সংহিতা অনুযায়ী,—

ব্রাহ্মণপুত্র + শূদ্রকন্যা = দাস (ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত হলে)
= নাপিত (অসংস্কৃত থাকলে)
ক্ষত্রিয়পুত্র + শূদ্রকন্যা = গোপাল
ব্রাহ্মণপুত্র + বৈশ্যকন্যা = আর্দ্ধিক বা অর্দ্ধসীরি (ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত সন্তানের জাতি সম্পর্কে স্মৃতি-শাস্ত্রে মতভেদ রয়েছে। ব্রাহ্মণপুত্রের সাথে শূদ্র-কন্যার বিবাহের ফলে জাত সন্তানকে বিষ্ণু-সংহিতায় শূদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় নিষাদ বা পরাশব এবং পরাশর-সংহিতায় সংস্কৃত হলে দাস আর অসংস্কৃত থাকলে নাপিত বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণপুত্রের সাথে বৈশ্যকন্যার বিবাহের ফলে জাত সন্তানকে বিষ্ণু-সংহিতায় বৈশ্য,

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় অম্বষ্ঠ এবং পরাশর সংহিতায় আব্দিক বা অর্দ্ধসীরি (সংস্কৃত হলে) বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয় পুত্রের সাথে শূদ্র কন্যার বিবাহের ফলে জাত সন্তানকে বিষ্ণু-সংহিতায় শূদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় উগ্র এবং পরাশর-সংহিতায় গোপাল বলা হয়েছে।

প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহে জাত সন্তান সমাজে নিন্দিত ছিলেন। এরূপ বিবাহে উৎপন্ন সন্তানের জাতি সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যা বলা হয়েছে তার গাণিতিক প্রকাশ হচ্ছে,—

ক্ষত্রিয়পুত্র + বিপ্রকন্যা = সূত
বৈশ্যপুত্র + বিপ্রকন্যা = বৈদহক
শূদ্রপুত্র + বিপ্রকন্যা = চাণ্ডাল
বৈশ্যপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = মাগধ
শূদ্রপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = ক্ষত্তা
শূদ্রপুত্র + বৈশ্যকন্যা = আয়োগব

আবার বিষ্ণু-সংহিতা অনুযায়ী,—

ক্ষত্রিয়পুত্র + ব্রাহ্মণকন্যা = সূত
বৈশ্যপুত্র + ব্রাহ্মণকন্যা = বৈদেহ
শূদ্রপুত্র + ব্রাহ্মণকন্যা = চাণ্ডাল
বৈশ্যপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = পুক্কস
শূদ্রপুত্র + ক্ষত্রিয়কন্যা = মাগধ
শূদ্রপুত্র + বৈশ্যকন্যা = আয়োগব

কাজেই প্রতিলোম-অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত সন্তানের জাতি সম্পর্কেও স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে মতভেদ রয়েছে। বিষ্ণু-সংহিতায় যাঁকে পুক্কস বলা হয়েছে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় তাঁকেই বলা হয়েছে মাগধ; বিষ্ণু-সংহিতায় যাঁকে মাগধ বলা হয়েছে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় তাঁকেই বলা হয়েছে ক্ষত্তা।

স্মৃতি-শাস্ত্রগুলোর এই অসঙ্গতির একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, এক এক সংহিতা এক এক সময়ে রচিত হয়েছে এবং সময়ের

ব্যবধানে এবং প্রয়োজনে অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তানের জাতি সম্পর্কে সংজ্ঞা পাল্টেছে এবং পরিবর্তিত সংজ্ঞা ঐ সংহিতায় স্থান পেয়েছে অথবা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারেরা সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটিয়ে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে প্রচার করেছেন এবং সেই মত পরবর্তীকালের জাতি-পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে।

এ ছাড়া 'অত্রি-সংহিতা'য় রজক, চর্মকার, নট (নাটকযাত্রা করে জীবিকা নির্বাহকারী), বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল এবং 'ব্যাস-সংহিতা'য় বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, স্বপচ ও কোল—এই কয়টি অন্ত্যজ-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য এই সমস্ত অন্ত্যজ-জাতির উৎপত্তি কিভাবে তা এখানে পাওয়া যায় না। একমাত্র দাস ও নাপিতের উৎপত্তি সম্পর্কে 'পরাশর-সংহিতায়' যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, দাস ও নাপিত উভয়েই শূদ্র-কন্যার সাথে ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিবাহের ফলে জাত—সংস্কৃত হলে দাস, অসংস্কৃত থাকলে নাপিত। কিন্তু অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত অন্যান্য সঙ্কর-জাতি এবং প্রতিলোম-অসবর্ণ-বিবাহের ফলে জাত-চাণ্ডাল ভিন্ন অন্য সঙ্কর-জাতিসমূহের উল্লেখ এই অন্ত্যজ-জাতি তালিকায় নেই। কাজেই এখানেও প্রচুর অসঙ্গতি দেখা যায়। এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যায়ও বলতে হয়, সময়ের ব্যবধানে অন্ত্যজ-জাতির তালিকাও পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং সেই পরিবর্তিত তালিকা লিপিবদ্ধ করে প্রচার করা হয়েছে।

উদ্ভবের পর গুণকর্মগত জাতিভেদ কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের যুগের একান্ত জন্মগত জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়েছে বলেই মনে হয়। এবারে সেই স্তরগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, অন্ত্য-বৈদিকযুগে চতুরাশ্রমের সূক্ষ্ম সাধন-কর্মকে ভিত্তি করে জাতিভেদ তত্ত্ব অনুভূত হয় মুনি-ঋষিদের প্রজ্ঞায়। এই জাতিভেদ তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ন যখন শুরু হয় তখন অচিরেই

তত্ত্বের সূক্ষ্ম অর্থের স্থানে, কিছুটা মানব সাধারণের অজ্ঞানতার জন্য, কিছুটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বার্থান্বেষীর ইচ্ছাকৃত অশুভ প্রয়োগ ফলে, স্থূল অর্থ অনিবার্যভাবে এসে যায়। যেখানে পূর্ণযোগের মাধ্যমে নিজেকে অস্তিবাচক ব্রহ্ম বলে অপরোক্ষভাবে অনুভব, যোগসাধনা, গুরু হয়ে যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষা দান প্রভৃতি যতি আশ্রমের সূক্ষ্ম কর্মসকল যতি বা যোগীব্রাহ্মণের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন, যোগ-সাধনা, গুরুগিরি প্রভৃতি স্থূল সামাজিক কর্মসকল যতি বা যোগী ব্রাহ্মণের কর্মরূপে গৃহীত হ'ল। যেখানে যোগাভ্যাস, গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্মযজ্ঞে পৌরোহিত্য, অধ্যয়ন ও মননের সাহায্যে নতুন তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরু হয়ে অধ্যাপনা প্রভৃতি বানপ্রস্থাশ্রমের সূক্ষ্ম কর্মসকল সাধারণ ব্রাহ্মণের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এই স্থূল সামাজিক কর্মসকল সাধারণ ব্রাহ্মণের কর্মরূপে গৃহীত হ'ল। যেখানে ভার্যা-সন্তান-সন্ততিরূপ প্রজাপালন বা দান, জীবন যুদ্ধ পরিচালন, উত্তম গৃহকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার প্রভৃতি গার্হস্থ্য আশ্রমের সূক্ষ্ম কর্মসকল ক্ষত্রিয়ের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে রাজা হয়ে প্রজাপালন, অন্য রাজার আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা, রাজ্যের সীমানা বর্ধিত করে এবং প্রজাদের ওপর শাসন-দণ্ড কায়েম করে অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার প্রভৃতি স্থূল সামাজিক কর্মসকল ক্ষত্রিয়ের কর্মরূপে গৃহীত হ'ল। যেখানে গুরুর উপদেশ অনুসারে অধ্যয়নের মাধ্যমে তত্ত্বগত জ্ঞান (theoritical knowledge) আহরণ এবং তার সাহায্যে জীবনভূমি কর্ষণ বা ভবিষ্যৎ আশ্রম জীবনের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করার জন্য প্রাথমিক জীবন কারবারে লাভবান হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ, গো বা গুরুবাক্য পালন প্রভৃতি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূক্ষ্ম কর্ম সকল বৈশ্যের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে কৃষিকার্যের জন্য ভূমিকর্ষণ, ব্যবসাবাণিজ্য রূপ কারবার, গবাদিপশুপালন প্রভৃতি স্থূল সামাজিক

কর্মসকল বৈশ্যের কর্ম রূপে গৃহীত হ'ল। যেখানে একমাত্র জৈবিক কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য আপন দেহের সেবা, প্রাক্-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের এই সূক্ষ্মকর্ম শূদ্রের কর্মরূপে নির্ধারিত ছিল, সেখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবামূলক স্থূল সামাজিক কর্ম শূদ্রের কর্ম রূপে গৃহীত হ'ল।

বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বের সূক্ষ্ম অর্থের স্থানে স্থূল অর্থ এসে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আজকের দিনে, এই উন্নত, আধুনিক, বৈজ্ঞানিক চিন্তা লালিত মনুষ্য সমাজেও কোন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিকল্পনা রচনার সময় প্রকল্প-রচয়িতারা যা চান, রূপায়নের পর ঠিক তা হয় না। গড়তে চাওয়া হয় শিব, নানা কারণে যা হয় তাকে শব ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কাজেই অন্ত্য-বৈদিকযুগের সূক্ষ্ম সাধন কর্মগত জাতিভেদ অচিরে স্থূল সামাজিক কর্মগত জাতিভেদে রূপান্তরিত হ'ল—এটাই একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

উদ্ভব মুহূর্তের সূক্ষ্ম সাধন কর্মগত জাতিভেদকে প্রথম স্তর হিসেবে আখ্যায়িত করলে পরবর্তীকালের স্থূল সামাজিক কর্মগত জাতিভেদকে দ্বিতীয় স্তর বলতে হয়। দ্বিতীয় স্তরের এই সামাজিক কর্মগত জাতি-ভেদের অস্তিত্ব পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে, তবে পণ্ডিতগণ এই স্তরটাকে প্রথম স্তর হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক স্বীকৃত বলে এই স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবু দুটি শাস্ত্রবাক্য নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

মহাভারতের এক জায়গায় বলা হয়েছে—

"একবর্ণমিদং পূর্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্মক্রিয়া বিশেষণ চাতুর্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

অর্থাৎ, হে যুধিষ্ঠির! পূর্বে এই বিশ্বে একটি মাত্র বর্ণ বর্তমান ছিল। কর্মক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে চারবর্ণের সৃষ্টি।

এই বাক্যের 'কর্ম ক্রিয়া'কে সামাজিক পেশা হিসেবে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত করা যায়, সমাজে কর্ম বিভাগের ফলেই বর্ণ বিভাগের সৃষ্টি

হয়েছে। আবার এই 'কর্মক্রিয়া'কে চতুরাশ্রমের সাধন মার্গের ক্রিয়া-কলাপ রূপে ব্যাখ্যা করেও বলা চলে, চতুরাশ্রমকে অবলম্বন করেই জাতিভেদের উদ্ভব হয়েছে।

'শুক্রনীতি'র এক স্থানে বলা হয়েছে,—

"ন জাত্যা ব্রাহ্মণশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবচ।
ন শূদ্রো ন চ বৈ ম্লেচ্ছো ভেদতি গুণকর্মভিঃ॥"

অর্থাৎ, গুণ ও কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ নির্ণীত হয়—জন্মের দ্বারা নয়।

এই বাক্যটি শুনে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই বাক্য যখন রচিত হয় তখন সমাজে জন্মগত জাতিভেদের ধারণা বদ্ধমূল হতে চলেছে তবে গুণকর্মগত জাতিভেদের ধারণাও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। এই গুণকর্মগত জাতিভেদের কর্ম ও গুণকে একদিকে যেমন সামাজিক কর্ম ও ঐ সামাজিক কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ রূপে ব্যাখ্যা করা যায়, অপরদিকে তেমনি চতুরাশ্রমের সাধনমার্গের ক্রিয়াকলাপ ও ঐ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অর্জিত গুণরূপেও ব্যাখ্যা করা চলে।

জাতিভেদের এই দ্বিতীয় স্তরের আভাস মহাভারতেও পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্বের ৭৫তম অধ্যায়ে 'সাধারণ সৃষ্টি বর্ণন' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—মুনি বা ব্রাহ্মণ কশ্যপের পুত্র বিবস্বান ; বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু ; বৈবস্বত মনু থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি। সামাজিক কর্মভেদে একই উৎস থেকে জাত হওয়া সত্বেও কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য, আবার কেউ শূদ্র। এটাই আরো স্পষ্টভাবে আভাসিত হয়েছে পরবর্তী বর্ণনার মধ্যে, যেখানে বলা হয়েছে—নহুষের পুত্র যতি, যযাতি ইত্যাদি। যতি যোগবলে মুনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হলেন এবং যযাতি ক্ষত্রিয় হয়ে বিক্রম প্রভাবে সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। যতি সামাজিক কর্ম জ্ঞানসাধনা বা যোগসাধনায় ব্রতী হয়ে হলেন ব্রাহ্মণ আর যযাতি সামাজিক কর্ম রাজ্যশাসন প্রজাপালনে লিপ্ত হয়ে হলেন ক্ষত্রিয়।

তৃতীয় স্তরে জাতিভেদ একরকম বংশগত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের পুত্র শিশুকাল থেকে দেখেশুনে পিতার কর্মসকল সহজে আয়ত্ত করতেন এবং পরবর্তী কালে তিনি সেই সামাজিক কর্মে রত থাকতেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেতর পিতার পুত্র অনুরূপভাবে পিতার অবলম্বিত কর্মের উপযোগী রূপে গড়ে উঠে সেই সামাজিক কর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। এইভাবে জাতিভেদ কিছুটা বংশগত হয়ে যায়। জাতিভেদের এই স্তরের আভাস মহাভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মহাভারতে— ব্রাহ্মণের পুত্রকে ব্রাহ্মণের কর্মে নিযুক্ত থেকে ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হতে দেখা যায়; পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির পুত্রকে দেখা যায় পিতার কর্মে নিযুক্ত থেকে পিতৃবর্ণে পরিচিত হতে। কিন্তু এই স্তরেও জাতিভেদ জন্মগত হয়নি। কারণ, জন্ম যেখানেই হোক না কেন, কোন ব্যক্তি যে সামাজিক কর্মে রত থেকেছেন সেই কর্ম অনুসারেই তাঁর জাতি নিরূপিত হয়েছে। পরাশর মুনির ঔরসে ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত সন্তান ব্যাসদেব মুনি বা ব্রাহ্মণের কর্মে নিযুক্ত থাকায় মুনি বা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েছেন অথচ ব্যাসদেবের ঔরসজাত সন্তানদ্বয় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয় কর্মে রত থাকায় ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত হয়েছেন।

চতুর্থ স্তরে জাতিভেদ জন্মগত হয়ে যায়। তবে সামাজিক কর্মগত জাতিভেদের ধারণাও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ, শরদ্বান গৌতমের পুত্র কৃপ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখিত হলেও ক্ষত্রিয় কর্মে রত থাকায় ক্ষত্রিয়বংশ বর্ণনের মধ্যে এঁদের বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া শূদ্রাদাসীর গর্ভে জাত ব্যাসদেবের পুত্র বিদুর, সূতপুত্র বলে পরিচিত কর্ণ, ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীর গর্ভে ক্ষত্রিয় যযাতির পুত্র যদু থেকে উৎপন্ন যদুবংশে জাত কৃষ্ণ প্রভৃতিও ক্ষত্রিয়ের কর্মে রত থাকায় ক্ষত্রিয়বংশ বর্ণনের মধ্যে বর্ণিত হয়েছেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জাত হয়ে প্রথমে ক্ষত্রিয়কর্মে রত ছিলেন; পরে ব্রাহ্মণকর্মে রত হয়ে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। অবশ্য বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ স্বীকৃতি লাভের

জন্য অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা চলে,—বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয়কর্মে রত থাকার জন্য ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন ; তার পরে ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিচিত হতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল।

পঞ্চম স্তরে এসে জাতিভেদ একান্তভাবে জন্মগত হয়ে পড়ে। এই স্তরে জন্মভিত্তিক প্রতিটি জাতির জন্য পৃথক পৃথক সামাজিক কর্ম নির্দিষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, আর এই ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কর্ম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যোগসাধনা, গুরুগিরি ইত্যাদি ; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্রিয়, আর এই ক্ষত্রিয়ের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কর্ম রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি ; বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য আর এই বৈশ্যের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কর্ম ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিকার্য, গবাদি পশুপালন প্রভৃতি এবং শূদ্রের ঔরসে শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান শূদ্র, আর এই শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কর্ম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সেবামূলক কর্ম। এই স্তরের জাতিভেদের কথাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিভিন্ন সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে।

এবারে যে চতুরাশ্রমকে ভিত্তি করে জাতিভেদের উদ্ভব, উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরগুলোতে সেই চতুরাশ্রমের সঙ্গে জাতিভেদের সম্পর্ক কেমন হ'ল তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরে জাতিভেদ সামাজিক কর্মগত হয়ে পড়ায় জাতিভেদের সঙ্গে চতুরাশ্রমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। চতুরাশ্রমের সাধনগত জাতিভেদ আশ্রম নিরপেক্ষ সমাজগত জাতিভেদে রূপান্তরিত হওয়ায় আশ্রমগত সাধনার ক্রমোন্নতিতে শূদ্র থেকে বৈশ্য, বৈশ্য থেকে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় থেকে সাধারণ ব্রাহ্মণ এবং সাধারণ ব্রাহ্মণ থেকে যতি বা যোগী ব্রাহ্মণ রূপান্তর অর্থহীন হয়ে পড়ে।

জাতিভেদের প্রথম স্তরে—বৈশ্য ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন

সাধক অর্থাৎ তিনি ছিলেন কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন সাধনায় ব্রতী ; ক্ষত্রিয় ছিলেন গার্হস্থ্যাশ্রমের জীবন সাধক অর্থাৎ তিনি ছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন সাধনা সমাপ্ত করার পর গার্হস্থ্য-আশ্রমের জীবন সাধনায় রত ; সাধারণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বানপ্রস্থাশ্রমের জীবন সাধক অর্থাৎ তিনি ছিলেন ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রমের জীবন সাধনা সমাপ্ত করার পর বানপ্রস্থাশ্রমের জীবন সাধনায় নিয়োজিত, আর যতি বা যোগী ব্রাহ্মণ ছিলেন যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবন সাধক অর্থাৎ তিনি ছিলেন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমের জীবন সাধনা সমাপ্ত করার পর শেষ আশ্রম যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবন সাধনায় বিভোর।

সুতরাং প্রথম স্তর বা চতুরাশ্রমের সাধনগত জাতিভেদ অনুযায়ী বৈশ্যের ছিল একটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য ; ক্ষত্রিয়ের ছিল দুটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য ; সাধারণ ব্রাহ্মণের ছিল তিনটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এবং যতি বা যোগী ব্রাহ্মণের ছিল চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস।

দ্বিতীয় স্তরে জাতিভেদ সামাজিক কর্মগত হয়ে পড়ায় কৃষিকার্য, ব্যবসাবাণিজ্য, গবাদি-পশুপালন প্রভৃতি সামাজিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা বৈশ্য নামে অভিহিত হলেন। এঁরাও সংসারধর্ম পালন করতেন। তাই এই স্তরে এসে গার্হস্থ্য বৈশ্যদেরও আশ্রমে পরিণত হ'ল। বৈশ্যদের সাথে ক্ষত্রিয়দের এবং ক্ষত্রিয়দের সাথে ব্রাহ্মণদের পার্থক্য সূচিত করার জন্য বানপ্রস্থ ক্ষত্রিয়দের এবং যতি বা সন্ন্যাস সাধারণ ব্রাহ্মণদের আশ্রমের সাথে যুক্ত হ'ল। কাজেই এই স্তরে বৈশ্যদের হ'ল দুটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য ; ক্ষত্রিয়দের হ'ল তিনটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এবং সকল প্রকার ব্রাহ্মণের হ'ল চারটি আশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস।

জাতিভেদের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ সামাজিক কর্মগত জাতিভেদে

শূদ্রদের আশ্রমধর্ম থেকে বঞ্চিত রাখা হ'ল[১]। বৈশ্যদের প্রথম দুটি আশ্রমের অধিকার, ক্ষত্রিয়দের প্রথম তিনটি আশ্রমের অধিকার এবং ব্রাহ্মণদের চারটি আশ্রমের অধিকারই দেওয়া হ'ল।

মহাভারতের এক জায়গায় জাতিভেদের এই দ্বিতীয় স্তরের আশ্রম-ধর্মের আভাস পাওয়া যায়। বনপর্বের ১৩৪তম অধ্যায়ে জনক রাজার সভাপণ্ডিত বন্দীর প্রশ্নের উত্তরে অষ্টাবক্র জানাচ্ছেন,—"ব্রাহ্মণগণের আশ্রম চতুর্বিধ।" এখানে ব্রাহ্মণদের চারটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি শাস্ত্রের সংহিতাগুলোতে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেরই চারটি আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। স্মৃতি শাস্ত্রের ঐ আশ্রমধর্মের কথা নিশ্চয় অষ্টাবক্র বলেন নি। কারণ, তাহলে তিনি শুধু 'ব্রাহ্মণগণের' না বলে বলতেন বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আশ্রম চতুর্বিধ। আবার চরম ও পরম তত্ত্বজ্ঞানের চর্চা হয় যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে। মহাভারতের বনপর্বের ১৫০তম অধ্যায়ে ভীমের প্রতি হনুমানের বিবিধ উপদেশের মধ্যে এক জায়গায় বলা হয়েছে,—"তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম; উহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই।" এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ছিল। এছাড়া আমরা জানি একমাত্র যতি বা সন্ন্যাসীকে জীবনধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হ'ত। মহাভারতের বনপর্বের ৩৩তম অধ্যায়ে একস্থানে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন,—"ভিক্ষাবৃত্তি কেবল ব্রাহ্মণগণেরই নির্ধারিত আছে।" এ থেকেও সিদ্ধান্তে আসতে হয়, যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় স্তর বা সামাজিক কর্মগত জাতিভেদ ও চতুর্থস্তর বা জন্মগত জাতিভেদের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে তৃতীয়স্তর বা কিছুটা বংশগত জাতিভেদ। কাজেই এই তৃতীয়স্তরেও, দ্বিতীয়স্তরের মতই, ব্রাহ্মণের

---

১. শূদ্ররাও বিয়েথা করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপন করতেন। কিন্তু এটাকে গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হ'ত না।

জন্য চারটি আশ্রম, ক্ষত্রিয়ের জন্য প্রথম তিনটি আশ্রম এবং বৈশ্যের জন্য প্রথম দুটি আশ্রম নির্ধারিত ছিল।

চতুর্থস্তরে জাতিভেদ জন্মগত হয়ে পড়ায় এবং সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশ্রমধর্মের গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। এই স্তরে প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রমই চারটি আশ্রমের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাদি অধ্যয়নের পর নিজ নিজ পেষাগত কলা কৌশল আয়ত্ত করে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ পেষাগত বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সংসারযাত্রা নির্বাহ করাটাকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করেন। অনেকের কাছেই বানপ্রস্থ এবং যতি বা সন্ন্যাস এই আশ্রমদ্বয়ে প্রবেশ করা অনাবশ্যক বলে প্রতিভাত হয়। তাই সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আশ্রমধর্ম প্রায় একই রকম হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে যেমন বেশীরভাগ ক্ষত্রিয়ই বানপ্রস্থাশ্রমে এবং বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশে অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন, অপরদিকে তেমনি বৈশ্যদের কেউ কেউ বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে এবং ক্ষত্রিয়দের কেউ কেউ যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের আগ্রহ অনুভব করতে থাকেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রত্যেকের চারটি আশ্রমের অধিকার স্বীকৃত হবার পটভূমি তৈরী হয়।

পঞ্চম স্তরে জাতিভেদ যখন একান্ত জন্মগত হয়ে যায়, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলের জন্যই চারটি আশ্রমের অধিকার স্বীকৃত হয়। তবে এই স্তরে একমাত্র গার্হস্থ্য আশ্রমই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়নানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। উপনয়নানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মচর্যাশ্রম ধর্ম পালন শেষ হতে থাকে ; বিদ্যাশিক্ষা ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা আলাদাভাবে চলতে থাকে। উপনয়নানুষ্ঠানের পর শিক্ষালাভ করার রীতি পরিত্যক্ত হওয়ায় কৈশোর থেকে যৌবন প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত শিক্ষার্জনের সময় নির্ধারিত হয় এবং

একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে উপনয়ন দেওয়াব রীতি প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মণপুত্রেব যোল বছবের মধ্যে, ক্ষত্রিয়পুত্রেব বাইশ বছরের মধ্যে, এবং বৈশ্যপুত্রের চব্বিশ বছবের মধ্যে উপনয়ন দিতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এই সময়সীমার মধ্যে কারো উপনয়ন না হলে পরবর্তী সময় প্রায়শ্চিত্তেব পব তাঁর উপনয়ন হবাব বিধানও পাশাপাশি বাখা হয়।

এই স্তরে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে উপনয়নেব পর বিদ্যাশিক্ষা শুরু হবাব রীতি বর্জিত হওয়ায় শূদ্রদেবও বিদ্যাশিক্ষাব অধিকার স্বীকৃত হয়। শূদ্রদের বিদ্যাশিক্ষার অধিকারেব আভাস মহাভারতে আছে। মহাভাবতেব সভাপর্বের ৩২তম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কবাব জন্য সহদেবেব প্রতি যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাব মধ্যে "সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান শূদ্রদিগকে সমভিব্যাহারে আনয়ন" করার কথা আছে।

এই স্তরে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই বিদ্যাশিক্ষার অধিকারী হন; কেবল উপনয়নে ও অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বর্তমান থাকে। শূদ্র পুত্র উপনয়নে অনধিকারী হন; বৈশ্য-পুত্র চব্বিশ বছরের মধ্যে, ক্ষত্রিয় পুত্র বাইশ বছরের মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ পুত্র যোল বছরের মধ্যে উপনয়নে অধিকারী হন। মৃত্যুজনিত অশৌচের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ দশ রাত অশৌচ পালন করে এগারো দিনে, ক্ষত্রিয় বারো রাত অশৌচ পালন করে তেবো দিনে, বৈশ্য চৌদ্দ রাত অশৌচ পালন করে পনোরো দিনে এবং শূদ্র উনত্রিশ রাত অশৌচ পালন করে ত্রিশ দিনে শ্রাদ্ধ করবে বলে ঘোষণা করা হয়।

[ক্রমশঃ]

৺শ্যামাপদ ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতায়
তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

সন্তান বাৎসল্য ও পিতৃভক্তি

সুখময় দেবনাথ

[প্রয়াত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের স্মরণে ১৩৮৮এর আষাঢ় মাসের 'শৈবভারতী' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কথিকাটি লিখিত হইল।]

সন্তান বলিতে আমরা বুঝি সম-তান। সন্তানের মধ্যে পুত্র এবং কন্যা উভয়েই একত্রে গ্রথিত। এই পৃথিবীতে সন্তানের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। পিতা-মাতা সকল সময়ই সন্তান কামনা করেন। কারণ তাদের আশা তাদের মত তাদের সন্তানও যাতে শৈশব হইতে সুগঠনে, সুবিদ্যা ও বুদ্ধিতে পারদর্শী হইতে পারে।

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে—

"অভ্যাস ব্যবহার যেমনতর,
সন্তানও পাবি তেমনতর।"

বাৎসল্য বলিতে বুঝি বৎসকে পালন করার যে পদ্ধতি। অর্থাৎ পিতা মাতার অভ্যাস এবং ব্যবহার যেমন হয় সন্তানের স্বভাবও সেইভাবে গড়িয়া ওঠে। তারা কামনা করেন তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করিলে একদিন তারাই পিতামাতার যষ্ঠিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। জনশ্রুতি আছে—

"পিতায় শ্রদ্ধা মায়ের টান
সেই ছেলেই হয় সাত্রপ্রান।"

অর্থাৎ সন্তানের যদি সর্বদা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও মায়ের প্রতি টান বা ভালবাসা থাকে তবে সেই সন্তান জীবনে উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে পারিবে। যে সন্তান সর্বদা পিতা মাতাকে লক্ষ্য করিয়া চলিবে এবং পিতা মাতার আদেশ মান্য করিবে এবং তাহাকে কার্যে পরিণত করিবে

সে জীবনে কখনই বিফল হইবে না। এমনতর সন্তানের গুরুত্ব প্রয়োজনাতীত। এছাড়া আমরা দেখিয়া থাকি সংসারে পিতা-মাতা সর্বদা কলহরত থাকিলে পুত্রের বা সন্তানের জীবনও কলহপ্রিয় হইয়া ওঠে। এইরকম হওয়া নিশ্চয়ই অনুচিৎ। সর্বদাই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে টান বা ভালবাসা থাকিলেই সন্তানের জীবনও সেইরূপ কল্পনা করা যায়। নতুবা নহে।

জনশ্রুতি আছে—

"স্বামীর প্রতি টান যেমনি
ছেলেও জীবন পায় তেমনি।"

কেননা কোন স্ত্রী যদি প্রত্যহ প্রত্যুষে স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ ভক্তি নিবেদন করে তবে সন্তানদেরও পিতামাতার প্রতি ভক্তি জন্মে। দেখা যায় সন্তানেরা বেশীরভাগ সময়ই মায়ের অনুগামী হয় ফলে মা যাহা করিবে সন্তানরাও তাহাই করিতে চাহিবে। অর্থাৎ সন্তান হল পিতামাতার copy, son is the shade of their parents. ফলে automatic সন্তানরাও পিতামাতাকে প্রত্যহ প্রত্যূষে ভক্তি নিবেদন করিবে—শ্রদ্ধা করিবে এবং ভালবাসিবে। এইভাবে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিলেই সেই সন্তান সর্বদা সুপথগামী হইবে। সে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সফল ও কৃতির অধিকারী হইবে।

এই রকম জনশ্রুতি আছে—

"পিতৃভক্তি অটুট যত
সেই ছেলে হয় কৃতিই তত।"

পিতামাতার খারাপ আচরণ সন্তানের উপর reflect হয়। তখন যেন তাদের আপনা থেকে পিতামাতা হইতে ভক্তি উঠিয়া যায়। সে কুপথগামী হইতে বাধ্য হয়। ফলে এই সংসার দুঃখময় হইয়া ওঠে।

সন্তানদের পিতামাতার প্রতি খারাপ আচরণে তারা জীবনে কোনদিন পিতা বা মাতার ভক্তি বা চরণধূলির কণা মাত্র লাভ করিতে পারে না। তখন দুঃখময় এই জীবনের প্রথম হইতেই পিতামাতার

মাধ্যমে সন্তানদের সুপথগামী হইবার চাবিকাঠি তৈরী হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অন্ধ বাৎসল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা মন্তব্য করা যাইতে পারে। অন্ধ বাৎসল্য বলিতে আমরা কি বুঝি? বৎসকে পালন করার পদ্ধতি যেখানে অন্ধ বা নাই। এই রকম খুব কচিৎ ক্ষেত্রেই হইতে পারে। এখানে অর্থাভাবের কোন গুরুত্ব নাই। কারণ পদ্ধতি শিখিতে বা জানিতে কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। পিতার কর্তব্য সর্বদা পুত্রকে সদ্‌কর্মে পরিচালিত করা। অতঃপর সন্তান বুঝিতে পারিলে পিতার প্রতি তাহার ভক্তি আসবে ও শ্রদ্ধা করবে। পিতা-মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাকে কার্যে পরিণত করিতে পারিলে পুত্রদের জীবন গৌরবময় হইয়া ওঠে। তারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সফল হইবে এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত হইতে মুক্তি পাইবে। এমনকি সন্তানেরা অপমৃত্যুর হাত হইতেও রেহাই পাইতে পারে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাতা-পিতার মানা ঠেলে যাওয়ার দরুণ সম্মুখে নানা প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন আমাদের পিতামাতার কথা স্মরণ হয়। ঘটনাচক্রে হঠাৎ বেহিসাবী হয়ে পড়লে অকালমৃত্যু আসিতে পারে। তখন পিতামাতার অবস্থা দুঃখজনক হইয়া ওঠে। বিশেষ করিয়া মাতার অবস্থা বেশী খারাপ হইতে দেখা যায় কারণ তিনি শৈশব হইতে তাকে কোলেপিঠে মানুষ করেন। সুতরাং মৃত্যু বা অকালমৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইয়া ভেঙে পড়া উচিত নয়।

কবির ভাষায়—

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে।

চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে॥

ঋষিগণ বলেন—"নিজের দুঃখে হাস, আর পরের দুঃখে কাঁদ।"

নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ কর, তবে কখনও কাউকে মর বলোনা। ইষ্ট নিষ্ঠাই শোক হইতে পরিত্রাণের উপায়। ভগবানের প্রতি একমন হয়ে সাধনা করিলে সকল দুঃখ, কষ্ট ও শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া

যায়। ভগবান সবাইকে বিশেষভাবে বলেছেন—"কামিনী অর্থাৎ স্ত্রী এবং কাঞ্চন অর্থাৎ ধনসম্পদ হইতে তফাৎ তফাৎ খুব তফাৎ থাক। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেলেন। আর এই মা—মাই কামিনী নয়কো। মার শেষে গী দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ। সাবধান মাকে মাগী ভেবে মোরো না। প্রত্যেকের মাই জগৎ জননী। প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ। এমনতর ভাবতে হয়।

পিতা সর্বদা সন্তানের ভালোটা চাহেন। অসৎপথে মরার চেয়ে সৎপথে মরাই ভাল। জনশ্রুতি আছে—"হেগে মরার চেয়ে হেঁটে মরাই ভাল।"

অর্থাৎ অসৎপথে জীবন যাপন করার চেয়ে সৎপথে জীবন যাপন করা ভাল। পিতামাতা জানেন যে সন্তানের দুঃখে কাতর হওয়া ভাল নহে। কারণ এই পৃথিবীতে আনন্দ আছে বলেই দুঃখ আছে, হাসি আছে বলে কান্না আছে, রাত্রি আছে বলে দিন আছে এবং জন্ম আছে বলে মৃত্যু আছে।

সন্তানদের প্রতি পিতামাতার ব্যবহারই তাদের পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি লাভের উপায়।

জনশ্রুতি আছে—"অসৎ-এ আসক্তি থেকে শোক ও দুঃখ আসে। অসৎ পরিহার কর, সৎ-এ আস্থাবান হও, ত্রাণ পাবে। সৎ চিন্তায় নিমজ্জিত থাক, সৎ কর্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দিক সৎ হয়ে সকল সময় তোমাকে সেবা করবেই করবে।"

প্রকৃত পিতৃভক্ত সন্তানের পিতার প্রতি টান বা ভালবাসা থাকবেই। প্রকৃতপক্ষে পিতৃভক্ত হতে হলে বিনীত অহংযুক্ত জ্ঞানী হবার প্রয়োজন। ভক্তই প্রকৃত জ্ঞানী। ভক্তিবিহীন জ্ঞান বাচক জ্ঞান মাত্র। ভক্তি ব্যতীত সাধনায় সফল হওয়ার কোন উপায় নেই। সাধনা বলতে আমরা এখন আমাদের মহত্তম সাধনা পড়াশুনাকেই বুঝি। ভক্তিই সিদ্ধি এনে দিতে পারে। ভক্তির মধ্যে কোন দুর্বলতা

নেই। প্রকৃত ভক্তের কতকগুলো লক্ষণ থাকবে। যেমন—ভক্তের চরিত্রে পাতলা অহংকারের চিহ্ন, বিশ্বাসের চিহ্ন, সৎ চিন্তার চিহ্ন, সদ্ব্যবহারের এবং উদারতা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু না কিছু থাকবেই, নতুবা ভক্তি আসতে পারে না।

জালভক্তি অর্থাৎ নকল ভক্তিযুক্ত মানুষ কাহারো নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। উপদেশ দিতে পারে। কিন্তু আসল ভক্তিযুক্ত মানুষ উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন না। ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালবাসে অর্থাৎ আমরা যদি করজোড়ে পিতাকে ভক্তি করি ও ভালবাসি তবে আমরা অন্যান্য সকলকে ভালবাসতে পারবো। সৎকর্মই হইল ভক্ত হবার উপায় অর্থাৎ ভক্তির অনুরক্তি সৎ-এ। ভক্তি আমাদিগকে সৎ-এর দিকে টানিয়া লইয়া যায়। পিতৃভক্ত সন্তানকে অবশ্যই আলোচনাগুলি পালন করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীব্রজেন্দ্র লাল নাথ [illegible]
(রেলওয়েগার্ড) রেলওয়ে
কোয়াটার নং ১০৬ বি (টি. টি.)
আজিমগঞ্জ।

ডঃ ননীগোপাল নাথ
৭/১২ গঃ হাউজিং এষ্টেট
সোদপুর,
২৪ পরগণা।

শ্রী জে. বি. নাথ
১৬৩, ডিনামার ডাঙ্গা
গড়ের ধার
গোন্দল পাড়া, চন্দনগর
জিলা হুগলী।

শ্রীগৌরাঙ্গ রঞ্জন শর্মা
অজন্তা ফার্নিচার্স
গোলাপট্টি,
পোঃ মালদহ
জিলা মালদহ।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[মহাতপস্বী সূত (সৌতি) নৈমিষারণ্যে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন মহর্ষি লোমহর্ষণের পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল উগ্রশ্রবা। তিনি ছিলেন মহাভারত, পুরাণসমূহ ও নানাবিধ ধর্মশাস্ত্রের কথক। বিভিন্ন অঞ্চলের ঋষিরা পবিত্র নৈমিষারণ্যের আশ্রমে সমবেত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলে সমকালীন তাপসশ্রেষ্ঠ সূত একের পর এক সব বিবৃত করেছেন। সম্প্রতি তাঁরা "**শ্রীশ্রীগুরুগীতা**" শ্রবণে ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে এর সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করেন। সমস্ত কিছু জানার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, গুরুতত্ত্ব না জানলে সব জানাই বৃথা হয়ে যায়। গুরুতত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি কোনও বিদ্যা বা শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই তাঁদের এই মহা জিজ্ঞাসা।

শ্রীশ্রীগুরুগীতা শৈবতন্ত্রলক্ষণাক্রান্ত, শিব ও পার্বতীর কথোপকথন-ছলে বর্ণিত। এর আদি বক্তা জগদ্‌গুরু যোগিশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব শঙ্কর এবং আদি শ্রোতা জগজ্জননী পরমেশ্বরী পার্বতী। সেইজন্য একে আগমতন্ত্রসাহিত্যের অন্তর্গতও বলা হয়।]

ঋষয় উচুঃ।

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ।
তৎপ্রসাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মে সূত ॥ ১ ॥

ঋষিগণ বললেন, হে সূত! বিদ্যা (আত্মবিদ্যা) গুহ্য থেকে গুহ্যতর অর্থাৎ অতীব গোপনীয়, বিশেষভাবে গুরুগীতা (কারণ গুরুগীতা পাঠে ও শ্রবণে আত্মবিদ্যা জাগ্রত হয়)। আপনার প্রসাদেই (আপনার নিকট থেকেই) তা শ্রবণ করা কর্তব্য, আপনি আমাদিগকে সেই সমস্ত বলুন।

সূত উবাচ।

কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধনতৎপরা* ।
প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ২ ॥

পাঠান্তর : * ভক্তিসাধকনায়কম্।

সূত বললেন, রমণীয় কৈলাসশিখরে (পতিসহ আসীনা) ভক্তি ও তার সাধনে তৎপরা দেবী পার্বতী (দেবাদিদেব) শঙ্করকে প্রণাম করে ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নমো নমো দেবদেব* পরাৎপর জগদ্গুরো।
সদাশিব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদেহি মে ॥ ৩ ॥

পাঠান্তর : * নমোঽস্তু দেবদেবেশ।

শ্রীপার্বতী বললেন, হে দেবতাগণেরও দেবতা! হে পরাৎপর (শ্রেষ্ঠ থেকেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ)! হে জগতের গুরু! হে সদাশিব (সর্বদা মঙ্গলময়)! হে মহাদেব! আপনাকে বারংবার প্রণাম করি, আমাকে গুরুগীতা প্রদান করুন (বলুন)।

কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ত্বং* কৃপাং কুরু মে ব্রহ্মন্ নমামি চরণস্তব ॥ ৪ ॥

পাঠান্তর : * তাং।

হে স্বামিন্! কোন মার্গ অবলম্বন (কোন সাধনপদ্ধতি অনুশীলন) করলে দেহী (জীব) ব্রহ্মময় হয়, আপনি কৃপা করে তা আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মন্! আপনার চরণে প্রণাম।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

যস্য দেবি* পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ** ॥ ৫ ॥

পাঠান্তর : * দেবে, ** প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

শ্রীশঙ্কর বললেন, হে দেবি! দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও যাঁর সেইরূপ পরা ভক্তি (পরম ভক্তি) আছে, মহাত্মাগণ কর্তৃক (পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক) এই সকল কথা তাঁর নিকটেই কথিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

যদঙ্ঘ্রিকমলদ্বন্দ্বং দুঃখতাপনিবারকম্।
তারকং বিপদাং বন্দে শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥ ৬॥

যাঁর শ্রীচরণকমলযুগল দুঃখ ও তাপের নিবারক, বিপদ থেকে ত্রাণকারক, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি ও প্রণাম করি।

মম রূপাসি দেবি ত্বং ত্বৎপ্রীত্যর্থং বদাম্যহম্।
লোকোপকারকঃ প্রশ্নো ন কেনাপি কৃতঃ পুরা॥ ৭॥

হে দেবি! তুমি আমারই স্বরূপা, তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি বলছি। লোকহিতকর এই প্রকার প্রশ্ন পূর্বে আর কেহই করেন নি।

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু তচ্ছৃণুষ্ব বদাম্যহম্।
কিঞ্চিদ্ গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥ ৮॥

ত্রিভুবনে দুর্লভ, তা (গুরুগীতা) আমি তোমাকে বলছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! গুরু ব্যতীত অন্য কিছুই সত্য নয়, তা যথার্থ জেনো।

তল্লাভার্থং প্রযত্নং হি কর্তব্যঞ্চ মনীষিভিঃ।
গূঢ়া বিদ্যা জগন্মায়া দেহমজ্ঞানসম্ভবম্॥ ৯॥

বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) অত্যন্ত গূঢ়া, জগৎ মায়া (জগৎ মায়াপ্রভাবে বর্তমানের ন্যায় প্রতিভাত), দেহ অজ্ঞান থেকে সম্ভূত—এই সব বুঝে মনীষিগণের সেই (সদ্গুরুজ্ঞান) লাভের জন্য যত্ন নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

তদহং স্বপ্রকাশেন গুরুশব্দেন কথ্যতে।
দেহী ব্রহ্ম ভবেদ্ যস্মাৎ তৎ কৃপার্থং বদাম্যহম্॥ ১০॥

স্বয়ং প্রকাশমান গুরু শব্দের দ্বারা "আমি সেই" অর্থাৎ "সোঽহং" এই অভেদজ্ঞান কথিত হয়। যে জ্ঞান লাভ করলে দেহী (জীব) ব্রহ্মময় হয়, তা কৃপাবশত আমি তোমাকে বলছি।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
যন্ত্রমন্ত্রাদিবিদ্যানাং* মৃত্যুরুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ১১ ॥
শৈবশাক্তাগমাদীনি অন্যদ্বহুমতানি চ।
অপভ্রংশানি শাস্ত্রাণি** জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্ ॥ ১২ ॥

পাঠান্তর ঃ * বিজ্ঞানং, ** প্রণশ্যন্তি সমস্তানি।

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ ; যন্ত্র ও মন্ত্র প্রভৃতি বিদ্যা ; মারণ, উচাটন প্রভৃতি আভিচারিকী ক্রিয়া ; শৈব ও শাক্তগণের আগম প্রভৃতি তন্ত্রসমূহ এবং অন্যান্য বহুপ্রকার মত—এই সমস্তই (গুরুনিষ্ঠা ব্যতীত) ভ্রান্তচিত্ত জীবগণের নিকট বিকৃতার্থ লাভ করে অর্থাৎ নিষ্ফল হয়।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি কৃত্বা বৈ গুরুকাম্যয়া।
স্বয়ং লোকগুরুঃ সাক্ষাজ্জায়তে বেদতত্ত্ববিৎ ॥ ১৩ ॥

যিনি গুরুদেবের প্রীতিকামনায় বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ, ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করেন, তিনিই বেদতত্ত্ববিদ্, তিনিই স্বয়ং সাক্ষাৎ লোকগুরু হয়ে থাকেন।

যজ্ঞব্রততপোদানজপতীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

গুরুতত্ত্ব না জেনে যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান, জপ, তীর্থপর্যটন প্রভৃতি করলে তা নিষ্ফল হয়, এতে কোন সংশয় নেই।

সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহানাং* ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৫ ॥

পাঠান্তর ঃ * সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য।

শ্রীগুরুর পদসেবা করে জীব সর্বপাপ বিমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) হয় ও সর্বতীর্থ অবগাহনের (স্নানের) নিশ্চিত ফল প্রাপ্ত হয়।

গুরুপাদোদকং* সম্যক্ সংসারার্ণবতারণম্।
অজ্ঞানমূলহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণম্ ॥ ১৬ ॥

পাঠান্তর ঃ * গুরোঃ পাদোদকম্।

গুরুদেবের পাদোদক (শ্রীচরণামৃত) সম্যগ্‌ভাবে সংসার-সাগর থেকে ত্রাণ করে, অজ্ঞানের মূল কারণ হরণ করে এবং জন্ম ও কর্ম নিবারণ করে অর্থাৎ পুনর্জন্ম রোধ করে।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ।
গুরুবুদ্ধ্যাত্মনো নান্যৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ১৭॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য গুরুদেবের পাদোদক পান করবে। গুরুবুদ্ধি (জ্ঞান) ভিন্ন আত্মার (দেহীর) অন্য উপায় নেই। আমি সত্য বলছি।

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ॥ ১৮॥

গুরুদেবের পাদোদক পান করবে, গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ভোজন করবে, সর্বদা গুরুমূর্তি ধ্যান করবে এবং সর্বদা গুরুস্তোত্র জপ করবে।

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকম্।
গুরুর্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাত্তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্॥ ১৯॥

গুরুদেবের বাসস্থানই কাশীক্ষেত্র, তাঁর শ্রীচরণামৃতই গঙ্গা, গুরুদেবই সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তিনিই নিশ্চিত তারকব্রহ্ম।

গুরুপাদাম্বুজং স্মৃত্বা জলং শিরসি দাপয়েৎ।
শিরঃ পদাঙ্কিতং কৃত্বা গয়াস্থ চাক্ষয়ো বটঃ॥ ২০॥

গুরুদেবের চরণকমল স্মরণ করে মস্তকে জল সিঞ্চন করবে এবং শিরে তাঁর শ্রীপাদচিহ্ন অঙ্কিত করে গয়াতে অক্ষয় বট সদৃশ (চিরস্থায়ী) হবে।

তীর্থরাজঃ প্রয়াগোঽসৌ গুরুমূর্ত্ত্যৈ নমো নমঃ।
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ॥ ২১॥

গুরুদেবই তীর্থরাজ প্রয়াগ। গুরুদেবের মূর্তিকে বারংবার প্রণাম। নিত্য গুরুদেবের মূর্তিকে স্মরণ করবে এবং সর্বদা গুরুদেবের নাম জপ করবে।

গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ।
গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎপ্রসাদতঃ॥ ২২॥

গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করবে এবং গুরুদেব ব্যতীত অন্য কারো চিন্তা করবে না। গুরুদেবের বক্ত্রে (বদনে) অবস্থিত ব্রহ্ম তাঁর প্রসাদেই লাভ করা যায়।

গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং যথাবৈ বিনিয়োজিতম্*।
স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনীম্॥ ২৩॥
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ।
গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যানুলভ্যতে॥ ২৪॥

পাঠান্তর : * যথা স্বামিনি যোষিতঃ।

যেমন ভাবে বিনিয়োগ (প্রযুক্ত) করা হয়েছে, তেমনি সর্বদা গুরুদেবের মূর্তি ধ্যান করবে। স্বীয় আশ্রমোক্ত ও স্বজাতিবিহিত (বর্ণোচিত) কর্ম, পুষ্টিবর্ধিনী স্বকীর্তি এবং অন্যান্য সকল বিষয় পরিত্যাগ করে গুরুদেব ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করবে না। গুরুদেবের বদনে অবস্থিতা বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) গুরুভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু।
গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম গুরুভক্ত্যা চ লভ্যতে॥ ২৫॥

সেইজন্য পরম যত্নসহকারে (সকলপ্রকার যত্নের দ্বারা) গুরুদেবের আরাধনা কর। গুরুদেবের বদনে অবস্থিত ব্রহ্ম গুরুভক্তির দ্বারাই লভ্য।

ত্রৈলোক্যস্ফুটবক্তারো দেবাদ্যসুরপন্নগাঃ।
ধ্রুবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥ ২৬॥

দেবতাদি, অসুর ও পন্নগগণ ত্রিলোকে সিদ্ধবাক্। তাঁদের সকলের মধ্যেও গুরুতত্ত্বের অধিক তত্ত্ব নেই, তা নিশ্চিত।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞাননাশকং* ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥ ২৭॥

পাঠান্তর : * অজ্ঞানধ্বংসকং।

"গুরু" শব্দের 'গু'-কারের অর্থ অন্ধকার এবং 'রু'-কার (সেই অন্ধকারনাশক) তেজরূপে কথিত। অতএব গুরুদেবই অজ্ঞাননাশক ব্রহ্ম, তাতে সংশয় নেই।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ ॥ ২৮ ॥

প্রথম বর্ণ 'গু'-কার মায়াদি গুণভাসক ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম এবং দ্বিতীয় বর্ণ 'রু'-কার মায়ারূপ ভ্রান্তিবিমোচক ব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম।

গুকার*শ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকার**স্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

পাঠান্তর ঃ * গুশব্দ, ** স্যাদ্রুশব্দ।

'গু'-কারের অর্থ অন্ধকার, 'রু'-কারের অর্থ তার নিরোধক (নিবারক); অন্ধকার নিরোধ বা নিবারণ করেন বলেই "গুরু" শব্দ কথিত হয়।

এবং গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
হাহাহূহুগণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ পূজ্যতে ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার শ্রীগুরুপদ শ্রেষ্ঠ, দেবতাদেরও দুর্লভ। হাহা হূহুগণ এবং গন্ধর্ব প্রভৃতি কর্তৃক তা পূজিত হয়ে থাকে।

[ক্রমশঃ

ভ্রম-সংশোধন

১৩৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ৬২ পৃষ্ঠায় "চিঠিপত্র"-এর শেষ লাইনে—Bone Surgery-তে Specialist করেছে পাচ/ছয় বছর আগে……এর স্থলে Bone Surgery-তে Specialise করেছে পাচ/ছয় বছর আগে…… এইরূপ হবে।

মাইথনে সাতাশ ঘণ্টা

ধীরেন দেবনাথ এম. এস-সি., বি. এড্.

২৮শে অক্টোবর ভোর সাতটায় ব্যাণ্ডেল জংশন থেকে বিহারের ধানবাদগামী 'ব্লাকডায়মণ্ড' মেইল ট্রেনে চড়ে' বেলা দশটা নাগাদ বরাকর ষ্টেশনে পৌঁছলাম। বরাকরের পরের ষ্টেশন কুমারডুবিতে নেমে রিক্সা বা ট্যাক্সি যোগে যদিও মাইথনে পৌঁছান যেত তবুও আমি তা' না করে' কল্যাণেশ্বরের 'জাগ্রত-কালী' দর্শনের নিমিত্ত ট্যাক্সি করে' কল্যাণেশ্বরে গিয়ে, সেখান থেকে বাসযোগে মাইথনে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর একটা।

যে বন্ধুটির কাছে আমি গিয়েছিলাম সে মাইথন হাসপাতালের একজন 'কম্পাউণ্ডার', তাকে হাসপাতালেই পেয়ে গেলাম এবং তাকে পেয়ে আমি যেমন আনন্দিত হ'লাম সেও আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হ'ল। 'ডিউটী' (সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দু'টা) শেষ করে আমাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। বন্ধুর কাছে জানতে পারলাম তাদের মেসের বাবুর্চিটি 'ভাই ফোঁটা' নিতে বাড়ী গেছে, তাই মেসের রান্না-বান্না বন্ধ। কাছাকাছি একটা হোটেল থেকে দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিলাম। তারপর চলে এলাম মেসে। ওখানে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার ওর সঙ্গে চলে গেলাম কালীপ্রতিমা দর্শনে (কালী পূজোর পরদিন)। এবার মাইথনে সবশুদ্ধ পাঁচ/ছ'খানা কালীপূজো হয়েছে। দু'তিন খানা প্রতিমা দর্শন করে, চললাম মাইথন বাঁধের দিকে। বরাকর নদীর উপর বাঁধটি দৈর্ঘ্যে প্রায় এক কিলোমিটার। বাঁধের উপর দিয়ে যানবাহন ও জনসাধারণের চলার জন্য আছে পীচঢালা চওড়া রাস্তা। বাঁধের এক পাশে আছে আনুমানিক তিন/চার মাইল দীর্ঘ একটি জলাশয় (Reservoir)। এই জলাশয়েই জল এসে জমা হয় এবং বাঁধের সাহায্যে ওই জলকে আটকে রাখা হয়। জলাশয়ের

মাঝে সবুজ গাছপালা আবৃত খুঁদে পাহাড়গুলি দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্রের মধ্যে ছোটছোট দ্বীপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধের উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিম্‌ঝিম করে এই বাঁধেরই তলদেশে আবার কয়েকটি প্রকাণ্ড দরজা (Water exhausting gate) রয়েছে। বর্ষাকালে যখন জলের চাপ খুব বেশী হয় বা বন্যা দেখা দেয় তখন জলের চাপ কমানোর জন্য ওই দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়। শুক্‌নো মরশুমে অবশ্য দরজাগুলি বন্ধই থাকে। রাত আটটা অবধি বাঁধে অবস্থান করে মেসে ফিরলাম। আমার গান গাওয়ার অভ্যাস থাকায় আমার বন্ধু ও অন্যান্য কয়েকজনের অনুরোধে ঘণ্টা খানেক গানগেয়ে শুনালাম। পরে পাশের মেসের বন্ধুদের ভোজনালয়ে নৈশ ভোজ শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা-পান পর্ব সমাপ্ত করে বন্ধুর সঙ্গে মাইথন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (Maithon Hydel Station) দেখতে চললাম। যথাসময়ে অফিস থেকে অনুমতি নিয়ে একজন কর্মীর সাথে ষ্টেশনের মধ্যে ঢুকলাম। একটি সুউচ্চ পাহাড়ের অভ্যন্তরে পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে এই ষ্টেশনটি। ভূমি থেকে এটি প্রায় ৩২০ ফুট নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। ষ্টেশনটিকে ভিতর থেকে একটি দ্বিতল দালান বলে মনে হবে। বাইরে থেকে পাথর কেটে সুড়ঙ্গ আকারে তৈরী করা হয়েছে সুদীর্ঘ একটি পথ এবং ওই পথটি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে মিশেছে গিয়ে ষ্টেশনটির সাথে। পথটির ভিতরের শেষ প্রান্তে দেখা গেল পর পর তিনটি কক্ষ এবং প্রত্যেকটিতে বসান একটি করে বিরাট আকারের 'ট্রান্সফরমার' (transformer)। এরপর ঢুকলাম ষ্টেশনের মধ্যে। আমাদের সাথে যে কর্মীটি ছিলেন তিনি 'গাইডের' মত সমস্ত ষ্টেশনটি ঘুরে দেখালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে ঢুকে একটু বাঁ-দিকে গিয়ে দেখলাম—তিনটি 'জেনারেটর' পরপর বসানো রয়েছে। জানতে পারলাম—প্রতিটির ওজন একশো কুড়ি টন। এই জেনারেট-গুলির প্রত্যেকটি আবার এক একটি 'টার্বাইন' বা চাকার সাথে

আনুমানিক পনের-ষোল ইঞ্চি ব্যাসের লৌহদণ্ডের সাহায্যে যুক্ত। বাঁধের যে পাশে জলাশয় সেই পাশে পাহাড়ের গায়ে ছত্রিশ ফুট দৈর্ঘ্য ও ত্রিশ ফুট প্রস্থযুক্ত একটি সুড়ঙ্গ কেটে টার্বাইনগুলো পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। এই সুড়ঙ্গপথে জল প্রবল বেগে এসে পতিত-হয় টার্বাইন-গুলির উপর এবং টার্বাইনগুলিকে প্রবল গতিতে ঘুরায়। টার্বাইনগুলির এই ঘূর্ণনের ফলেই জেনারেটরগুলিতে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে যায় এবং সেখান থেকে তারের সাহায্যে সরবরাহ করা হয় বাহিরে। প্রতিটি জেনারেটরের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কুড়ি মেগাওয়াট। এরপর লোহার সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নীচতলায় নেমে গেলাম। যে জল টার্বাইনগুলিকে ঘুরায় সেই জল তিনটি সুড়ঙ্গ পথে পাহাড়ের বাহিরে বেরিয়ে যায়। এই জল বর্ধমান ও বিহারের কিছু অঞ্চলে ধান, গম ইত্যাদি চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় সেচ কার্যে। নীচ তলায় দেখতে পেলাম, জেনারেটরগুলির পার্শ্বে এক হাজার পাউণ্ড ওজন চাপে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভরা অনেকগুলি গ্যাস-সিলিণ্ডার। জেনারেটরগুলির সাথে যুক্ত রয়েছে বাল্ব ও পারদ থার্মোমিটার। যদি কোনক্রমে জেনারেটরগুলির কোনটির তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে গরম হয়ে উঠে তাহলে পারদস্তম্ভের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং বাল্ব জ্বলে উঠবে। ইহা দেখে কর্মীরা ওখান থেকে সরে যাবেন নিরাপদ স্থানে এবং সাথে সাথে ঐ সিলিণ্ডারগুলির মুখ স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে বের হয়ে আসবে গ্যাস এবং বরফের মত ঠাণ্ডা করে দেবে জেনারেটরগুলিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই। ষ্টেশনের ভিতরে কোন যন্ত্রে আগুন লেগে গেলে তা' স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নির্বাপিত হবে। এমনকি কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে কর্মীরা যাতে তাড়াতাড়ি বাহিরে বেরিয়ে আসতে পারেন তার জন্য আছে গুপ্ত পথ। ষ্টেশনের ভিতরকার দূষিত বায়ু বেরিয়ে যাবার জন্য রয়েছে একটি চোঙ এবং বাইরের বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে সরবরাহের জন্য রয়েছে তারের জালযুক্ত একটি ঘর। এজন্য ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনরূপ অসুবিধা হয়না। এই

ষ্টেশনটি জার্মানী ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয়েছে। জেনারেটরগুলি এসেছে জার্মানী থেকে এবং টার্বাইনগুলি এসেছে ফ্রান্স থেকে। কোন যন্ত্র কাজ করতে অক্ষম হলে ঐ যন্ত্রের মধ্য থেকে অনবরত একটা শব্দ বের হতে থাকবে এবং শব্দ শুনে কর্মীরা বুঝতে পারবেন যে যন্ত্রটি খারাপ হয়ে গেছে। তখন সময়মত তাঁরা যন্ত্রটি মেরামত করে নেবেন। ষ্টেশনের নীচতলায় কয়েকটি লেদ মেশিন আছে। এই মেশিনে তৈরী হয় ছোট ছোট যন্ত্রাংশ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাইথন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জিলায় অবস্থিত। এখানে আরও রয়েছে স্বল্প আয়ের লোকজনদের থাকার জন্য L.I.G. (Lower Incoming Group) কোয়ার্টার। এটি বাঁধ থেকে একটু দূরে জলাশয়ের পাড়েই অবস্থিত। অবশ্য, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগুলিকে ভাড়া দিচ্ছেন। যুবকদের জন্য রয়েছে যৎসামান্য খরচে থাকার জন্য Youth Hostel. সবগুলিই দেখতে বেশ সুন্দর ও সাজান গুছান। বাঁধের ওপারে অর্থাৎ বিহারের ধানবাদ জেলায় রয়েছে অফিসসমূহ, কর্মীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য ক্লাব, প্রেক্ষাগৃহে, সবুজ বৃক্ষরাজি সুশোভিত পার্ক এবং সুরম্য আবাসিক কোয়ার্টার, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল। এছাড়াও আছে দোকানপাট, বাজার ইত্যাদি। প্রায় চার হাজার কর্মী এই কেন্দ্রটির বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন। এদের অর্ধেকের বেশীই বাঙ্গালী। মাইথন জলবিদ্যুৎ ষ্টেশনটি Damodar Valley Corporation বা D. V. C.-র অন্তর্ভুক্ত একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। মাইথন ছাড়া D. V. C.-র আরও কয়েকটি ষ্টেশন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—দুর্গাপুর, বোকারো, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া, চন্দ্রপুরা ও কোনার। এগুলোর মধ্যে পাঞ্চেৎ ও তিলাইয়া—জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং দুর্গাপুর, চন্দ্রপুরা, বোকারো ইত্যাদি হলো তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। কোনার কেন্দ্রটিতে কোন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, জলসেচ হয় মাত্র। D. V. C.-র বহুমুখী প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে—

বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, মৎস চাষ ইত্যাদি। D.V.C.-র সদর দপ্তর কলিকাতায় অবস্থিত।

মাইথনের দর্শনীয় সবকিছু দর্শন করে হোটেলে আমরা দুপুরের খাওয়াটা সেরে একটার সময় মেসে ফিরলাম এবং প্রায় ঘন্টা তিনেক বিশ্রাম নিলাম। বিকেল চারটায় বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে ট্যাক্সিযোগে কুমারডুবি ষ্টেশনে এলাম এবং পাঁচটা পাঁচ মিনিটে আবার 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ডে' চড়লাম। যখন বাড়ী পৌছলাম তখন রাত দশটা।

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

পাত্র (২৯), কল্যাণীতে সরকারী সংস্থায় স্থায়ী, ফর্সা, সুদেহী, নিরামিষাশী। সরকারী চাকুরীরতা ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী অগ্রগণ্যা। —অধ্যাপক উমাপদ নাথ, কৃবিকুঞ্জ, কুইকোটা, পোঃ মেদিনীপুর।

পাত্রী (১৯), লম্বা মাঝারী গড়ন, ফর্সা স্কুল ফাইন্যাল অনুত্তীর্ণা। সুউপায়ী উপযুক্ত চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা হাবড়ায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র নাথ, গ্রাঃ-শ্রীপুর, পোঃ-হাবড়া, জিঃ ২৪ পরগণা।

পাত্র এম. এ. (অঙ্ক), ও এল. এল. বি. XII class স্কুলের শিক্ষক।

এবং

পাত্রী (২৭), এম. এ. (বাংলা) পরীক্ষা দিয়াছে। খেয়াল ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে সঙ্গীত বিশারদ। রং ফর্সা (৫') দুই দাদা ইঞ্জিনিয়ার। শ্রীগোষ্ঠ বিহারী নাথ, কপাট হাট, পোঃ ডায়মণ্ড হারবার, জিঃ ২৪ পরগণা, পিনকোড-৭৪৩৩৩১।

পাত্রী (৫'-৩"), শ্যামবর্ণা, বয়স ২০ স্বাস্থ্যবতী সুকেশিনী সুশ্রী। উচ্চ মাধ্যমিকে ১ম বিভাগে পাশ এবং ১৯৮২-তে বি. কম দিয়াছে। উপযুক্ত পাত্র চাই।

এবং

পাত্রী (২৬) সুশ্রী গৌরবর্ণা ও সুকেশিনী M. tech, প্রথম শ্রেণী (Biological Engineer) বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে গবেষণারতা। উপযুক্ত Engineer পাত্র চাই। শ্রীধ্রুবরঞ্জন দেবনাথ। সংগ্রামগড়, পোঃ বেঙ্গল এনামেল, পলতা, জিঃ-২৪ পরগণা।

পাত্রী (২০) বি. এ. পাশ, গৌরবর্ণা, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্মে নিপুণা। সূচী ও পোষাক প্রস্তুত কাজে পটু। ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কথোপকথনে অভ্যস্থা। উপযুক্ত পাত্র চাই। J. C. Debnath, Qrt. No. 460. Sector VI B, P.O-Balconagar, Dist-Bilaspur (M. P)

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা**।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৩৭, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, ক'লকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮৯

সম্পাদক—সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

শিব-প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিহরং সুরেশং
গঙ্গাধরং বৃষভবাহনমম্বিকেশম্ ।
খট্বাঙ্গশূলবরদাভয়হস্তমীশং
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥

প্রাতর্নমামি গিরিশং গিরিজার্দ্ধদেহং
সর্গস্থিতিপ্রলয়কারণমাদিদেবম্ ।
বিশ্বেশ্বরং বিজিতবিশ্বমনোভিরামং
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥

প্রাতর্ভজামি শিবমেকমনন্তমাদ্যং
বেদান্তবেদ্যমনসং পুরুষং মহান্তম্ ।
নামাদিভেদরহিতং ষড়ভাবশূন্যং
সংসার-রোগহরমৌষধমদ্বিতীয়ম্ ॥

প্রাতঃ সমুত্থায় শিবং বিচিন্ত্য, শ্লোকত্রয়ং যেঽনুদিনং পঠন্তি ।
তে দুঃখজাতং বহুজন্মসঞ্চিতং, হিত্বা পদং যান্তি তদেব শম্ভোঃ ॥

ইতি শ্রীশিবপ্রাতঃস্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

সম্পাদকীয়

হিন্দুধর্ম, প্রকৃত প্রস্তাবে, বিশ্বের বৃহত্তম মানব-গোষ্ঠীর ধর্ম। কিন্তু হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষেব বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্য সেই সত্য মিথ্যায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

হিন্দুধমের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদ। বেদের দুটি কাণ্ড—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদেব সেই কমকাণ্ড অথবা জ্ঞানকাণ্ড অথবা উভয়কাণ্ড-এর ওপর ভিত্তি করেই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌব, গাণপত্য, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি শাখাধর্মগুলোর সৃষ্টি। সুতরাং, বর্তমানে, হিন্দুধর্ম বলতে বোঝায় শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল শাখাধর্মের সমবায়কে।

এই মূল সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেক হিন্দুই বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি শাখাধর্মগুলোকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক কয়েকটি ধর্ম হিসেবে মনে করে থাকেন। এটা কিছুটা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাপ্রসূতও বটে। বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্যই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি শাখার চিন্তাশীল মানুষেরাও মনে করে থাকেন,—বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি ধম অহিন্দুধর্ম ; বিচ্ছিন্নতা-বাদী মানসিকতার জন্যই বৌদ্ধ. জৈন, শিখ প্রভৃতি শাখার চিন্তাশীল মানুষেরাও নিজেদের অহিন্দু পৃথক পৃথক ধর্মাবলম্বী মানুষ বলেই ভেবে থাকেন। এই চিন্তাশীল মানুষেরাই তাঁদের চিন্তা-ভাবনাকে বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে বৃহত্তর মানবসাধারণের সামনে হাজির করে থাকেন। তাঁদের সেই সমস্ত লেখার মধ্যে, স্বাভাবিক ভাবেই, তাঁদের বিচ্ছিন্নতা-বাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাঁরা এমনভাবে লিখে থাকেন যাতে প্রায়শই মনে হয়—বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম ঠিক হিন্দুধর্ম নয়।

হিন্দুদের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে হিন্দুধর্মের অশেষ অনিষ্ট সাধন করে চলেছে। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা পরিত্যক্ত না হলে অচিরেই হিন্দুধর্ম বিশ্বের সংখ্যালঘুধর্মে পরিণত হবে, হিন্দুধর্ম অচিরেই পরিণত হবে একটি ক্ষয়িষ্ণু দুর্বল মানবগোষ্ঠীর ধর্মে।

তাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা—হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রতিটি হিন্দুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হোক; হিন্দুধর্মের প্রতিটি শাখার প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের মধ্য থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা বিদূরিত হোক; হিন্দুধর্মে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক; হিন্দুধর্ম সেই বৈচিত্র্যময়-ঐক্য-শক্তির ওপর ভর করে বিশ্বমানবের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করুক।

'শৈবভারতী'-র গ্রাহকদের প্রতি
আবেদন

'শৈবভারতী'-র গ্রাহকদের মধ্যে যাঁদের গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁরা অনতিবিলম্বে আট টাকা নিম্ন ঠিকানায় অথবা আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় 'শৈবভারতী' পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

টাকা পাঠাবার ঠিকানা:

কোষাধ্যক্ষ: **শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ**
৫৭-এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট
ক'লকাতা-৭০০০০৭

শৈবসাধক শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ স্মরণে

সতীশচন্দ্র নাথ, ভক্তিরত্ন

প্রথম পর্ব

সুদূর অতীতে একটি দিনে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজকে দর্শন করার প্রথম সৌভাগ্য হয়েছিল ইং ১৯১৬ সনে, নোয়াখালি জেলার গ্রাম অঞ্চলে এক অভাবনীয় চাঞ্চল্যের মধ্যে। ঐ জেলার অভ্যন্তরে তখনকার কালের লোকেরা ভেকধারী বৈষ্ণব বাবাজী ছাড়া সাধুপুরুষ কমই দর্শন করতে পেত। ঐ রকম কালে, ব্যবস্থা হয়েছিল হরিদ্বারের এক মহামান্য সাধু মহারাজকে আনা হবে গ্রামাঞ্চলে। লোক মুখে প্রচারিত হয়ে পড়ল সে শুভ সংবাদটি।

ঐ সাধু মহারাজ থাকেন গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে। কুম্ভমেলা ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তিনি গঙ্গাহীন ভূভাগে অবতরণ করেন না। কয়েকজন ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি গঙ্গাহীন ভূভাগে আসবেন। আমার সে বয়সে এবং সে কালে হিমালয়ের সাধু বা দশনামী সম্প্রদায় সাধু সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। অবশ্য এই দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তা হয়নি। আচার্য শঙ্কর স্বীকৃত দশনামী সাধু সম্প্রদায় হলেন :—গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্বত, সরস্বতী, সাগর, তীর্থ, আশ্রম।

নদীয়ার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও দশনামী সম্প্রদায়ের সাধুর শিষ্য। মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীমৎ ঈশ্বর পুরী। আর তাঁর সন্ন্যাসগুরু ছিলেন কেশব ভারতী।

নোয়াখালীর সে অঞ্চল, বৈষ্ণবপ্রধান, শাক্ত মতের আর শৈব মতের ভক্ত সংখ্যা তুলনায় কম।

সমগ্র গ্রাম অঞ্চলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, হরিদ্বারের এক বিশিষ্ট শৈবসাধু মহারাজ আসবেন গ্রাম করপাড়া রায়দের বাড়ী, লামচর গ্রামের চৌধুরীবাড়ী হয়ে দালাল বাজারের জমিদার রায়দের বাড়ী, তারপর লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি গ্রামে তাঁর মঙ্গলপ্রদ গমনাগমনের ব্যবস্থা। সে কালে নোয়াখালি জেলার ঐ অঞ্চলের চলাচলের একমাত্র ভরসা "নৌকা"। একখানি নৌকা; তাতে পরিচ্ছন্ন বিছানা উত্তমরূপে ফুল এবং বিচিত্র ফুলের মালা দ্বারা সাজানো। নৌকার আচ্ছাদনের নীচে সামনের ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন নবানীত সাধু মহারাজ। তাঁর দিব্য-কান্তি তপস্যাদীপ্ত উজ্জ্বল দেহ; সেই সুকোমল দেহ গৈরিক রেশমী বস্ত্র দ্বারা আবৃত। মস্তকে মসৃণ শিল্কের পাগড়ী; তাও গৈরিক বর্ণের। কপালে বিভূতির ধূসর রেখা। চোখে সোনার ফ্রেমের নীল রং এর চশমা। [সে কালে শুনেছিলাম, হিমালয়ের তুষারাবৃত স্থানে তপস্যা করার কালে একটি চক্ষু নষ্ট, তাই তিনি নষ্ট চক্ষুকে নীল চশমা দ্বারা আবৃত রাখেন]

তপস্বীবরের বৃদ্ধ শরীর। সেই শরীরের বর্ণ গেরুয়া বসন আর আবরণকে হার মানিয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আবার কর-কমলেও রুদ্রাক্ষের ছোট্ট জপের মালা। নিঃশব্দে সে মালাটি নাম জপে প্রাণ চঞ্চল দোলায়মান। ঐ দেবদুর্লভ দৃশ্য দর্শনের আকাঙ্খায় বহু দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

বিত্তশালী গৃহস্থ রায়দের নৌকাঘাটে নৌকাখানির উপস্থিতিতে এক অভিনব চঞ্চল দৃশ্যের সৃষ্টি হ'ল। নোয়াখালীর ঐ অঞ্চলের লোকেরা ইতিপূর্বে ঐ প্রকার সাধু দর্শন করেছিল কিনা তা করপাড়া লামচরের গ্রামের আশে পাশের লোকের জানা ছিল না। দর্শনার্থীর ভিড় সামলাবার জন্য ভাগ্যবান চৌধুরী পরিবারের অনেকেই করজোড়ে সমাগত দর্শকদের কাছে মিনতি চাইছিলেন যেন সাধু-মহারাজের স্বীয় ভজনের বিঘ্ন না হয়। খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন সমারোহের মধ্য দিয়ে সাধু মহারাজকে বাটীর অভ্যন্তরে নেওয়া হল। বলা-বাহুল্য

দর্শনার্থীদের জন্য অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা করাছিল। খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন সমারোহের মধ্য দিয়ে সাধু মহারাজদের গৃহের অভ্যন্তরে নেওয়া হয়েছিল। দর্শক জনস্রোত ছিল অবিরাম ধারায়। পূজ্যপাদ গিরি-মহারাজের সে সময়ে ভজনশীল দেহের বয়স হয়েছিল পঁয়ষট্টি বৎসর। কিন্তু এমন তপস্যা পূত দেহকান্তি যে, বোঝবার বা অনুমান করার ক্ষমতা ছিল না দর্শনার্থীদের। প্রায় ৭০ বছরের পুরানো স্মৃতি এখনও কত মধুর আর অম্লান।

লামচর গ্রামের চৌধুরীদের পাকাবাড়ীর এক শোভনীয় প্রকোষ্ঠে সাধু মহারাজজীর অবস্থানের ব্যবস্থা। [সে কালে নোয়াখালি জেলার বিশেষ বিত্তবান ছাড়া কারুর পাকাবাড়ী ছিল না। অধিকাংশ গৃহস্থের মজবুত ঢেউটিনের ঘরবাড়ীই সমৃদ্ধির চিহ্ন ছিল] সে দিবসে আমরা বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নরনারী সবাই সাগ্রহ দর্শনার্থী। গিরি মহারাজ নিজের কুসুম কোমল হাতে দর্শকদের প্রসাদ—নকুলদানা ও কিসমিস বিতরণ করেছিলেন। বাইরের আঙ্গিনায় অফুরন্ত লোকের অবিরাম হরিনামকীর্তন তো আছেই। আর বিশেষ ভাগ্যবান ভক্তদের "হর হর বম্ বম্" ধ্বনি সংযুক্ত হয়ে দেবদুর্লভ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

পূর্ব ব্যবস্থানুসারে শ্রীমৎ গিরি মহারাজ ও সেবক সাধুদের পরবর্তী অবস্থানের প্রোগ্রাম দালাল বাজার রায় বাবুদের গৃহে। রায়বাবুরা বড় জমিদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে। রায়বাবুদের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ স্থাপিত ছিল, সেই লক্ষ্মী নারায়ণ সেবার অঙ্গ ঝুলনপর্ব উপলক্ষে বিরাট মেলা বসতো। রায় পরিবারের বিশিষ্ঠ ব্যক্তি ৺শচীন্দ্র কুমার রায় ও নরেন্দ্র কিশোর রায়ের উদ্যোগে গিরি মহারাজের শুভাগমনের ব্যবস্থা। তখনকার কালে ঐ অঞ্চলের বিত্তশালী জমিদারদের চলাচলের ব্যবস্থা ছিল হাতীর পিঠে করে। লামচর গ্রাম থেকে গিরি মহারাজদের আগমন ব্যবস্থা হয়েছিল সাজানো হাতীর পিঠে করে। সেই পোষা হাতীর পিঠে হাওদায়

বসানো হল গিরি মহারাজ ও সঙ্গীয় সাধুদের, আর একজন অনুগত ভক্ত হলেন ছত্রধারী।

সেই হাতীর গলার ঘণ্টা ধ্বনি আকর্ষণ করেছিল সর্বস্তরের মানুষকে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। মুসলমানগণ দেখতে এসেছিল ; কারণ, তাদের পীর সাহেব সম্মান করে গিরি মহারাজকে।

যখন গিরি মহারাজ সেই অর্ধশায়িত হাতীর পিঠ থেকে ভক্তদের সহায়তায় নামলেন ; তখন পূর্ব ব্যবস্থা মতো পোষা হাতীটি একটি ফুলের মালা শুঁড় দিয়ে পরিয়ে দিল গিরি মহাবাজের গলায় আর শুঁড় মাথায় ঠেকিয়ে গিরি মহারাজকে প্রণাম করল। ঐ পরিবেশে প্রীত গিরিমহারাজও সেবক সঙ্গীদের কাছ থেকে কয়েকটি পাকাকলা এনে খাইয়ে দিলেন হাতীটিকে নিজ হাতে। বাল্যকালে গিরি মহারাজকে দর্শনের সেই চিত্রটি এ সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও সুস্পষ্ট। এ হলো আমার বাল্যকালের সাধু দর্শন (গিরিমহারাজ) স্মৃতি।

দ্বিতীয় পর্ব

পরবর্তীকালে ১৯২৩ সনে সাধুবাবা গিরি মহারাজকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতায় ভবানীপুর ল্যান্সডাউন রোডে। ভক্তবর এটর্ণী শ্রীঅচলনাথ মিত্রের গৃহে। ইতিমধ্যে গিরি মহারাজের কৃপাগমনে যে এই বঙ্গভূমি—পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গ ধন্য হয়েছিল, কত ভাগ্যবান পরিবার যে তাঁর কৃপায় সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ এর ভজনে আনন্দ লাভ করেছিলেন, তার বিবরণ প্রাচীন ভক্তগণ দিতে পারেন। আমরা অযোগ্য নগণ্য ব্যক্তি তা ব্যক্ত করতে অক্ষম। ভক্তবর অচলনাথ মিত্রের গৃহে গিরি- মহারাজকে দর্শন করেছিলাম অপূর্ব এক মনোজ্ঞ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

ঐ ভক্ত গৃহে সাধুবাবা গিরি মহারাজের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্তনের আয়োজন হয়েছিল। এই সংক্ষেপিত রামনাম সংকীর্তন

দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেই দ্রাবিড় দেশ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক রামনাম কীর্তন বাংলাদেশে আনীত ও প্রচলিত হয়েছে। শ্রীঅচল মিত্রের গৃহে সে রামনাম কীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল, গদাধব আশ্রমের তৎকালীন মোহন্ত সাধু গিরিজানন্দ কর্তৃক। ঐ সময়ে (১৯২৩ সনে) বেলুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামা শিবানন্দ গদাধর আশ্রমে অবস্থান করে মা-কালী দর্শন উপলক্ষে গিরিমহারাজকে দর্শনের জন্য অচল মিত্রের গৃহে গিয়েছিলেন। উক্ত অচল মিত্র স্বামীপাদ গিরিমহারাজের কৃপা-প্রাপ্ত আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দেব শিষ্যা। উভয়েই সন্ন্যাসীর শিষ্য, পৃথক গুরু হলেও গুরুদেব ও গুরু স্থানের প্রতি উভয়ের অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা। ঐ অচল মিত্রের অকুণ্ঠ দানে হরিদ্বারের গুরুধাম, ধমশালা ও ভোলাগিবি আশ্রম পবিপুষ্ট।

সে দিন সেই মিত্র-গৃহে দুই বরেণ্য সাধু সঙ্গম হযনি দৈবক্রমে। গিবি মহারাজ সেক্ষণে অপব ভক্তগৃহে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে গিরি মহারাজ জানলেন স্বামা-শিবানন্দজী এসেছিলেন, আর মিলন বঞ্চিত হযে ফিবে গিয়েছেন। মনোবেদনাহত গিরি মহারাজ, পবদিবস প্রভাতেই অনুগত সেবক ব্রহ্মচারী রামানন্দ আর দুইজন ভক্ত সেবকসহ হরিশ মুখার্জী ষ্ট্রীটস্থ গদাধর আশ্রমে উপনীত হলেন। গিরি মহারাজের তপোদ্দীপ্ত দেহকান্তি এই আট বৎসরেব ব্যবধানে আরো উজ্জ্বলতরই মনে হয়েছিল। আর দুই বৃদ্ধ তাপসের মিলন-চিত্র আরো উজ্জ্বলতব। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ শিবানন্দজী আর শিবভক্ত গিরি-মহারাজের মিলন ভূতলে দুই অতুল মণির মহামিলন। সে মিলন দৃশ্য দেখবাব সৌভাগ্য যে জন পাঁচ-ছয়ের হয়েছিল তার মধ্যে এ প্রবন্ধ লেখক অন্যতম।

মিলনক্ষণে গিরিমহাবাজ শিবানন্দজীর প্রতি করজোড়ে বললেন "হমারা বহুত কসুর হো গিয়া, আপ দর্শন দেনোকো লিয়ে হামারা ডেরামে গিয়া…" দর্শন মিলা নেই…।

শিবানন্দজী—এ কসুরকা বাত্ নেহি। ইসলিয়ে তো আজ দর্শন মিলা। হামারা বহুত ভাগ্য····।

গিরিমহারাজ—আপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কা পার্ষদ···বহুত ভাগ্যবান। হামারা গুরুবৎ···।

স্বামী শিবানন্দ—আপতো ভোলানাথ ভগবান শিবজীকা সেবক।

এরপর দুইজনেরই পরস্পর প্রণামের বৃথা চেষ্টা, সে চেষ্টার পরে আলিঙ্গনে পরিসমাপ্তি।

এরপর গিরিমহারাজ ঠাকুর ঘরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পটের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন, আর তাঁর সঙ্গে আনা ফলগুলি অর্পণ করলেন শ্রীঠাকুরের সেবার জন্য।

এ সুদীর্ঘকাল পরেও সে দৃশ্য আমার মানসপটে সুস্পষ্ট। বিদায়ের কালে গিরিমহারাজ বলেছিলেন—"ভগবানকা নাম করো আনন্দে রহো···"।

———

বিজ্ঞপ্তি

যাঁরা ডাকযোগে টাকা পাঠান, M. O. কুপনে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম ও ঠিকানা না থাকার জন্য আমরা টাকা জমা করতে পারছি না। সুতরাং দয়া করে প্রত্যেক M. O. কুপনে পরিষ্কারভাবে তাঁদের পুরা নাম ও ঠিকানা লিখে দেবেন।

উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরের জাতিভেদ

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এবারে জাতিভেদের উদ্ভব-পরবর্তী-স্তরে হিন্দু-সমাজে তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের স্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

জাতিভেদের প্রথম স্তরে, যখন প্রাক্‌-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মানব-শিশুকে শূদ্র, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সাধক-বালককে বৈশ্য, গার্হস্থ্যাশ্রমের সাধক-যুবককে ক্ষত্রিয় এবং বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের বিগত যৌবন-সাধককে ব্রাহ্মণ বলা হত তখন শূদ্রের উপাস্য দেবতা ছিলেন গণপতি, বৈশ্যের উপাস্য দেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়ের উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবতা ছিলেন পঞ্চানন-মহেশ্বর-শিব। কিন্তু জাতিভেদ জন্মগত হয়ে যাওয়ায় এবং বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্রত্যেকোরই চারটি আশ্রম-ধর্ম স্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন প্রধান দেবতাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেরই উপাস্য-দেবতায় পরিণত হন। সাধারণ-জনজীবনে আশ্রমধর্ম অবলম্বনে সাধনার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাওয়ায় এবং প্রধানত গার্হস্থ ছাড়া অন্য আশ্রমগুলো মানব-সাধারণ কর্তৃক অবলম্বিত না হওয়ায় সকলেরই গার্হস্থ্য-জীবন প্রায় এক রকম হয়ে পড়ে। শূদ্রের গার্হস্থ্য-জীবনের সঙ্গে বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্য-জীবনের গুণগত পার্থক্য খুব একটা আর থাকে না। কাজেই গণপতিও সকল জাতির উপাস্য-দেবতার আসন অধিকার করে বসেন। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যাঁরা গণপতির উপাসক তাঁরা গাণপত্য, যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরা বৈষ্ণব এবং যাঁরা শিবের উপাসক তাঁরা শৈবরূপে চিহ্নিত হন।

আগেই বলা হয়েছে, জাতিভেদের পঞ্চম স্তরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম কেবলমাত্র উপনয়নানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। তাই উপাস্য দেবতা হিসেবে

ব্রহ্মার আদর খুব একটা আর থাকে না ; ব্রহ্মা আর ব্রহ্ম সমার্থক হয়ে যান। আবার গার্হস্থ্য মুখ্য জীবনচর্যায় পরিণত হওয়ায় বিষ্ণু মুখ্য দেবতায় পরিণত হন।

চতুরাশ্রমের পরিকল্পনার মূলে ছিল ঋষিধারা ও মুনিধারার সুসমন্বয়। যে মুহূর্তে গার্হস্থ্য মুখ্য আশ্রম হয়ে দাঁড়ায় সেই মুহূর্তে ঋষিধারার প্রাধান্য সূচিত হয়। এরই প্রতিক্রিয়ারূপে মুনিধারার জাগরণ-প্রয়াস ক্রিয়াশীল হয়। মুনিধারার এই জাগরণ-প্রয়াস থেকে যতি বা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যৌবনপ্রাপ্তির সাথে সাথে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না ক'রে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক যোগ বা পরমার্থ সাধনার কথা মুনিধারার সমর্থকদের দ্বারা ঘোষিত হয়। এইভাবে যতি বা যোগী বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই যোগী বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে শিব একমাত্র উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। পক্ষান্তরে গৃহস্থ মানুষদের কাছে বিষ্ণু প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি গৃহস্থ যতি বা যোগী ব্রাহ্মণদের* ওপর মুনিধারার প্রভাব দারুণভাবে ক্রিয়াশীল থাকায় এঁরা গার্হস্থ আশ্রমে থেকেই যোগ সাধনা চালাতে থাকেন। এঁরাও শিবকে এঁদের উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। গৃহস্থদের এই অংশের এবং সন্ন্যাসীদের প্রকৃত অধ্যাত্ম সাধনার প্রভাবে শৈব সম্প্রদায়ের দ্রুত প্রসার ঘটে। তাই তো দেখা যায়, ভারতের বেশীর ভাগ তীর্থ-ই শৈব-তীর্থ ; ভারতের বেশীর ভাগ মন্দিরই শিব মন্দির। এই শৈব-সাধকেরা মূলত অদ্বৈত সাধক। কাজেই এঁদের সাধনালব্ধ অভেদ জ্ঞানে জন্মগত জাতিভেদের অসারতা প্রতিফলিত হয়। প্রধানত এঁদেরই প্রয়াসে পরবর্তীকালে শূদ্ররাও সন্ন্যাস গ্রহণ করে যোগ সাধনায় রত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানচর্চার অধিকারপ্রাপ্ত হন।

শৈব-সম্প্রদায়ের এই প্রভাব লক্ষ্য করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও যোগ সাধনাকে স্থান দিতে হয় ; এবং মুনিধারার যোগপ্রধান অধ্যাত্মসাধনার

---

* যতি বা যোগী ব্রাহ্মণের অনেকস্থলে শুধু যতি বা যোগী নামেও অভিহিত হয়েছেন।

আদর্শ গ্রহণ করেই অধ্যাত্ম-সাধনা হিসেবে বৈষ্ণব-সাধনা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরই আভাস পাওয়া যায় মহাভারতে। মহাভারতে সুবর্ণাখ্য-তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—'তৎপরে ত্রিলোক-বিশ্রুত সুবর্ণাখ্য-তীর্থে গমন করিবে, পূর্বে ভগবান বিষ্ণু যে স্থানে ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবাদি-দেব ত্রিলোচন প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে দেবদুর্লভ বর প্রদানপূর্বক কহিলেন, "হে জনার্দন! তুমিই সকল লোকের একমাত্র প্রিয়পাত্র ও সমুদয় সংসার মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

পরবর্তীকালে চারটি আশ্রমের স্থলে প্রধানত দুটি আশ্রম কার্যকর থাকে—(১) গার্হস্থ্য এবং (২) সন্ন্যাস। যৌবনপ্রাপ্তির পর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে যাঁরা বিয়েথা করে সংসারী হন তাদের বলা হয় গার্হস্থ্যাশ্রমী বা গৃহস্থ ; আর যাঁরা বিয়েথা না করে অথবা বিয়েথা করার পর সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাঁদের বলা হয় সন্ন্যাসাশ্রমী বা সন্ন্যাসী। আবার গৃহস্থদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তাঁদের মূলত দুটি ভাগ হয় —(১) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও (২) যতি বা যোগী ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণেরা কর্মকাণ্ডের যজ্ঞকেই একমাত্র পরমার্থ-সাধন বলে গ্রহণ করেন ; আর যতি বা যোগী ব্রাহ্মণেরা কর্মমার্গের যজ্ঞকে বর্জন না করলেও পরমার্থ সাধনরূপে একমাত্র জ্ঞানমার্গের যোগকেই অবলম্বন করেন।

পরবর্তীকালে প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির মধ্যে আবার ঋষি ধারার যজ্ঞ এবং মুনিধার যোগের সমন্বয় সাধিত হয়—যজ্ঞ হোমে আর যোগ ধ্যান-প্রাণায়ামাদিতে রূপান্তরিত হয়। শিব ও বিষ্ণুসহ সকল দেবদেবীর পূজাতেই হোম ও ধ্যান-প্রাণায়ামাদি অবশ্য করণীয় বলে ঘোষিত হয়।

পঞ্চম স্তরে জাতিভেদ একান্ত জন্মগত হয়ে পড়ায় এবং প্রত্যেক জাতির জন্য সামাজিক কর্ম নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটা অসুবিধা দেখা দেয়। দেখা যায়—সমস্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানই ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কর্ম সাধনের উপযোগী গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করছেন না। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ সন্তানেরা ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মে

আত্মনিয়োগ করতে পারছেন না অথবা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না। একই অবস্থা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তাই এই অসুবিধা দূর করার জন্য দু'একটি বিশেষ কর্ম ছাড়া নিম্নবর্ণের পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ওপর আরোপিত সমস্ত রকম বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়।

বিভিন্ন জাতির প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা সামাজিক কর্ম বা পেশায় বিধান শিথিল করা হয়, কিন্তু শিথিল করা হয় না একান্ত জন্মগত জাতিভেদের বিধান। বরং এই একান্ত জন্মগত জাতিভেদের ক্ষেত্রে আরো কড়াকড়ি করা হয়। আগে জাতি সাঙ্কর্যকে খুব একটা দোষণীয় বলে মনে করা হ'ত না। পিতা অথবা মাতা যে কোন এক-জনের বর্ণ অনুযায়ী কর্মের উপযুক্ত হয়ে কোন সন্তান সেই কর্মে নিয়োজিত থাকলে তিনি সেই বর্ণ বা জাতি হিসেবে পরিচিত হতেন। যেমন, বশিষ্ঠ গণিকাপুত্র হয়েও ব্রাহ্মণ হিসেবে, ব্যাসদেব ধীবর কন্যার গর্ভজাত হয়েও ব্রাহ্মণ হিসেবে এবং ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানীর গর্ভজাত ক্ষত্রিয় যযাতির পুত্র যদু থেকে সৃষ্ট যদুবংশোদ্ভব সকলেই ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।* আবার ভীমপুত্র ঘটোৎকচ মাতৃবংশ অনুযায়ী কর্মের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠায় রাক্ষস হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চম বা একান্ত-জন্মগত-জাতিভেদের স্তরে বর্ণ-সাঙ্কর্য্য অতি দোষণীয় বলে ঘোষণা করা হয়। তাই অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তান পিতৃবর্ণ পাবেন না বলে বলা হয়। অনুলোম-অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়ে হিন্দু-সমাজে স্থান পান; আর প্রতিলোম-অসবর্ণ-বিবাহে জাত সন্তান হিন্দু-সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। আরো পরবর্তীকালে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহে জাত সন্তানকেও মাতৃবর্ণ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং আলাদা সঙ্করজাতি হিসেবে সেই সন্তান পরিচিত হ'ন। এই ভাবে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজের অন্তর্ভুক্ত বহু সঙ্কর-

---

* এগুলো জন্মগত জাতিভেদের আগের স্তরের ঘটনার আভাসও হতে পারে।

জাতির এবং প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজের বহির্ভূত বহু অন্ত্যজ সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে হিন্দু-সমাজের জাতপাতের গোড়ামিকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগানোর ফলে চারটি মূল জাতি বা বর্ণের মধ্যেও বিভাজন শুরু হয়—ব্রাহ্মণ বহু রকমের ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয় বহু রকমের ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্য বহু রকমের বৈশ্যে এবং শূদ্র বহু রকমের শূদ্রে বিভক্ত হন। জাতপাতের গোড়ামিকে ব্যবহার ক'রে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে, এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় আর এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়কে, এক শ্রেণীর বৈশ্য আর এক শ্রেণীর বৈশ্যকে, এক শ্রেণীর শূদ্র আর এক শ্রেণীর শূদ্রকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করার চেষ্টায় রত হ'ন। এ ছাড়া শুধুমাত্র জন্মের দোহাই দিয়ে নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনাও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

এর পর গঙ্গা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানালোকে মানব-মন বিকশিত হয়, মানবতাবোধের জাগরণ ঘটে। জাতপাতকে অবলম্বন করে মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননা, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, সামাজিক-শোষণ প্রভৃতি কিছুটা স্তিমিত হয় মাত্র; তবে একেবারে নিঃশেষ হয় না।

বর্তমানে হিন্দু-সমাজে একান্ত জন্মগত জাতিভেদের বাইরের লেবেলটুকু মাত্র বজায় আছে; ভেতরটা একেবারেই বদলে গেছে। পূজা ও স্মার্ত-ক্রিয়াদিতে পৌরোহিত্য প্রভৃতি দু-একটি বাদে অন্যান্য সকল সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান অধিকারী, দেখা যায়। বিদ্যাবুদ্ধির চর্চাতেও জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রায় সকলকেই নিয়োজিত দেখা যায়—জন্মগত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যেমন মহামূর্খকে খুঁজে পাওয়া যায়, জন্মগত শূদ্র বা সঙ্কর-জাতির মধ্যেও তেমনি পরম পণ্ডিত বিদ্যমান দেখা যায়। গুণগত দিক থেকেও সমস্ত জাতিরই সমান অবস্থা লক্ষ্য করা যায়—জন্মগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর সকল জাতির মধ্যেই সত্ত্বগুণী, রজোগুণী ও তমোগুণী মানুষের

সন্ধান মেলে। গুণ, কর্ম, পেশা প্রভৃতি কোন কিছুর ভিত্তিতেই বর্তমানের জন্মগত জাতিভেদের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয় না। তাই জন্মগত জাতিভেদের বাইরের লেবেলটুকুকে বজায় রাখার কোন যৌক্তিকতাই বর্তমানে অনুভব করা যায় না। উপরন্তু জন্মগত-জাতিভেদকে অবলম্বন করে হিন্দু সমাজে বিদ্যমান একটা অহেতুক উঁচু-নীচুর মনোভাব মানবতাকে এখনো লাঞ্ছিত. অবমানিত করে চলেছে: এই জন্মগত-জাতিভেদকে অবলম্বন করে একটা অহেতুক-ভেদজ্ঞান হিন্দুধর্ম ও সমাজের অগ্রগতিকে এখনো ব্যাহত করে চলেছে; এই জন্মগত-জাতিভেদ থেকে সঞ্জাত একটা অহেতুক হিংসা-দ্বেষ জাতীয় সংহতিকে এখনো বিনষ্ট করে চলেছে। তাই জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে, দেশের সমৃদ্ধির জন্য, হিন্দু ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে. মানবতার খাতিরে এই জন্মগত জাতিভেদের আশু অবসান প্রয়োজন।

কিন্তু হায়! এই আশু-প্রয়োজন সিদ্ধ হবার আশু সম্ভাবনা বুঝি সত্যিই নেই। কারণ,—বর্তমানে বৈজ্ঞানিক-চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করেছে, মানবতাবোধের জাগরণ ঘটেছে, জন্মগত-জাতিভেদপ্রথাকে কুপ্রথায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে; তবু হিন্দু-সমাজের বুক থেকে এই কুপ্রথাকে নির্মূল করা যাচ্ছে না। হিন্দু সমাজের বুকে সৃষ্ট জন্মগত-জাতিভেদ বুঝি বা দুরারোগ্য ক্যান্সারে পর্যবসিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানবিক চেতনারূপ রশ্মি (ray)-র প্রভাবে বর্তমানে এই ক্যান্সার কিছুটা (কোথাও বেশী, কোথাও কম) প্রশমিত আছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরো কিছুটা প্রশমিত হবে; তবে একেবারে নির্মূল হবে না, যে কোন মুহূর্তে এটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বিস্তর অনর্থ ঘটাবে। তাই এই কুপ্রথার অবলুপ্তির জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন এবং সরকারী শাসন যন্ত্রের মাধ্যমে সেই আইন কার্যকর করণ রূপ অপারেশন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু হায়! সে রকম কোন প্রয়াস প্রাধান্য পাচ্ছে কৈ!

সমাপ্ত

পশুপতিনাথে কেদারনাথে

রণেশ দেবনাথ

দ্বাপর যুগ তখন শেষ হতে চলেছে এবং কলিযুগ শুরু হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর পাণ্ডবরা রাজ্য ফিরে পেয়েছেন; কিন্তু মনে তাদের শান্তি নেই। স্বজন হত্যার পাপে মনে অহর্নিশ দংশন। শেষ পর্যন্ত মুনি ঋষিদের উপদেশে তাঁরা স্বজন হত্যার পাপ খণ্ডাতে চললেন কাশীর বিশ্বনাথ দর্শনে। কিন্তু দেবাদিদেব যে আবার নিকটবর্তী কলিযুগে তার কিছু মহিমা প্রচার করতে চান। বিশ্বনাথ তাদের দর্শন না দিয়ে পলায়ন করলেন হিমালয়ে। পাণ্ডবরাও নাছোড়বান্দা। তাঁকে ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করতে লাগলেন। দেবাদিদেব নানান মায়ায় তাঁদের পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্টির ধ্যানযোগে বিশ্বনাথের সব রূপই ধরে ফেলছেন। অবশেষে একসময় যুধিষ্ঠির দেখলেন, বিশ্বনাথ প্রথমে একটি বিশাল মহিষের রূপ পরিগ্রহ করলেন এবং পরিশেষে একদঙ্গল মহিষের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। যুধিষ্ঠিরের পরামর্শমত মধ্যমপাণ্ডব ভীম ছুটলেন সেই মহিষকে বন্দী করতে। ভীমকে দেখেই বিশ্বনাথ শিং দিয়ে মাটি খুড়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করার ভান করলেন। ভীম ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড বাধা দিয়ে মহিষের পেছনের অংশটি জমিতে ধরে রাখতে পারলেন। ঐস্থানেই শিবশক্তি কেদারনাথের সৃষ্টি হল যা বর্তমান ভারতের প্রাচীনতম ও প্রধানতম তীর্থ। উপরের অংশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন তীর্থের সৃষ্টি করল। এই তীর্থসকলের মধ্যে যেটি সবচেয়ে জনপ্রিয় সেটি হ'ল নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরের অদূরে পশুপতিনাথ।

এছাড়া কেদারনাথের আশেপাশে আরও চার জায়গায় শিবশক্তির সৃষ্টি হয়েছিল সেই মহিষ শিবের দেহাংশ দিয়ে। এগুলি হল মধ্য-মহেশ্বর (নাভি), তুঙ্গনাথ (বাহু), রুদ্রনাথ (মুখমণ্ডল) এবং কল্পেশ্বর

(জটা)। বর্তমান প্রবন্ধ প্রধানতঃ পশুপতিনাথ এবং কেদারনাথ সম্বন্ধেই আলোচনার বিষয়।

হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র (নেপালের উপত্যকা শহর কাঠমাণ্ডুর উপকণ্ঠে পশুপতিনাথ তীর্থ (৪৫০০ ফিট) অবস্থিত। মহাভারতে বর্ণিত কিরাতদের দেশ ছিল এই মনোরম কাঠমাণ্ডু উপত্যকা। অনেকে বলেন মহিষ শিবের ছিন্নমুণ্ড এইস্থানে পড়েছিল বলে এই উপত্যকার নামকরণ "কাটমাণ্ডু" হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অনুমান ভুল। কাঠমাণ্ডু শহরের মধ্যস্থলে রাজাদের দরবার চকের নিকটে একটা বড় "কাষ্ঠমণ্ডপ" নামীয় প্যাগোডা শৈলী দেখা যায় যার থেকে এই উপত্যকার নামকরণ। শোনা যায়, এই প্যাগোডাটি একটি মাত্র গাছের কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত।

নেপালে বহু হিন্দু মন্দির প্যাগোডা স্থাপত্যরীতিতে গড়ে উঠেছে। পশুপতিনাথের মন্দিরও প্যাগোডা রীতিতে গঠিত। ভাষাতাত্ত্বিকদের ধারণা প্যাগোডা কথাটি সংস্কৃত "ধাতুগর্ভা" কথাটি থেকে এসেছে যার ভাবার্থ দেবতা ও ধনরত্নের ভাণ্ডার। কথাটি এই অর্থে প্রমাণিত সত্য যে, এই প্যাগোডা মন্দিরগুলিতে যথেচ্ছ পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয়েছে। পশুপতিনাথের মন্দিরের সামনেই আছে একটি পিতলের বিরাট নন্দী বা ষাঁড়ের প্রতিমূর্তি। পশুপতিনাথের মন্দিরের সমস্ত দরজা রৌপ্যনির্মিত এবং মন্দিরগাত্রের অনেকাংশ রৌপ্য দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরের ছাদও সোনার পাতে মোড়া। মন্দিরের ভিতরে রাজা মহেন্দ্রর একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি আছে।

শিব পশুরূপ ধারণ করেছিলেন বলে এখানে তিনি পশুপতিনাথ। এখানকার মূর্তি "পঞ্চমুখ" বিশিষ্ট যেটা অন্য কোন শিবমন্দিরে দেখা যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গের তারকেশ্বর তীর্থে কিন্তু প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় বাবা তারকনাথের আরতির সময় রৌপ্য নির্মিত পঞ্চমূর্তি চড়ানো হয়।

পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ভারতে যেমন গঙ্গা, নেপালে ঠিক তেমনি বাগমতীকে পবিত্র নদী বলে মানা হয়। মন্দিরের কাছেই নদীর তীরে নেপালের পবিত্র শ্মশান-ভূমি যার গৌরব আমাদের কাশীর "মনিকর্ণিকা" ঘাটের মতন।

এই পশুপতিনাথের মন্দিরের বর্তমান মূর্তিটি ৬০০ বছরের প্রাচীন ; কারণ, আদি মূর্তিটি মুস্‌লিম্ অনুপ্রবেশকারীরা ১৪শ শতাব্দীতে চূর্ণ করে যান। বর্তমান মন্দিরের কাঠামো ৩০০ বছর পূর্বে মন্দির সংস্কার কালে সৃষ্টি করা হয়। মন্দির চত্বরে পিতলের বিশাল "নন্দীমূর্তি"টি গত শতাব্দীতে বানানো হয়। পশুপতিনাথের মন্দিরের বিশাল চত্বরে অসংখ্য শিবলিঙ্গ এবং একটি ভীষণদর্শন ভৈরবমূর্তি (শিবের প্রলয়রূপ) আছে। পশুপতিনাথের ভৈরবমূর্তির মত কাঠমাণ্ডু শহরের দরবার চকেও দুটি ভৈরবমূর্তি আছে যা "কালোভৈরব" ও "শ্বেতভৈরব" নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে অপরাধীদের ধরে এনে কালো-ভৈরবের পদতলে ফেলে তাদের দোষ স্বীকার করতে বলা হত। যদি তারা মিথ্যাকথা বলত তবে নাকি তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতো বলে শোনা যায়।

পশুপতিনাথ মন্দির চত্বরে শুধুমাত্র হিন্দুরা চামড়ার কোনো জিনিষ ছাড়া ঢুকতে পারেন। তাই দলে দলে বিদেশীরা নদীর পূর্বপ্রান্ত অতিক্রম করে পাহাড় থেকে মন্দির দর্শন ও ছবি তুলে থাকেন। হিন্দুরা ফুল ও অন্যান্য সামগ্রী মন্দিরের সামান থেকে কিনে পশুপতি-নাথের পূজা দেন। প্রতি একাদশীতে মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের আধিক্য হয় এবং সন্ধ্যায় নানারকমের গীতবাদ্য সহযোগে বিশেষ আরতি হয়ে থাকে।

পশুপতিনাথের সবচেয়ে বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারী মাসে শিবের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শিবরাত্রিতে। ঐসময় ভারত ও নেপালের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসে শিবরাত্রির মেলায় সমবেত হন। বাগমতীর পুণ্যবারিতে সিক্ত হয়ে তারা শিবের উদ্দেশ্যে পূজা দেন।

পশুপতিনাথের আরেক বড় অনুষ্ঠান আগষ্ট মাসের "তীজ" উৎসব বা বিবাহ পঞ্চমী উৎসব। এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র বিবাহিতা রমণীদের। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য দীর্ঘ আনন্দময় বিবাহিত জীবন এবং স্বামীর পূর্বে নিজ মৃত্যু সুনিশ্চিত করা। লাল শাড়ী ও সিন্দূর পরিহিতা রমণীরা বাগমতীর জলে স্নান করে শিবের নিকট পূজা উৎসর্গ করেন। এই উৎসবের পরদিন প্রত্যেক রমণী বাগমতীর জলে সেইদিনের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি জিনিষ ৩৬০ বার পরিষ্কার করেন। এই অনুষ্ঠান নানারকম গীত ও আনন্দ মুখর অনুষ্ঠানাবলীর দ্বারা সমাপ্ত হয়।

নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় "বাল-চতুর্দশী" উৎসব। মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার সদ্গতির কামনা নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য লোক পশুপতিনাথে সমাগত হতে থাকেন, নানারকম গাছের বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দুমতে তাঁরা মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতি কামনা করেন। সন্ধ্যার পর এই অনুষ্ঠান নাচগান সহযোগে আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে।

নভেম্বর মাসে দীপাবলীর পূর্বে যে পাঁচদিনব্যাপী "তিহার" উৎসব হয় সেই উপলক্ষোও পশুপতিনাথে বিরাট মেলা বসে থাকে।

কাঠমাণ্ডু শহরের ৯ মাইল পূর্বে ভাঁতগাও বা ভক্তপুরে গড়ে উঠেছে মূল পশুপতিনাথের আদলে অবিকল আরেকটি পশুপতিনাথের মন্দির। এই মন্দিরের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর মিথুন স্থাপত্যরীতি। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সুমতিজয় জিতমিত্র মল্ল এটি নির্মাণ করেন।

ভারতের উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য দেশের তীর্থ কেদার নাথ। হরিদ্বার থেকে ১৫ মাইল দূরে হৃষিকেশ। সেখান থেকে পার্বত্য পথের বাস যাত্রা। ৪৪ মাইল দূরে প্রথমে যাত্রীরা আসবে ভাগীরথী এবং অলকা-নন্দার সঙ্গমস্থল দেবপ্রয়াগে। রাবণকে বধ করার পর রামের ব্রহ্ম হত্যার পাপ হল। তিনি এলেন এই স্থানে তপস্যা করে নিজ পাপ

স্খালন করতে। এখানে তিনি হাজার বছর শিবের তপস্যা করে তাকে সন্তুষ্ট করে এই স্থানকে পুণ্যভূমি করে গেছেন। ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলিত ধারা এখান থেকেই গঙ্গা নামে পরিচিত হয়ে সমতলের দিকে ধাবিত হয়েছে। এখানে রঘুনাথজীর মন্দির আছে। দেবপ্রয়াগ থেকে ২০ মাইল দূরে শ্রীনগর। এখানকার অরণ্যময় অঞ্চলে রাম শিবের আরাধনা করতেন। এখানে কমলেশ্বর শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে—একদা রাম শিবের সহস্রাক্ষ রূপকে পূজো করবেন বলে এক হাজার কমল সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু শিব তার ভক্তি পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ম লুকিয়ে ফেললেন। রামও কোনো দ্বিধা না করে তার নিজের চোখ তুলে সেই পদ্মের অভাব পূরণ করলেন। শিব খুশি হয়ে অবশ্য রামকে তার চোখ ফিরিয়ে দেন। সেইদিন থেকে এখানে কমলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা। শীতের শুরুতে বৈকুণ্ঠ একাদশীর রাতে এখানে চমৎকার একটি অনুষ্ঠান হয়। যে নারীরা সন্তান চান তাঁরা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্দিরের চারধারে ঘিরে দাঁড়ান। যাঁর দীপশিখা সারারাত জ্বলবে তার উপর দেবতার কৃপা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

শ্রীনগর থেকে বাইশ মাইল দূরে হিমাচল প্রদেশের কুমায়ুন জেলায় রুদ্রপ্রয়াগ। দেবর্ষি নারদ এখানে রুদ্রনাথ শিবের দর্শন পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই থেকে এখানে আছে রুদ্রনাথের মন্দির। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ১০ মাইল দূরে অগস্ত্যমুনির মন্দির। অগস্ত্যমুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে তার মন্দির। অগস্ত্যমুনির মন্দির থেকে ১৩ মাইল দূরে গুপ্তকাশী। এখানে বিশ্বনাথের মন্দির আছে।

গুপ্তকাশী থেকে ১৬ মাইল দূরে সোমপ্রয়াগ। এখান থেকে তিন মাইল দূরে ত্রিযুগী নারায়ণ তীর্থ (১১,৩৪৪ ফিট) এই মনোরম পার্বত্য অঞ্চলেই নাকি হরপার্বতীর বিবাহ হয়েছিল। স্কন্দ পুরাণ অনুযায়ী এই হিমালয় অঞ্চলেই শিবের বাসভূমি ছিল অর্থাৎ কেদারবদরী অঞ্চলকেই

কৈলাস বলা হোত। শিবকে স্বামী হিসাবে পাবার জন্য হিমালয় কন্যা পার্বতী তপস্যা করেছিলেন। ত্রিযুগী নারায়ণ সেই পৌরাণিক বিবাহযজ্ঞের তিন যুগের সাক্ষী প্রকাশ, আজও সেই অগ্নিকুণ্ড অনির্বাণ। যাত্রীরা কাঠ কিনে সেই অগ্নি অনির্বাণ রাখতে কাঠ গুজে দিয়ে যান।

সোমপ্রয়াগ থেকে আড়াই মাইল দূরে গৌরীকুণ্ডে (৬৫০০ ফিট) বর্তমানে বাস যাত্রা শেষ। এখানে একটি লালজলের কুণ্ড আছে। কথিত আছে গৌরী নাকি এই কুণ্ডের জলে ঋতুস্নান করেছিলেন। যাত্রীরা অবশ্য নিকটবর্তী একটি উষ্ণজলের কুণ্ডে স্নান করে থাকেন।

গৌরীকুণ্ড থেকে ৭ মাইল পার্বত্যপথ যাত্রায় কেদারনাথে পৌঁছান যায়। মন্দাকিনী নদীর তীরে তীরে রমণীয় হয়ে ওঠে এই তীর্থযাত্রা। ১১,৭০০ ফিট উচ্চতায় এই মন্দির অবস্থিত। বৈশাখের মাঝামাঝি অক্ষয় তৃতীয়ায় এই মন্দির দ্বার খোলা হয় এবং কালী পূজার পরদিন পূজো হয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে এই মন্দির দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড তুষার পাতের জন্য বাকি সময় এই মন্দির বন্ধ থাকে। ঐ সময় পূজারীগণ রূপার মহাদেব নিয়ে উখীমঠের শিবের মন্দিরে নেমে আসেন। অর্থাৎ উখীমঠ কেদারনাথের শীতালয়। এই স্থান রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত, প্রকাশ বানাসুরের কন্যা উষা এখানে কঠোর তপস্যা করে কৃষ্ণের দৌহিত্র অনিরুদ্ধকে বিবাহ করতে সমর্থ হন। কেদারনাথের পাথরের মন্দির পিছনে তুষার মণ্ডিত গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্যের মধ্যে অবস্থিত। জগদগুরু শঙ্করাচার্যের মাধ্যমে এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। তাই একটু তফাতে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি অবস্থিত। মন্দিরের ভিতর গর্ভগৃহে কালো এক শিলাখণ্ডকেই কেদারনাথের প্রতিমূর্তি হিসাবে পূজো করা হয়। স্থানীয় পাণ্ডারা যাত্রীদের পূজো করান। শিলাখণ্ডের গায়ে ঘি মাখিয়ে ধূপদীপ জ্বেলে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজো করানো হয়।

তীর্থ যাত্রীরা অনেকে পঞ্চ কেদার তীর্থ যাত্রায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কেদারনাথ, মধ্যমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ এবং কল্পেশ্বর নিয়ে পঞ্চকেদার তীর্থ গঠিত। মধ্যমহেশ্বর শিবের মন্দির (১১,০০০ ফিট) উখীমঠ থেকে ১২ মাইল দূরে চৌখাম্বা শৃঙ্গের নীচে মধ্যমহেশ্বর নদীর মুখে অবস্থিত। তুঙ্গনাথ (১২,০০০ ফিট) যেতে হলে উখীমঠ থেকে চামোলী হয়ে চন্দ্রশীলা পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে হবে। এর দূরত্ব উখীমঠ থেকে ২১ মাইল। রুদ্রনাথ (১১,৫০০ ফিট) যেতে হলে তুঙ্গনাথ থেকে গোপেশ্বর মণ্ডল চটি হয়ে ১১ মাইল যেতে হবে। কল্পেশ্বর যেতে হলে যেতে হবে যোশীমঠ ; ওখান থেকে হেলাং হয়ে নামতে হবে অলকানন্দা নদীর তীরে এবং যেতে হবে ৯ মাইল হাঁটা পথে।

কেদারনাথ যাত্রা বর্তমানে পূর্বের মত দুর্গম নয়। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে বা ডাণ্ডীতে চড়ে কেদারনাথ দর্শন করতে যান। বহু প্রথম শ্রেণীর ধর্মশালা ও হোটেল জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠেছে ; যার ফলে যাত্রীদের আগের মত কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। কেদারনাথের অলৌকিক আকর্ষণ বোধ হয় প্রত্যেক হিন্দুই মনেপ্রাণে অনুভব করেন। আর সেই জন্যই বোধহয় অনাদি-কাল থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী কেদারনাথ দর্শন করে স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর থাকতে চেয়েছেন।

———
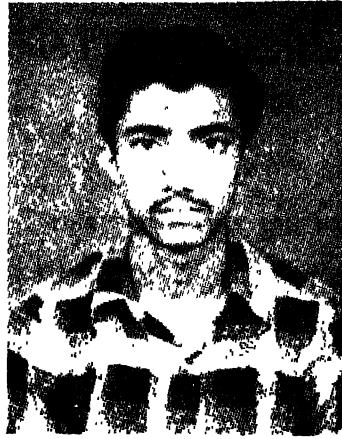
মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৮২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শ্রীমান অভিজিৎ নাথ সপ্তম স্থান (ফলাফল সম্বলিত পুস্তিকায় দেখা গিয়েছিল পঞ্চম) অধিকার করে জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে। ওয়ার্ক-এডুকেশন গ্রুপ বাদে অন্য তিনটি গ্রুপের নম্বর যোগ করলে শ্রীমানের নম্বর সর্বোচ্চ হয়। শ্রীমান চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে এবং ঐচ্ছিক গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর ৯৯ পেয়েছে। শ্রীমান অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং বিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষাতেই সে প্রথম স্থান দখল করে এসেছে।

শ্রীমান অভিজিতের পিতা শ্রীবাদলচন্দ্র নাথ (৫/১৯ গুরু নানক এভিনিউ, দুর্গাপুর, বর্ধমান) দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের একজন কর্মচারী এবং মাতা স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

শ্রীমান অভিজিতের পিতামহ স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ নাথ ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ; তাঁর পূর্বনিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। শ্রীমানের মাতামহ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী। তাঁর বর্তমান নিবাস হুগলী জেলার শ্রীরামপুর।

জাতির গৌরব শ্রীমান অভিজিতের উত্তরোত্তর কৃতিত্ব ও উন্নতির জন্য আমরা পরম মঙ্গলময় শিবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্।
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ ॥ ৩১ ॥

গুরুদেবের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত সাধক কর্তৃক আসন, শয্যা, বস্ত্র, বাহন, ভূষণ (অলঙ্কার) প্রভৃতি প্রদান করা কর্তব্য।

দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরুসন্নিধৌ।
আত্মদারাদিকং সর্ব্বং গুরুবে চ নিবেদয়েৎ ॥ ৩২ ॥

গুরুদেবের নিকট লজ্জা পরিত্যাগ করে দণ্ডবৎ (দীর্ঘ দণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে) প্রণাম করে নিজেকে ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলই গুরুদেবকে নিবেদন করবে।

কৃমি-কীট-ভস্ম-বিষ্ঠা-দুর্গন্ধ-মলমূত্রকম্।
শ্লেষ্ম-রক্ত-ত্বচং মাংসং তনুরিত্থং বরাননে ॥ ৩৩ ॥

হে বরাননে! কৃমি, কীট, ভস্ম, বিষ্ঠা, দুর্গন্ধ, মল ও মূত্র এবং শ্লেষ্মা, রক্ত, ত্বক্ ও মাংস—এই তো দেহ (অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর এই সমস্ত পদার্থের সমষ্টিই তো দেহ)।

সংসারবৃক্ষমারূঢাঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৪ ॥ *

সংসাররূপ বৃক্ষে আরোহণ করে জীব নরকরূপ সমুদ্রে পতিত হয়। যিনি এই বিশ্বকে বা বিশ্ববাসীকে (নরক থেকে) উদ্ধার করেন; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

---

* ৩৪ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৪৯ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত—মোট এই ষোলটি শ্লোককে "শ্রীশ্রীগুরুপ্রণামস্তোত্র"ও বলা হয়। এর প্রতিটি শ্লোক গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দে শিষ্যের ভক্তিবিনম্রচিত্তের সশ্রদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ প্রণতি।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৫ ॥

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেবতা মহেশ্বর, গুরুই পরম ব্রহ্ম; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ (মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন) জীবের চক্ষু যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা উন্মীলিত করে দেন; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৭ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরে (সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) যিনি (ব্রহ্ম) ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁর পদ বা স্বরূপ যিনি দেখিয়ে দেন; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৮ ॥

সমগ্র চরাচরে যিনি স্থাবর (স্থিতিশীল) ও জঙ্গম (গতিশীল) সমস্ত কিছুতেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁর পদ (পরম ব্রহ্মের পদ) যিনি দর্শন করান; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং* ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

পাঠান্তর :— *চিদ্রূপেন পরিব্যাপ্তং।

চিন্ময়রূপে যিনি সমস্ত চরাচরের সঙ্গে ত্রিলোক (ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ অথবা স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল) পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁর পদ (পরম ব্রহ্মের পদ) যিনি দেখিয়ে থাকেন; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

সর্ব্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজঃ*।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যো যস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪০ ॥

পাঠান্তর :— *সমুদ্ভাসিতমূর্ত্তয়ে।

যাঁর শ্রীপাদপদ্ম সকলপ্রকার শ্রুতির (বেদসমূহের) মুকুটমণিতে (উপনিষদ্‌নিচয়ে) শোভমান, যিনি বেদান্তজ্ঞানরূপ পদ্মপ্রকাশে সূর্য-স্বরূপ (অর্থাৎ যাঁর শ্রীচরণকমল বেদ, উপনিষদ ও বেদান্তের সারস্বরূপ); সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তঃ ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪১ ॥*

পাঠান্তর :—'চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, শাশ্বত (নিত্য, অব্যয়), শান্ত (বিক্ষোভরহিত), ব্যোমাতীত (সর্বেন্দ্রিয়াতীত নিষ্কল), নিরঞ্জন (গুণত্রয়রূপ কালুষ্যহীন) এবং বিন্দু (কুণ্ডলিনী), নাদ (প্রণব) ও কলার (দেহান্তর্গত ষট্‌চক্রে শক্তি ও শিবের অধিষ্ঠানভূত সূক্ষ্মক্ষেত্র) অতীত ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব সর্ব্বসম্পন্নঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪২ ॥

যাঁর স্মরণমাত্র জ্ঞান স্বয়ং (নিজে থেকেই) উৎপন্ন হয়, তিনি সর্বসম্পন্ন (সর্বাংশে পরিপূর্ণ) ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

স্থাবরং নির্ম্মলং শান্তং জঙ্গমং স্থিরমেব চ।
ব্যাপ্তং যেন জগৎ সর্ব্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪৩ ॥

যিনি নির্মল (শুদ্ধচিত্ত), শান্ত (বিক্ষোভহীন) ও স্থির (অচঞ্চল), যিনি স্থাবর (স্থিতিশীল) ও জঙ্গম (গতিশীল) সমস্ত জগতেই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪৪ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ শক্তিতে সম্যক্ আরূঢ়, যিনি তত্ত্বরূপ মালার দ্বারা বিভূষিত, যিনি ভুক্তি (ভোগ) ও মুক্তি (মোক্ষ) প্রদান করেন ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত-কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞানপ্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪৫ ॥

আত্মজ্ঞান (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) প্রদান করে যিনি বহু জন্মার্জিত কর্ম-বন্ধন দহন করেন (জন্মজন্মান্তর সঞ্চিত কর্মপাশে আবদ্ধ জীবকে মুক্ত করেন) ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদাম্* ।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪৬ ॥

পাঠান্তর ঃ *সারসম্পদঃ।

যে গুরুদেবের পাদোদক ভবরূপ সমুদ্রের সম্যক্ শোষক এবং (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) সারসম্পদের সম্যক্ জ্ঞাপক ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪৭ ॥

গুরুর (গুরুতত্ত্বের) অধিক কোন তত্ত্ব নেই, গুরুর (গুরুসেবার) অধিক কোন তপস্যা নেই, (গুরু) তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা* সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥ ৪৮ ॥

পাঠান্তর ঃ *মদাত্মা।

যিনি আমার নাথ (প্রভু), তিনিই জগতের নাথ (প্রভু) ; যিনি আমার গুরু, তিনিই জগতের গুরু ; যিনি আমার আত্মা, তিনিই সর্বভূতের (সকল কিছুর) আত্মা ; (সর্বময়) সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্* ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ৪৯ ॥

পাঠান্তর ঃ *পরমদেবতা।

গুরুই আদি বা সকলের মূল কারণ ও অনাদি বা সকল প্রকার কারণহীন (অর্থাৎ গুরুই সমস্ত কিছুর আদি উৎপত্তি-স্থল, কিন্তু তাঁর

আদি কোন উৎস নেই), গুরুই পরম দেবতা, গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই ; সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ৫০ ॥

গুরুর মূর্তিই ধ্যানের মূল, গুরুর চরণই পূজার মূল, গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল এবং গুরুর কৃপাই মোক্ষের বা মুক্তির মূল।

সপ্তসাগরপর্য্যন্ত-তীর্থস্নানাদিকৈঃ ফলম্* ।
গুরোরঙ্ঘ্রিজলবিন্দু** সহস্রাংশেন দুর্ল্লভম্ ॥ ৫১ ॥

পাঠান্তর ঃ *সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্থানফলং তথা,
**জলাদ্ বিন্দু।

সপ্তসাগর পর্যন্ত সমস্ত তীর্থ স্নান করলে যে ফল পাওয়া যায়, তা শ্রীগুরুর পাদোদকের বিন্দুমাত্রের সংস্রাংশের একাংশেরও তুল্য নয় ; এ এতই দুর্লভ।

গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রিদেবাত্মক শ্রীগুরুই সমস্ত জগৎ স্বরূপ। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু কিছুই নেই, সেইজন্য সম্যগ্ভাবে শ্রীগুরুকে পূজা করবে।

জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিণা ॥ ৫৩ ॥

জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) ব্যতীত গুরুভক্তির দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই, গুরুমার্গিগণ কর্তৃক (গুরু উপদিষ্ট পথের অনুসরণকারিগণ কর্তৃক) শ্রীগুরুই পরম ধ্যেয়।

[ক্রমশঃ]

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্রী ৫'-১" সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সুগঠনা B. A. পাশ বয়স ২৬, গানবাজনা জানা প্রাইভেট শিক্ষক, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শ্রীচিন্তাহরণ ভৌমিক, বালী ঘোষ পাড়া নর্থ, পোঃ ঘোষ পাড়া, জিলা—হাওড়া (Near Gasgrid)।

পাত্রী (৫'-৩") বয়স ২২, বি. এস্-সি., পি. জি. পি. টি.। সঙ্গীত প্রভাকর (কণ্ঠ), সুমুখশ্রীযুক্তা, শ্যামবর্ণা, কেন্দ্রীয় সরকারের ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। সুহাস চৌধুরী, ব্লক-আর, (এল, আই. জি.), ফ্ল্যাট—১৫, ৩৭নং বেলগাছিয়া রোড, কলি-৩৭।

পাত্রী (৩৩) উচ্চতা (৫'-২"), দেবগণ, পি. ইউ. বেসিক্ ট্রেনিং পাশ, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা, ফর্সা। উপযুক্ত পাত্র চাই। হরমোহন দেবনাথ, Qrt. No. এ/৭/৩৮২ তালপুকুর, পোঃ—মু রা রী পু র, জিলা—বর্ধমান।

পাত্র (২৮), উচ্চতা (৫'-১০") বি. কম. টুরিজম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনে প্রধান অফিসার (১৪০০ টাকা), স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। ফর্সা, সুন্দরী, স্মার্ট পাত্রী চাই। শ্রীমন্তমোহন নাথ, পোঃ—হাটথুবা, জিঃ—২৪ পরগণা, পিন কোড-৭৪৩২৬৯।

পাত্রী (১৮) মাধ্যমিক পাশ, উচ্চতা (৫'-২"), উজ্জল শ্যামবর্ণা। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা। সরকারী বা ব্যাঙ্কের চাকুরে পাত্র চাই। শ্রীসুনীল বরণ নাথ, ৩৬, কবি ভরতচন্দ্র রোড, ক লি কা তা—৭০০০২৮, ফোন নং ৩৪-২৮৯৩।

পাত্রী (২৬), বি. এ., ফর্সা, সুশ্রী। পিতার একমাত্র সন্তান। কলিকাতার উপকণ্ঠে নিজ বাটী। পূর্ববঙ্গীয় চাকুরীরত উপযুক্ত পাত্র চাই। ব্যাঙ্ককর্মী অ গ্র গ ণ্য। মনোমোহন রায়, ৫/৩০৩, মহাজাতিনগর, পোঃ—আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২৭), উচ্চতা (৫'-৩"), রং ফর্সা, সুন্দরী মুখশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে নিপুণা, পি. ইউ. মান পূর্বনিবাস বিক্রমপুর ঢাকা। সম্ভ্রান্তবংশীয় উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন : পি. এন. ভারতী, ১নং কালীবাড়ী রোড, সন্তোষপুর, কলিকাতা-৭৫।

পাত্রী (২৩) উজ্জল গৌরবর্ণা ও সুন্দরী। উচ্চতা ৫'-৩"। পি. ইউ. অনুত্তীর্ণা গৃহকর্মে নিপুণা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া। সরকারী চাকুরে বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শ্রীমণিমোহন নাথ, টাইপ ২ ৯৫, উল্টাডাঙ্গা সি. এণ্ড টি. কোয়ার্টার্স কলিকাতা-৭০০০৬৭।

পাত্রী (২১) মাধ্যমিক পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী। দাদারা ইঞ্জিনিয়ার-ব্যাঙ্ককর্মী, সম্ভ্রান্ত বংশ। প্রবাসীও চলিবে। উপার্জনক্ষম শিক্ষিত পাত্র চাই। N. K. Sarkar, Bank of India, Mael / Ramgarh Project Branch, P. O. Ramgarh Project, Dist.-Hazaribagh, Bihar-825101

প্রথম পাত্রী এম. এ. পাশ, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা উত্তরপ্রদেশে কর্মরতা। দ্বিতীয়—এম.এ. পাশ, তৃতীয়—এম.এ. পাঠরতা। তিন-জনের জন্যই উপযুক্ত উপার্জনশীল পাত্র চাই। গোপাল দেবনাথ প্রযত্নে সুভাষচন্দ্র পোদ্দার, পশ্চিম মায়াপুর, নিমাইনগর, পোঃ-নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া।

পাত্র (২৬), বি. কম. পাশ, সরকারী চাকুরীরত। ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই।

এবং

পাত্র (২১), বি. কম. পাশ, শিক্ষকতা করে। ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। শ্রীঅনিলবরণ নাথ, ৫৩৮, কে. বি. এম কলোনী, চাকদহ, নদীয়া।

বিঃ দ্রঃ পাত্র-পাত্রী বিভাগে বিবাহের বিজ্ঞাপনের হার পাঁচ লাইন পর্যন্ত পাঁচ টাকা। পরবর্তী প্রতি লাইনের জন্য এক টাকা।

শারদীয়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ | ৫ম সংখ্যা | আশ্বিন ১৩৮৯

সম্পাদক—সুবোধকুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

সংবাদ

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ মৈথিলী বিশ্ববিদ্যাপীঠ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মিথিলাপুরী (দারভাঙ্গা) ডঃ কল্যাণী মল্লিককে মহামহোপাধ্যায় সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। —সাধারণ সম্পাদক

বিজ্ঞপ্তি

অনেক লেখক-লেখিকার লেখা মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও শারদীয়া সংখ্যায় স্থানাভাবের দরুণ তাদের লেখা ছাপা সম্ভব হ'ল না। সেইজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা "দেওয়ালী সংখ্যা" হিসেবে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বাকী মনোনীত লেখাগুলি উক্ত "দেওয়ালী সংখ্যা"য় যথাসম্ভব প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ-স্তোত্রম্

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেহতিরম্যে জ্যোতির্ম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥
শ্রীশৈলসঙ্গে বিধুধাতিসঙ্গে তুলাদ্রিতুঙ্গেহপি মুদা বসন্তম্।
তমর্জ্জুনং মল্লিকপূর্ব্বমেকং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্॥
অবন্তিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্।
অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকাল মহাসুরেশম॥
কাবেরিকানর্ম্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমেসজ্জনতারণায়।
সদৈব মান্ধাতৃপুরে বসন্তং ওঙ্কারমীশং শিবমেকমীড়ে॥
পূর্ব্বোত্তরে প্রজ্বালিকানিধানে সদাবসন্তং গিরিজাসমেতম্।
সুরাসুরারাধিপতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্যনাথং তমহং নমামি॥
যাম্যেসদঙ্গেনগরেহতিরম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদবীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে॥
মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমন্তং সংপূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রৈঃ।
সুরাসুরৈর্যক্ষমহোরগাদ্যৈঃ কেদারমীশং শিবমেকমীড়ে॥
সহ্যাদ্রিশীর্ষে বিমলে বসন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে।
যদ্দর্শনাৎ পাতকমাশু নাশং প্রয়াতি তং ত্র্যম্বকমীশমীড়ে॥
সুতাম্রপর্ণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং বিশিখৈরসংখ্যৈঃ।
শ্রীরামচন্দ্রেণ সমর্পিতং তং রামেশ্বরাখ্যং নিয়তং নমামি॥
যং ডাকিনীশাকিনিকাসমাজে নিষেব্যমাণং পিশিতাশনৈশ্চ।
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি॥
সানন্দমানন্দবনে বসন্তমানন্দকন্দং হৃতপাপবৃন্দম্।
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে॥
ইলাপুরে রম্যবিশালকেহস্মিন্ সমুল্লসন্তঞ্চ জগদ্বরেণ্যম্।
বন্দে মহোদারতরস্বভাবং ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে॥
জ্যোতির্ম্ময়দ্বাদশলিঙ্গকানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ।
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজোহতিভক্ত্যা ফলং তদালোক্য নিজং ভজেচ্চ॥

ইতি শ্রীদ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

দুর্গা-স্তবরাজঃ

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তরনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমশ্চণ্ডিকে দণ্ডোদ্দণ্ডলীলালসংখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবী দুর্গে প্রসাদ॥
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধার হেতুকম্।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ॥
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সমস্ত শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা॥
স সর্ব্বদুষ্কৃতিং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।
পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥

ইতি শ্রীবিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গা-স্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে জগজ্জননী মহাদেবীর আগমনীসুর বেজে চলেছে। অচিরেই অনুষ্ঠিত হবে বাঙালী-হিন্দুর সবচেয়ে বড়ো উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে।

পুরাণ-মতে দুর্গাপূজা বসন্তকালের চৈত্রমাসে করার কথা। কিন্তু রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণবধের উদ্দেশ্যে শরৎকালে অকালবোধন করে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মনে হয়, সেই সূত্র ধরেই বাংলাদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়। শরৎকালের দুর্গাপূজা শারদীয়া পূজা এবং বসন্তকালের দুর্গাপূজা বাসন্তীপূজা নামে খ্যাত হয়। তবে দুর্গাপূজা বলতে বাঙালীমাত্রেই বুঝে থাকে শারদীয়াপূজাকেই।

দুর্গাপূজায় আদ্যাশক্তির যে মূর্তির পূজা করা হয় তা হচ্ছে মহিষমর্দিনীমূর্তি। মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবতারা যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, মহিষাসুরের মর্দন দেবতাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য যখন একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তখন সকল দেবতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলের শক্তিকে করলেন সংহত। দেবতাদের সেই সংহত-শক্তিই দেবীমূর্তি ধারণ করলেন। এই মহাদেবীই মহিষাসুরকে দমন করে দেবতাদের অস্তিত্ব রক্ষা করলেন, দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাই তিনি মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হলেন।

আদিদেব হচ্ছেন মহাদেব শিব আর আদ্যাদেবী হচ্ছেন মহাদেবী আদ্যাশক্তি। মহাদেব শিবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হয়েছেন; তিনিই হয়েছেন সকল দেবতা। আবার আদ্যাশক্তি মহাদেবীই হয়েছেন সরস্বতী, লক্ষ্মী, রুদ্রাণী ; তিনিই হয়েছেন সকল দেবতার সকল শক্তি। সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি সকল দেবতা ঐক্যবদ্ধ হলেই মহাদেব

শিবের আবির্ভাব ঘটে; সেই শিবের মধ্যে সকল-দুর্গতি-নাশের সংসঙ্কল্প জাগ্রত হয়; মহাসম্মিলন ঘটে সকল দেবতার সকল শক্তির; সকল দুর্গতিনাশের জন্য আবির্ভূতা হন আদ্যাশক্তি মহাদেবী দুর্গা। তাই তো 'শিবে সর্বার্থ সাধিকে' মহাদেবী দুর্গা শিবের ঘরণী। এই মহাদেবী দুর্গাই আবার সকল মানব বা নরেরও পরম অয়নী বা আশ্রয়। তাই তো তিনি নারায়ণী।

দেব, মানব ও দানব এই তিনটি শব্দের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। যে সত্তা অপর সকলের স্বার্থকে রক্ষার জন্য নিজ-স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে কুণ্ঠিত নয় তাই দেব-সত্তা, আর যে সত্তা অপর সকলের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে নিজ স্বার্থকে রক্ষা করতে চায় তাই দানব-সত্তা নামে কথিত। দেব-সত্তা ও দানব-সত্তার মাঝামাঝি হচ্ছে মানব-সত্তা। মানব-সত্তা চায় অপর সকলের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে নিজ স্বার্থকে রক্ষা করতে।

দেব-সত্তা ও দানব-সত্তার নিয়ত সংগ্রাম চলেছে প্রতিটি মানবের মধ্যে. এই সংগ্রাম নিয়ত চলেছে জগৎ-সংসারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

মানব-সত্তা আসলে দেব-সত্তা ও দানব-সত্তার সহাবস্থান। দানব-সত্তার প্রাধান্যে মানব দানবে পরিণত হয়; দেব-সত্তার প্রাধান্যে সেই মানবই আবার দেবতায় উন্নীত হয়।

আজ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দানব-সত্তার কাছে দেব-সত্তা পরাজিত; দানবের অন্যায় অত্যাচারে দেবসকলের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই বুঝি জগজ্জননী মহাদেবী দুর্গার প্রকৃত বোধনের সঠিক সময় সমাগত। এই প্রকৃত-বোধনের জন্য প্রয়োজন সকল দেবতার মহান ঐক্য। সকল দেবতার মহান ঐক্য সাধিত হলেই দেবশক্তিসমূহের মহাসম্মিলন সংঘটিত হবে; আবির্ভূতা হবেন দেবাদিদেব মহাদেব শিবের আদ্যাশক্তি মহাদেবী দুর্গা; মহাদেবী দুর্গা সকল দুর্গতি বিনাশ করবেন, দানবকে অবদমিত করে দেবতা সকলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন; জগৎ-সংসার হবে আনন্দমুখর।

তাই আসুন, আমরা যাঁরা মানব-সত্তার অধিকারী তাঁরা আজকের এই শারদীয়া-দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাতে ঐকান্তিক কামনা জানাই— সকল দেবতা ঐক্যবদ্ধ হোক ; সকল দেবশক্তির মহাসম্মিলন ঘটুক ; মহাদেবী দুর্গা-দুর্গতিনাশিনীর সার্থক বোধন অনুষ্ঠিত হোক ; দানবের অবদমনের মধ্য দিয়ে সকল দেবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক ; আনন্দমুখর জগৎ-সংসারে সকল মানবের সম্মিলিতকণ্ঠে ধ্বনিত হোক জগজ্জননী মহাদেবীর প্রণাম মন্ত্র ঃ

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

———

সাকার ও নিরাকার আরাধনা

ডঃ কল্যাণী মল্লিক

ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই ঈশ্বরকে কোন না কোন রূপে উপলব্ধি করতে চান, উদ্দেশ্য নিজের শান্তিলাভ। কথায় বলে 'যত মত তত পথ', আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে নানাজাতি নানাধর্মের সমন্বয় দেখা যায়। বঙ্গ বিহার উৎকল মাদ্রাজ তামিলনাড়ু পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র নেপাল বোম্বাই গুর্জর রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে নানাজাতির সমাবেশ—হিন্দু পার্সী বৌদ্ধ জৈন ইসাহী শিখ্ মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের প্রচারস্থল আর সহাবস্থানের ক্ষেত্র আমাদের এই হিন্দুস্থান!

বিভিন্ন ভাষায় এই সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার কথা শোনা যায় ও তাঁদের ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কেহ বা করেন সাকার রূপ মূর্তির আরাধনা, কেহ বা করেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা, আবার পার্শীরা হলেন অনির্বাণ অগ্নির উপাসক। পথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলের অন্তিম কামনা এক, অর্থাৎ ভগবৎ বা আত্ম উপলব্ধি। যেমন একটি পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে হলে আরোহণকারীরা বিভিন্ন পথে আরোহণ শুরু করলেও অন্তিমে সেই একই শীর্ষে সকলে পৌঁছান সেইরূপ।

সেই পরমদেবতা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রাপ্তির উপায় মন বুদ্ধির অতীত। তাই সাধক বলেছেন

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ তৈ. উপ. ২।৯

একাধারে বিশ্বরূপ ও বিশ্বোত্তীর্ণ, অখণ্ড পরিপূর্ণ রূপ যাঁহার তাঁকে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে সাধক প্রতিনিবৃত্ত হয়ে বলেন তিনি অপ্রাপ্য। তিনিই 'সত্য' স্বরূপ। কবীরাদি সন্ত মতে 'সত্য' সগুণ নির্গুণের অতীত। তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় হলেও, কদাপি দুর্জ্ঞেয় নহেন।

সাকার সাধকেরা মানবকল্যাণার্থে শিব, বিষ্ণু, কালী প্রভৃতি মূর্তির সাহায্যে উপলব্ধির নির্দেশ দেন খৃষ্টানরা যীশুকে, মুসলমানেরা মহম্মদকে

উপলব্ধি করে তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। যীশু ও মহম্মদ উভয়েই মহামানব, তাই দেখা যায় যীশুও তার পিতাকে আরাধনা করার কথা বলেছেন।

অপরপক্ষে নিরাকার সাধকেরা মূর্তি ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী। কেহ বা 'ব্রহ্ম' কেহ বা 'আত্মা' নামে সাধনের পন্থা নির্ণয় করেন। ব্রহ্মের কোন রূপ নেই, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার্য -- যেমন বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাইনা, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করি বাতাস ছাড়া আমাদের এক মূহুর্তও জীবন ধারণ সম্ভব নয়, একথা সকলেই জানি ও বুঝি। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক কৃষ্ণবিহারী সেন বলেছেন মানুষের গুণ তো আমরা চোখে দেখিনা, অনুভব করি, তেমনি ব্রহ্মের অস্তিত্বও স্বাকার্য্য।

এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কেউ আছেন একথা একমাত্র নাস্তিক ছাড়া সকলেই স্বীকার করেন। তাঁকে সাকার রূপে আরাধনা কঠিন নয়, কিন্তু নিরাকার? ব্রহ্ম নিরাকার এ ধারণা কি সহজসাধ্য? প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পরমশ্রদ্ধেয় ডঃ ডি. এম. মল্লিক মহাশয়, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ্ এই প্রসঙ্গে আমাকে বুঝিয়ে দেন প্রথম ত্রিভুজের ধারণা করতে হলে কাগজ কলম নিয়ে বসি মুখে বলি Let ABC be a triangle এবং এঁকে অক্ষর বসিয়ে বুঝে নেবার পরে আর কাগজকলম বা আঁকার দরকার হয় না, মুখে উচ্চারণ করলেই ত্রিভুজের রূপ মনে ভেসে ওঠে, এটা বারবার অভ্যাসের ফল। তেমনি ব্রহ্মের নিরাকার ধারণা, অভ্যাস ও চেষ্টার ফল। এটা ১৯২৮ সালে রংপুরে থাকার সময়ের ঘটনা।

তবুও আমার সমস্যা থেকে যায়, আমার সন্তানদের কি করে বোঝাব ঈশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীর বিশিষ্ট নন্ অথচ তিনি ঈশ্বর? তাঁকে স্মরণ মনন করতে হবে, সৃষ্টিহীন রূপে?

আকস্মিকভাবে ১৯৩৪ সালে কার্সিয়াং পাহাড়ে দর্শন পাই শ্রীমৎ স্বামী ধর্মমেঘ আরণ্যের, সাধনার ফল স্বরূপ তিনি তখন দিব্যকান্তিধারী,

আমার সমস্যার কথা বলতে স্মিতহাস্যে বল্লেন "মানুষের যা থেকে আসল সুখ ও শান্তি হয় তাকে বলে 'ধর্ম', অধর্মের সুখ ক্ষণস্থায়ী, যেমন চোর চুরি করে ধনরত্ন পেয়ে আনন্দ করে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে মনে শান্তি পায় না, তাই তার সুখ আসল সুখ নয়।" সন্তানদের ধর্ম শিক্ষা দেবার সম্বন্ধে বলেন ধর্মকে পাঁচটি যম, পাঁচটি নিয়ম, দয়া ও দান এই বার ভাগ করা যায়। যম যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। নিয়ম যথা—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলেন। এ ছাড়া দয়া ও দান; সেক্ষেত্রে অনেক টাকা দানের চেয়ে স্থল বিশেষে 'দয়া'-র স্থান বড়। সন্তানদের ছোট থেকে এ সব শিক্ষা দিলে বড় হলে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবেই, লোকাচার বা বাধাবাধি অনুষ্ঠানে তা সম্ভব নয়।

যম-নিয়মের মার্জিত অবস্থাই চিত্তের স্থিরতা। যথা 'সত্য' কথা বলা, সত্য চিন্তা করা, দেখা যায় বাক্যাশ্রিত চিন্তা কিছু না কিছু দ্বারা প্রলিপ্ত, এই বোধের ফলে এক সময়ে মনে মনে কথা বলাও হেয় মনে হবে, অবশেষে ধ্যানধারণাতেই সত্যের সমাপ্তি হবে। 'অহিংসা' সম্বন্ধেও এক সময়ে মনে হবে দেহধারণই হিংসামূলক। জৈন সম্প্রদায় অহিংসা বিষয়ে সদাই সচেতন, তাঁদের ধর্মে ও আচরণে নানাবিধ নিষেধ দেখা যায়। এ সকল সাধন বয়স ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ; ব্যক্তিগত অনুভূতি পরবর্ত্তীকালে ধর্মজীবনের পথ নির্দেশ করে দেয় এ আমাদের জানা কথা। বাল্যকালে যাহার আদি, প্রৌঢ়ত্বে তাহার অন্ত, বার্দ্ধক্যে তাহাই আমাদের আশ্রয়স্থল। সে সাধন মূর্তিকে ঈশ্বরের আদর্শ করে হোক্ বা অমূর্ত ব্রহ্মের আদর্শ গ্রহণ করে হোক।

মূর্ত্তি সম্বন্ধে বলা চলে বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের নানাবিধ অনুষ্ঠান ছিল কিন্তু কোন মূর্ত্তির প্রচলন ছিল না। বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের বহু বৎসর পরে তাঁর মূর্ত্তি ক্ষোদিত হয়। যীশুর প্রয়াণের সহস্রাধিক বৎসর পরে তাঁর চিত্র অঙ্কিত হয়, অতএব সাদৃশ্য সন্দেহাতীত নহে।

তবে মূর্ত্তি বা চিত্রের সার্থকতা কোথায়? উহাদের ধ্যানস্থ নির্লিপ্ত

ভাবটুকুই প্রধান, তাহাই সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করা সাধকের কর্তব্য। সেই স্থৈর্য্য নিজেদের জীবনে এলে তা যেন চরিত্রগত হয়, এই কাম্য। এই উপলব্ধি অভ্যাসের দ্বারা লভ্য, ইহার পর মূর্ত্তি অনাবশ্যক।

প্রথম অধিকারীর পক্ষে মূর্ত্তি বা সাকার আরাধনাই সহজ। আকারযুক্ত সবই পরিবর্তনশীল ও নশ্বর এ মনে রেখে, বিচার ও ভক্তির সঙ্গে নিরাকারের সাধন কর্তব্য। যেমন গাছের গুঁড়ি ও ডগায় ব্যবধান থাকলেও উহারা একান্ত পৃথক নহে, তেমনি সাকার ও নিরাকার আরাধনা। সম্পূর্ণ নিরাকার উপলব্ধি চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে সম্ভব হয়, ইহা কঠিন সাধনার বিষয়।

এই দৃশ্য বাহ্যজগৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন (ছাঃ উপঃ ৩।১৪) ইহা নিশ্চিত। সাধক ইহা স্মরণ রাখিয়া ক্রমশঃ নির্গুণ ব্রহ্ম বা আত্ম-উপলব্ধির ধ্যান করেন, তাঁহার সাধন পথে জ্যোতি, নাদ প্রভৃতি অবলম্বনস্বরূপ মাত্র। ওঁকার বা প্রণব সাধন দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করে রাখার অভ্যাস কর্তব্য, এইভাবে একদিন উপলব্ধি হয় বিশ্বমাঝে সাধক যাঁকে খুঁজে পান নাই, তিনি স্বীয় হৃদয়মধ্যেই বিরাজিত। গীতাতে আছে একাক্ষর ওঁকার উচ্চারণ পূর্বক যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি লাভ করেন। (৮।১৩) তাই তিনি 'ওঁকারেতে আদি হোক্ অন্ত তাহাতেই' সাধনের আদর্শ।

জীবই শিব, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্মস্বরূপ। রামানুজ মতে অগ্নি ও অগ্নিশিখার যেমন সম্বন্ধ, ব্রহ্ম জীবে তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ঈশ্বরের পাঞ্চভৌতিক অনিত্যরূপ বিকারী ও বিনাশী ; আবার ইন্দ্রিয়াতীতরূপ দেশকালের অতীত অবিনাশী ও নিত্য। যিনি যে ভাবে তাঁর আরাধনা করেন শ্রীভগবান তাঁকে সেরূপে দেখা দেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব, ভজাম্যহং।" শ্রীরাধা পাঞ্চভৌতিক রূপে তাঁর দর্শন পান। অপরপক্ষে মীরাবাঈ-এর বা চৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণ সাধনা দেহাতীত সাধন। যোগীরা নিরাকার রূপে তাঁকে উপলব্ধি করেন। সাকার ও নিরাকার সাধনে ইহাই প্রভেদ।

সিদ্ধমতে 'আত্মা' সদাশিব, এই দেহ দেবালয়, তন্ত্রসাধনে তাই দেহকে শুদ্ধ করার নির্দেশ আছে। সম্প্রতি জানা গেছে কৈলাস-মানস সরোবর অঞ্চলে যে তিনটি হিন্দু মন্দির আছে, তাহাতে শিবলিঙ্গ, ও দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথির পাণ্ডুলিপি আছে। তন্মধ্যে 'খোচরনাথ' তন্ত্র শিক্ষার স্থান ছিল, এই মন্দির এক সময়ে 'গুরু গোরক্ষনাথের বাসস্থান ছিল। জনৈক চৈনিক সরকারী কর্মচারী এই সকল তথ্য জানিয়েছেন। (আনন্দবাজার ৩০শে ভাদ্র ১৩৮৯, ইং ১৬।৯।৮২)।

নাথ সিদ্ধগণের সাধনপ্রণালীতে দেহসংযম ও চিত্ত বৃত্তি নিরোধের দ্বারা কায়াসাধন অর্থাৎ দেহশুদ্ধির বিশিষ্ট স্থান আছে। বিদেশিনী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলও দেহকে Temple of God বলেছেন। তাই আমাদের নিত্য স্মরণ কর্তব্য।

'দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্ত আত্মা দেবঃ সদাশিবঃ
ত্যজেদজ্ঞান নির্মাল্যং সোঽহম্ভাবেন পূজয়েৎ'

নির্মাল্য নিবেদিত হয়ে পরিত্যক্ত হয়, সেজন্য অজ্ঞানরূপ নির্মাল্য ত্যাগ করে সোহহংভাবে আত্ম উপলব্ধি করা শ্রেয়ঃ। অতঃপর—

যো যেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধীতে বনস্পতিতে এবং যিনি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার করে, সর্বত্র তাঁকে উপলব্ধি করা কর্তব্য।

'ওঁ' ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ, 'তৎ' তাহার নির্গুণ স্বরূপ, 'সৎ' অর্থাৎ সত্য বা ব্রহ্ম। তাই নির্গুণ ব্রহ্মের সাধকেরা তাঁকে আরাধনার অন্তে বলেন

"ওঁ তৎ সৎ"

সম্রাট মৃতকনাথ

ডক্টর এন. সি. নাথ
অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

মৃতকনাথ নামে কোন সম্রাটের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসে পাওয়া না গেলেই যে অসত্য হইবে এমনও কোন কথা নয়। কেন না অতীতের অন্ধকারে বহু রাজা মহারাজা, বহু কাহিনী-ই অদ্যাপি লুক্কায়িত; ভবিষ্যৎ গবেষণায় ইহাদের উদ্‌ঘাটন হইবে। আবার ইতিহাসে থাকিলেও অনেক সময় বাস্তবে তাহা না, থাকিতে পারে, অর্থাৎ ইতিহাসও ভুল লিখিত হয়। কারণ ইতিহাস অপৌরুষেয় নয়; ইহা মানুষে লেখে এবং মানুষ অভ্রান্ত নহে। যথেষ্ট উপাদান বা তথ্যের অভাবে, কখনও বা পক্ষপাতদুষ্টতা বশতঃ, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়া থাকে।

মৃতকনাথ ইতিহাসে নাই একথাও বলা যায় না, কারণ ইনি ইতিহাসে অন্য নামে পরিচিত। এই দুই নাম যে একই ব্যক্তির তাহাই অদ্যকার আলোচ্য।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের নাসিক হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে ত্রিম্বক নামক স্থানে নাথ যোগীদের একটি মঠ আছে। উহা পশ্চিমঘাট পর্বতের সানুদেশে, গোদাবরীর উৎসমুখে অবস্থিত। মঠের অধীনে প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। এই সম্পত্তি নাকি পেশোয়াগণের দান। মঠের সম্মুখভাগে শিলা-নির্মিত ভৈরবমূর্তি। ভৈরবের চক্ষুদ্বয় রৌপ্যময়। স্থানটি পতাকা ও ত্রিশূল খচিত। তিনদিকে সমাধি ক্ষেত্র। অদূরে পর্বত গুহায় গোরক্ষনাথের অনুচ্চ পাষাণ মূর্তি আছে। উচ্চতা প্রায় ১৫ ইঞ্চি। ব্রিগস্ সাহেব এই মঠ দর্শন করিয়াছিলেন।[১] তিনি তথায়

১। তংকৃত গ্রন্থ—Gorakhnath and the Kanphata Yogis. P. 121 দ্রষ্টব্য।

কয়েকজন আওঘর[১], নর্বদনাথ নামক জনৈক কানফাটা যোগী এবং একজন রমতা[২] রাওল[৩] যোগী দেখিয়াছিলেন।

এই মঠের উল্লিখিত সমাধি ক্ষেত্রে সম্রাট মৃতকনাথের প্রস্তরময় সমাধি আছে।

ত্রিম্বক মঠে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, উক্ত সম্রাট গোরক্ষনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন না। তাই অন্য যোগীরা তাঁহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে

১। =নবদীক্ষিত যোগী, যিনি এখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই এবং যাহার কর্ণবেধ হয় নাই; ফলে গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনও করিতে পারেন; ব্রহ্মচারীও বলা যায়।

২। =পরিব্রাজক, পর্যটক; 'রম্‌তা সাধু ঔর বহ্‌তা পানী' দূষিত হয় না।

৩। 'The Rawals, are great wanderers' (Briggs, P. 66) (= রাওল যোগীরা বিখ্যাত পর্যটক)। 'রাওল' (< রাজকুল) এক বিখ্যাত যোগী সম্প্রদায়। হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী লিখিয়াছেন—'রাওল শাখা যোগীওঁকা এক বড়া ভারী সম্প্রদায় হ্যায়। ভারতবর্ষকে তীন তীন রাজবংশনে যহ বিরুদ ধারণ কিয়া হ্যায়—দিল্লীকে চৌহান বংশ, রাজস্থানকে মেবার রাজবংশ এবং গুজরাতকে পারমার বংশ'। (তংকৃত হিন্দী গ্রন্থ—নাথ সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য) (=রাওল শাখা যোগীদের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের তিন তিনটি রাজবংশ এই উপাধি ধারণ করিয়াছেন—দিল্লীর চৌহান বংশ, রাজস্থানের মেবার এবং গুজরাটের পারমার বংশ)। রাওল হইতে রাও এবং সম্ভবতঃ রায় আসিয়াছে। মেবারের আদিপুরুষ মহারাজ বাপ্পাদিত্য নাথধর্মে দীক্ষিত হইয়া বাপ্পা-রাওল এবং বাপ্পা-রাও নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 'রাণা' শব্দও সম্ভবতঃ তজ্জাত। প্রাণসঙ্গলী গ্রন্থে আছে—'কওন যোগী, কওন রাওল; কওন ধান, কওন চাউল' (কে যোগী, কে রাওল যোগী; কোনটি ধান আর কোনটি চাউল······)। এখানে যোগীকে ধান এবং রাওল যোগীকে চাউলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেও রাওল যোগীর গুরুত্ব উপলব্ধি হয়।

চাহিতেন না। * ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল না; কিন্তু আহারাভাবে দেহ তখন কঙ্কালসার। তিনি ব্যুত্থিত হইলেন। ভূগর্ভ সমাধি মন্দির হইতে জীব জগতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার দেহে মেদ মাংস সঞ্চারিত হইল। তখন গুরু আদেশ করিলেন—'যোগীদের জন্য আহার্য্য রন্ধন কর' তিনি রন্ধন কার্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল—রন্ধন সুষ্ঠু নিষ্পন্ন হইল কিনা পরীক্ষা কর্তব্য। তিনি খাদ্যাংশ মুখে দিলেন। যোগীরা ইহা অবগত হইয়া ঐ পক্কান্ন উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শাস্তি স্বরূপ উক্ত অন্ন সমেত ভাণ্ডটি তাহার মস্তকে স্থাপিত

* শৈব-নাথ-সম্প্রদায়ের দুইটি বংশ—(১) বিন্দু-বংশ ও (২) নাদ-বংশ। বিন্দু-বংশ পিতা-পুত্র-ক্রমে এবং নাদ-বংশ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রসারিত হইয়াছিল। বিন্দু-বংশের গৃহস্থগণ 'যোগী-ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজব্রাহ্মণ' নামে এবং নাদ-বংশের সন্ন্যাসীগণ 'যোগী' নামে পরিচিত ছিলেন। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় প্রকার নাথ-গুরুর নিকট হইতেই হিন্দু-গৃহস্থ মাত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন; তবে রুদ্রজব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য গৃহস্থগণ 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে পারিতেন না। পরবর্তীকালে অবশ্য পদবী ব্যবহারের এই বিধি-নিষেধ কিছুটা শিথিল হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সন্ন্যাসী-নাথ-গুরুগণই সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে পারিতেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সন্ন্যাসী-নাথ-গুরুর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'নাথ' পদবী ব্যবহার করিতে পারিতেন; তবে অনেক সময় হিন্দু ভিন্ন অন্য-ধর্ম হইতে আগত সন্ন্যাসী-যোগীগণ হিন্দু-ধর্ম হইতে আগত সাধারণ সন্ন্যাসী-যোগিগণের নিকট সমমর্যাদা লাভ করিতেন না। —সম্পাদক

হইল। তিনি স্থান ত্যাগ করতঃ পুনা অভিমুখে গমন করেন। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় অদ্যাপি পুনাতে বসবাস করিতেছে। ইহাদিগকে "হাণ্ডী পরং নাথ" বলে।

সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার পর সম্রাট 'মৃতকনাথ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। অন্ন ভাণ্ড মস্তকে ধৃত হওয়ায় তাঁহাকে 'সিদ্ধ হাণ্ডী পরং নাথ'ও বলা হইয়াছে।

ত্রিম্বক মঠের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি হইতে অনুমিত হয়, শেষ জীবনে তিনি ত্রিম্বকে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

এই সম্রাট মৃতকনাথ কে ?

ইনি বিখ্যাত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব।

আপনারা হয়তঃ শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ইতিহাসের পর্য্যালোচনায় ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। আর ইতিহাস যে চিরদিনই নূতন আবিষ্কারের অপেক্ষায় অংশতঃ অসম্পূর্ণ একথাও উপরে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমানের ঘটনাবলী সম্পর্কেই আমরা কি সম্পূর্ণ অবহিত বলিতে পারি ? আমাদের সংবাদের উৎস পত্র-পত্রিকা ; পত্র-পত্রিকার উৎস পত্রিকার সংবাদদাতারা ; সংবাদদাতার উৎস স্বমতাবলম্বী কিছুলোকের উক্তি। কাজেই প্রকৃত ঘটনা যে কি তাহা নানা ঘাট ঘুরিয়া আসা সংবাদ হইতে নিশ্চিত অবগত হওয়া দুষ্কর। এই জন্যই একই ঘটনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সংবাদও পাওয়া যায়। জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যুর পূর্বেই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি মৃত,[১] এই প্রচারের জন্য কোন বিশিষ্ট নেতাকে পরে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। এই জীবন্ত বর্তমানেই যখন ইতিহাসের এইরূপ বিকৃতি ঘটে। তখন সুদূর, ম্লান, তমসাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাসের কথা

১। ১৬৫৬ খৃঃ সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে সম্রাট মৃত বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হয় এবং পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সংগ্রাম আরম্ভ হয় (ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। মাখনলাল রায়চৌধুরী কৃত ; পৃ. ৪০১)।

আর কি বলিব? সেখানে পৌঁছিবার মত আমাদের কোন মনুষ্য সংবাদদাতাও নাই। আছে কেবল মূক, নিষ্প্রাণ প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি, জীর্ণ কীটদষ্ট ভূর্জপত্র-তালপত্র-ধৃত পাণ্ডুলিপি, জনশ্রুতি ইত্যাদি, যাহা ভূতকালের ঘনান্ধকার হইতে ভূতার্থ[১] আহরণে পর্য্যাপ্ত বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং নূতন তথ্য আবিষ্কার হইতেই পারে এবং তাহাতে আতঙ্কিত হইলে চলিবে না।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মধ্য ও অন্ত্যলীলা দক্ষিণভারতে। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আওরঙ্গজেব পিতা শাহজাহান কর্তৃক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বা গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৬৪৪ খৃঃ তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৫২ খৃঃ তিনি পুনর্বার দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং ১৬৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত তথায় ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে মোট তের বৎসর তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ তিনি দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন এবং ১৬৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত ২২ বৎসর-কাল দিল্লীতে ছিলেন। তারপর ১৬৮১ খৃঃ ৬২ বৎসর বয়সে দিল্লী ত্যাগ করতঃ শেষবারের মত দাক্ষিণাত্যে গমন করেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৭০৭ খৃঃ) দীর্ঘ ২৬ বৎসর সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৭০৭ খৃঃ আহম্মদনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মরদেহ দিল্লীতে আনীত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের মৃত্তিকাতেই তাঁহার ভৌতিক দেহ বিলীন হইয়াছিল। রায় চৌধুরী মহোদয় লিখিয়াছেন—'দাক্ষিণাত্য কেবল তাঁহার দেহেরই সমাধিক্ষেত্র নহে, কীর্তিরও সমাধিক্ষেত্র'[২]। তবে আওরঙ্গজেবের সমাধি ত্রিম্বক মঠে। ইহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, আওরঙ্গজেব নাথ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন অথবা এই সম্প্রদায়ের সহিত অন্ততঃ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ত্রিম্বক মঠে তিনি সমাহিত তাহা স্বীকারে আর তেমন

১। =সত্য ঘটনা (ভূত=যাহা ঘটিয়াছে+অর্থ=ব্যাপার

২। রায়চৌধুরীকৃত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৩১।

বাধা থাকে না। মোগল রাজবংশের দানপত্রগুলি হইতে দেখা যায় এই বংশের প্রধান চারজনই (আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব) নাথসম্প্রদায়ের মঠ আশ্রমে ভূমিদান এবং অন্যান্য সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে আওরঙ্গজেব পাঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার অন্তর্গত জাখবর নামক স্থানে অবস্থিত নাথ মঠের অধ্যক্ষ আনন্দনাথজীকে "গুরু" সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি পারসী ভাষায় লিখিত। উহা এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে—"পরম পদে অধিষ্ঠিত, শিবমূর্তি, গুরু আনন্দনাথজীও।"[১] ইহা হইতে অনুমিত হয় আওরঙ্গজেব আনন্দনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ত্রিম্বকের প্রবাদ অনুযায়ী গোরক্ষনাথের শিষ্য হওয়া সম্ভব নহে। পত্রখানি ১৬৬১-৬২ খৃঃ লিখিত। ঐ সময় আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে নবাধিষ্ঠিত। সাধু মহাত্মাদের সহিত মোগল সম্রাটগণের অনেকেরই নিগূঢ় যোগাযোগ ছিল। আওরঙ্গজেবেরও থাকিতেই পারে। হুমায়ুন মোহম্মদ গৌস নামক পীরের শিষ্য ছিলেন। আকবর শেখ সেলিম চিস্তির অনুগ্রহভাজন ছিলেন। ফতেপুর শিক্রিতে সেলিম চিস্তির কুটীরে আকবর অন্তঃসত্ত্বা মহিষী যোধবাঈকে প্রসবকাল পর্যন্ত রাখিয়াছিলেন[২]। এই সন্তানই শাহজাদা সেলিম (জাহাঙ্গীর) সেলিমের শৈশব ও কৈশোর জীবন ফতেপুর শিক্রিতেই অতিবাহিত হয়। পরবর্তী কালে জাহাঙ্গীর হিন্দুযোগী বাবালালের সহিত দীর্ঘকাল

১। B. N. Goswami & J. S. Grewal কৃত—The Mughals and the Jogis of Jakhbar, PP. 120-121 দ্রষ্টব্য। বর্তমান লেখক শৈবভারতী পত্রিকায় "মোগলযুগে নাথসম্প্রদায়" শীর্ষক ধারাবাহিক নিবন্ধে ইহা আলোচনা করিয়াছেন এবং ডঃ কল্যাণী মল্লিক মহোদয় রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে (হাওড়া) প্রদত্ত ভাষণে উক্ত নিবন্ধের উল্লেখ করতঃ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

২। আকবর-মহিষীর প্রথম দুই পুত্র সন্তান অকালমৃত্যু বরণ করে। তখন পীর সেলিম চিস্তি এই আশীর্বাদ করেন যে তাঁহার কুটীরে মহিষীর অন্য পুত্র সন্তান জাত হইবে এবং দীর্ঘজীবী হইবে।

নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেন[১]। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা উপনিষদের ফারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন পীর মিঞা মীর। আওরঙ্গজেব নাথযোগের প্রতি অনুরক্ত এবং আনন্দনাথের শিষ্য হইয়া থাকিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। তিনি আনন্দনাথের নিকট হইতে শোধিত পারদ ব্যবহার করিতেন এবং ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভের রহস্য। শুধু পরমায়ু নহে, তিনি অপরিসাম শক্তিরও অধিকারী হইয়াছিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রণাঙ্গণে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন। নাথ যোগ ও রস শাস্ত্র বা রসায়নের অলৌকিক ক্ষমতা হয়তঃ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল ; ফলে তিনি আনন্দনাথজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহা উল্লিখিত পত্র দৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শেষ জীবনে নাথ-গুরুর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর তাহার 'মৃতকনাথ' নামকরণও হইয়া থাকিতে পারে। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস না লইলে নূতন নামকরণ হয় না। অনেক সময় সন্ন্যাস-দীক্ষান্তে নূতন নামকরণ হইলেও সন্ন্যাসশ্রমের বেশভূষা না থাকিলে সেই নূতন নাম প্রচারিত হয় না, পুরাতন নামই চলিতে থাকে। অতি অল্প লোকেই জানেন শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সাম্প্রদায়িক নাম কৈবল্যনাথ। তিনি পূর্বাশ্রমের ডাক নাম "রামঠাকুর" নামেই পরিচিত। কেননা তিনি গৈরিক ধারণ করেন নাই। সাধারণ গৃহীর ন্যায়ই বেশধারী ছিলেন।

নাথমার্গের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের এই সম্বন্ধ স্বীকৃত হইলে ত্রিম্বক মঠের সমাধির প্রশ্ন আর অসাধ্য মনে হইবে না। আহম্মদ নগর হইতে ত্রিম্বকের দূরত্ব ৭০/৭৫ মাইল হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালীন আওরঙ্গজেব এই মঠে যাতায়াত করিয়া থাকিবেন। মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ বা কেশাদিচিহ্ন ঐ স্থানে সমাহিত করিবার

১। রায়চৌধুরী, ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৩৭২।

ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারেন। যদি তাহাই হয় তবে আহম্মদ নগর হইতে ঐটুকু দূরত্বে তাঁহার দেহ (বা তাহার অংশ বিশেষ) দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে বাহিত হওয়া অসম্ভব কিছু নহে। সেই যুগে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃবধূ দারাপত্নী নাদিরাবানু দারার পলায়ন কালে রাজস্থানের থর মরুভূমিতে ক্ষুৎ-তৃষ্ণা-পীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার দেহ কয়েকশত মাইল দূরবর্তী লাহোরে নীত ও সমাহিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনারোহণের জন্য যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ হয় তাহার একটি সংঘটিত হয় হায়দরাবাদের নিকট।[১] উহাতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র কামবক্স এবং কামবক্সের পুত্র ফিরোজমন্দ নিহত হন। তাঁহাদের মৃতদেহ তথা হইতে দিল্লীতে প্রেরিত এবং হুমায়ুনের সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হয়।[২]

আওরঙ্গজেবের সমাধি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিনসেণ্ট স্মিথ্ (Vincent Smith) লিখিয়াছেন[৩]—

His embalmed body was carried to the village of Rauza or Khuldabad near Daulatabad and there laid to rest in holy ground beside the tombs of famous saints...... His tomb is a perfectly plain block of plastered masonry on an open platform.'

অনুবাদ—তাঁহার সুগন্ধি তৈলাদি লিপ্ত দেহ দৌলতাবাদের সন্নিকটবর্তী রৌজা বা খুল্‌দাবাদ নামক গ্রামে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় প্রসিদ্ধ

১। The Cambridge History of India, Vol. IV, P. 321.

২। History of the Great Moghuls by Pringle Kennedy, PP. 476-77; Elliot, Vol. VII, PP. 407-8.

৩। Vincent A. Smith—The Oxford History of India, 3rd. edition, 1970, P. 424; এ প্রসঙ্গে Haig কৃত গ্রন্থ Historic Landmarks of the Deccan, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮ও দ্রষ্টব্য।

সাধু সন্তদের সমাধির পার্শ্বে পুণ্য ভূমিতে সমাধিশয্যায় স্থাপিত হয়। তাঁহার সমাধি স্তম্ভ সম্পূর্ণ কারুকার্যহীন, বাহ্য প্রলেপ সর্বস্ব স্থাপত্য মাত্র এবং উহা উন্মুক্ত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান (অর্থাৎ প্রাচীর বা রেলিং পরিবেষ্টিত নহে)।

Cambridge History of India তে এ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে[১]—"Muhammad Azam Shah returned to Ahmadnagar, and consoling his sister Zinat-un-nisa took part in carrying his coffin for a short distance, and then sent it away to the rauza or sepulchre of the saint Shaikh Zain-ul-Haqq, four miles west of Daulatabad, for burial. This place was named Khuldabad and Aurangzeb was described in official writings by the posthumous title of Khuld-makān."

অনুবাদ—মোহম্মদ আজমশাহ[২] আহম্মদনগরে প্রত্যাবর্তন করতঃ ভগ্নী জিনৎ-উন্নিসা কে সান্ত্বনা দান করিয়া পিতার শবাধার বহনে কিয়দ্দুর পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করিলেন; তারপর কবর দেওয়ার জন্য উহা দৌলতাবাদের চার মাইল পশ্চিমে শেখ জৈনুল হক-এর রৌজা অর্থাৎ গোরস্থানে প্রেরণ করিলেন। এই স্থানের নামকরণ হয় খুল্‌দাবাদ এবং আওরঙ্গজেব সরকারী কাগজপত্রে 'খুলদ্-মকান'[৩] এই মরণোত্তর আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

১। পৃ. ৩০২

২। আওরঙ্গজেবের মধ্যম পুত্র (জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে শাহ আজম বা বাহাদুর শাহ। আজম শাহ এবং কামবক্স)। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে শেষোক্ত দুইজন নিহত হন।

৩। =(১) খুলদাবাদে মকান বা গৃহ (অর্থাৎ গোর) যাঁহার। (২) কাহারও মতে খুলদ্ মানে স্বর্গ কিম্বা অনন্তসত্তা ; সুতরাং সমাসের অর্থ হয় 'স্বর্গবাসী' বা 'অনন্তবাসী'। স্মিথ মহোদয় খুলদাবাদের নামান্তর রৌজা বলিয়াছেন। Cambridge History মতে রৌজা = গোরস্থান।

এই উভয় মতানুসারেই দৌলতাবাদের নিকটবর্ত্তী খুলদাবাদে আওরঙ্গজেবের সমাধি। তবে স্মিথ মহোদয়ের মতে ঐ স্থানে আরও অনেক সাধু মহাত্মার সমাধি ছিল। ইহা চিন্তনীয়। Cambridge History কেবল পীর জৈনুলহকের সমাধির কথা বলিয়াছেন। আরও উল্লেখ্য এই যে, আজমশাহ এই সমাধি দান কালে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কিয়দ্দূর পর্যন্ত শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করতঃ অন্যদের হস্তে ভারার্পণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। ইহারও কারণ অনুসন্ধেয়। খুলদাবাদ (দৌলতাবাদ) ত্রিম্বক এবং আহম্মদনগর পরস্পর হইতে সমদূরত্বে অবস্থিত অর্থাৎ এই তিন বিন্দু যোগ করিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন হইবে। কাজেই আওরঙ্গজেবের সমাধি-রূপে কথিত খুলদাবাদই শেষ কথা নাও হইতে পারে। ত্রিম্বকে অন্ততঃ তাঁহার কেশাদি স্মৃতিচিহ্নেরও সমাধি কল্পিত হইতে পারে, অথবা স্মৃতিমাত্রবাহী শূন্যগর্ভ সমাধিও (cenotaph) থাকিতে পারে। আওরঙ্গজেবের আনন্দনাথের শিষ্যত্ব পক্ষে এই জাতীয় কল্পনা দোষাবহ নহে। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে ত্রিম্বক মঠে একজন সম্রাটের সমাধি বলিয়া একটি সমাধি বাস্তবিকই নির্দিষ্ট আছে। উপরন্তু একজন সম্রাটের নাথান্ত নাম 'মৃতকনাথ'ও এই কল্পনাকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

সম্রাট্ মৃতকনাথ (আওরঙ্গজেব) প্রসঙ্গ আপাততঃ এখানেই শেষ।[১]

১। লেখক এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান চালাইতেছেন। ফলাফল পরবর্তী কোন সংখ্যায় বিবৃত হইবে।

নাথযোগ এবং ভক্তিযোগ

ডক্টর দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী

নাথযোগমার্গের সাধনা ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিযোগ বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তি ও শুদ্ধভক্তি সাধনা—এই দুইটি সাধনমার্গ পরস্পর বিপরীত বলিয়া ধারণা পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এমন কি কোন কোন বৈষ্ণবচার্য্যকে নাথযোগমার্গকে অবৈদিক বলিয়া উক্তি করিতেও দেখা যায়।

কিন্তু মহারাষ্ট্র এবং ওড়িষা প্রদেশের নাথযোগমার্গ অথবা প্রেমভক্তিধারার সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ প্রকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু বহু শতাব্দী হইতে উভয় মার্গের সাধনধারা এমনভাবে পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে যে, উভয় সাধনধারাকে পরস্পর বিরোধী ত' বলাই যায় না, বরং নাথযোগমার্গ যে পরবর্তী বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি ধারার পুষ্টিকারী ভিত্তিদাতা—ইহারই বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ মহারাষ্ট্র ও উৎকল প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষায় প্রাচীন বহু পৌরাণিক উপাখ্যান, লোকগীতি, লোক-কথা ও সামাজিক পূজা-অর্চনার মধ্যে পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে তাহারই কিছু কিছু দৃষ্টান্ত ও বিচার উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

প্রথমেই মহারাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নবনাথ-কথা :

মহারাষ্ট্রে নবনাথ-কথা এক প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে আদিনাথ-মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নবনাথ যে শ্রীমদ্‌ভাগবত একাদশস্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিমি-নবযোগীন্দ্র সংবাদে বর্ণিত কবি-হবি-করভাজন

প্রমুখ নবযোগেন্দ্রের অবতার. তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে নিম্নে তাহারই বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

নবযোগীন্দ্র	নবনাথ
কবি	মৎস্যেন্দ্রনাথ
হবি	ভর্তৃহরি
অন্তরীক্ষ	জালন্ধরী নাথ
প্রবুদ্ধ	কাহ্নুপাদ
পিপ্পালায়ন	চর্পটনাথ, মতান্তরে অচলনাথ
আবির্হোত্র	নাগনাথ
দ্রুমিল (দ্রাবিড়)	গোপীচন্দ্র
চমস	রেবানাথ
করভাজন	গহিনীনাথ

এই নবনাথ-কথার বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করেই ডক্টর হাজারী-প্রসাদ দ্বিবেদী শ্রীমদ্‌ভাগবতের নবযোগীন্দ্র বা নবনারায়ণ কোন কোন নাথ সিদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার উপরে লিখিত তালিকাটি উদ্ধার করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থে ঐ তালিকার কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কোন কোন তালিকায় গোরক্ষনাথের নামও নবনাথের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। আবার মহাযোগী গোরক্ষনাথ ঐ নবনাথযোগীন্দ্র হইতে আরও উচ্চস্তরের অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ শিবের অবতার হিসাবে নবনাথ তালিকায় তার নাম কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত নিমি-নবযোগীন্দ্র সংবাদের অনুসরণে মহারাষ্ট্রের উক্ত নবনাথ-কথা গ্রন্থে নবনাথ সিদ্ধগণের মুখে ভক্তিযোগের সহিত নাথযোগ সাধনমার্গের পন্থা ও তত্ত্ব সমূহে মিশ্রিত হইয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভক্তিসাধনের সহিত যোগসাধনের এই প্রকার অপূর্ব সমন্বয় সাধন অন্যত্র দেখা যায় না। নিম্নে নবনাথকথার কিছু অংশ উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

যখন এইভাবে পরাভক্তিদ্বারা ভগবানে তন্ময়তা জাত হয়, তখন ভগবৎ দর্শন না হইলে 'আমি মন্দভাগ্য, আমাকে ধিক্' বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করে, কখন ভগবান ভক্তবৎসল এবং ভক্তের বশীভূত ভাবিয়া আনন্দিত হইয়া হাস্য করে, কখন আর্তব্যক্তির মত কাতর চিৎকার করে, কখন পরমানন্দে নৃত্য করে, কখন ভগবদ্ ধ্যানে তল্লীন হইয়া জড়ভাব ধারণ করে—

(এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যাতি লোকবাহ্যঃ॥ ভা ১১।২।৪০)

*　　*　　*

তারপরে যোগেশ্বর নাথাধিপ অচলনাথ বলিলেন, হে বিদেহরাজ, ব্রহ্ম এক, সম্বন্ধভেদ ও নানা নামরূপ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা—যে সৃষ্টি করে, সে স্রষ্টা, যে রক্ষা করে, সে গোরক্ষ, যে সংহার করে সে হর, যে ব্যাপক সে বিষ্ণু, যে সাং বা মঙ্গল করে সে শঙ্কর ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য, ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য। শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরাখিবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া জানা যায়। মাধবেন্দ্রপুরীর পরমপরাৎপর গুরু হইতেছেন শ্রীজ্ঞানেশ্বর। জ্ঞানেশ্বরের গুরু নিবৃত্তি নাথ, তাঁর গুরু গহিনী নাথ, তাঁর গুরু শ্রীগোরক্ষনাথ।

এই গুরুপরম্পরাই প্রমাণ করে যে, নাথযোগী এবং ভক্তযোগী এক পরম্পরার অন্তর্গত। কারণ মাধবেন্দ্রপুরীকে 'ভক্তিকল্পলতার মূল' বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর প্রথমে যোগসিদ্ধ হইয়া শেষ-জীবনে ভক্তিকেই সিদ্ধির চরম সোপান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তার সাক্ষ্য তাঁহার রচিত অভঙ্গ ও গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকা।

জ্ঞানেশ্বরদেবের ভক্তিপ্রবণ সাধনমার্গ মুখ্যতঃ গোরক্ষনাথের মৌলিক সিদ্ধান্ত চিদ্‌বিলাস ও দ্বৈতাদ্বৈত বিলক্ষণ সিদ্ধান্তকে অনুসরণ

করিয়াছিল। ঐ সিদ্ধান্তধারাই পরবর্তী গুরু পরম্পরা সূত্রে মাধবেন্দ্র-পুরী তাঁহার পরে তাঁহার দুই শিষ্য রাঘবেন্দ্রপুরী হইতে নিত্যানন্দ অবধূত এবং ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে রূপায়িত হইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতমার্গ বা নাথযোগমার্গের সাধকরূপে প্রথমাবস্থায় পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সেই অবধূত বা নাথযোগীবেশেই শ্রীচৈতন্য-দেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া অবধূতবেশে তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই বেশে বৃন্দাবনধাম হইতে নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন।

'মহা অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড'
বামশ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র
বেত্র-বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর এই প্রকার বেশের বর্ণনা দিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্রেও শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন—

এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে

শ্রীনিত্যানন্দের অবধূতবেশের বর্ণনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পাওয়া যায়—

সুবর্ণ কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদবালা।
রাঙ্গাযষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল

সেই সময় নাথধর্ম সর্বত্র অবধূতমার্গ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 'অবধূত' বলিলেই কেবল নাথধর্ম ধারার সন্ন্যাসীদিগকেই বুঝাইত। তাঁহারা বাহ্যে বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় আচার-ব্যবহার শিথিল করিয়া অন্তরে অত্যন্ত অনাসক্ত বৈরাগ্য এবং ভগবন্নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহারা কোনকালেই বেদবিরোধী ছিলেন না। বস্তুতঃ বেদোক্ত

কর্মকাণ্ডীয় আচার সম্পর্কে নাথমার্গের অবধূত এবং ভক্তিমার্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়—এই উভয় সম্প্রদায় কর্মকাণ্ডীয় আচারকে সাধনরাজ্যে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন না।

বস্তুতঃ নাথযোগ ও ভক্তিযোগের যে সাধন সমন্বয়, জ্ঞানেশ্বরের দ্বারা তাঁহার ভিত্তি হইয়াছিল, তৎপরে নবনাথ নবযোগেন্দ্রের অবতার-রূপে গৃহীত হইয়া ঐ সমন্বয়ের পরিপুষ্টি হইয়াছিল এবং নাথযোগী অবধূত নিত্যানন্দের দ্বারা ঐ সমন্বয় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ ছয় বৎসর দিব্যোন্মাদদশায় কাটিয়াছিল। ঐ বিরহদশায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য শ্রীরাধাভাবে ভাবিত হইয়া যোগধর্ম গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায় প্রেমভক্তিমার্গের সাধকশিরোমণির লীলা অভিনয়কারী শ্রীচৈতন্য নাথযোগ বা অবধূতমার্গকে কত উন্নত ও আদরের সাধনধারা বলিয়া বিচার করিতেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর বিরহদশা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নিম্ন উদ্ধৃতিই সাক্ষ্য দিয়াছে—

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ১৪শ পরিচ্ছেদ)

শুন বান্ধব! কৃষ্ণের মাধুরী
যার লোভে মোর মন　　ছাড়িলেক বেদধর্ম
যোগী হঞা হইল ভিখারী।
কৃষ্ণলীলা মণ্ডল　　শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিগর
সেই কুণ্ডল কাণে পরি　　তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি
আশাঝুলি স্কন্ধের উপর।
চিন্তাকান্থা উড়ে গায়　　ধূলিবিভূতিমলিন কায়
হাহা কৃষ্ণ! প্রলাপ উত্তর
উদ্‌বেগ দ্বাদশ হাতে　　লোভের ঝুলনি মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর।

ব্যাস-শুকাদি যোগিগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছেন বর্ণনে
সেই তর্জা পড়ি অনুক্ষণ।
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহাবাউল নাম ধরি
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন বিষয় ভোগ মহাধন
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম
বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল মূল পত্রাশন
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে।
কৃষ্ণগুণ-রূপ-রস শব্দ-গন্ধ-পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ
তাঁ সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখিল জীবন।
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণে।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ
মন কৃষ্ণবিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়।

মহেশ্বর শিবকে কিভাবে পূজা করেন, তাহারই একটি উদাহরণ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্ব-রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন।

সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান।
সেইক্ষণে সর্বপাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়।
হেন শিব নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয়।
শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে।
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার।

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ)।

এই সমস্ত উদ্ধৃত হইতে শৈব-নাথযোগ সাধনধারা এবং বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি সাধনধারায় যে সমন্বিত যোগসূত্রটি রহিয়াছে, তাহা সৎশাস্ত্র ও শুদ্ধসিদ্ধান্ত সম্মত। পরবর্তী সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধের মধ্যে পড়িয়া এবং উগ্র ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া নাথযোগমার্গ ও বৈষ্ণব সাধনমার্গের সাধকগণ পরস্পরকে বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখিয়াছে মাত্র। ঐ প্রকার আচরণ কিন্তু ভগবৎসাধনার অনুকূল হইতে পারে না। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" এই শাস্ত্রবচনটি উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুশীলনযোগ্য।

———

ভগবৎ-শরণাগতি

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ

শিরোনামে যে প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করার বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই বর্তমান নিবন্ধ লেখকের—প্রথমেই এটি নিবেদন করি। জ্ঞান-ভক্তি বিবেক-বৈরাগ্যহীন, সাধনভজনহীন আমি, বিষয়-মালিন্যে মলিন চিত্ত নিয়ে তবু যে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করতে উদ্যোগী হয়েছি—তার কারণ শুধু একটিই আছে; ভক্তি-শরণাগতি সম্পর্কে ভক্তিশাস্ত্রের এবং আচার্যগণের যে সমস্ত উপদেশ-নির্দেশ রয়েছে সে সকলের কিছু পর্যালোচনা করতে করতে যদি ভক্তি-অনুরাগহীন এই চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও ঐ সব ভাবের বিকাশ ঘটে, যদি চিত্ত দর্পনের কিছু মার্জন হয়, চন্দন ঘস্‌তে ঘস্‌তে যদি একটু সুগন্ধের সন্ধান পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে—এই দুরাশাতেই এমন একটি উন্নত প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়াস।

শ্রীভগবানের রূপগুণ মহিমার অন্ত নেই। শ্রুতি বলেছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সদবস্তু, সত্যবস্তু এক, ঋষিগণ বহুভাবে তাঁকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সর্বশক্তিমান—তিনি তো সবরূপে এবং সবভাবেই স্বয়ং প্রকাশ। আর যিনি যে-ভাবে তাঁকে উপাসনা করবেন—ভগবান সে ভাবেই তাকে অনুগ্রহ করবেন—একথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলেছেন গীতায়—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

এ যুগের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাই বলেছেন—যত মত, তত পথ। আর এই তত্ত্ব বিভিন্ন সাধন প্রণালী অবলম্বন করে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেও গিয়েছেন তিনি, একথা সকলেই জানেন।

নিজ নিজ প্রকৃতি ও সংস্কার বশে মানুষ ঋজু-কুটিল নানাপথে ভগবানকে পেতে চায়। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অনন্ত স্বরূপকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এবং সাধন পন্থাও তিনটি নির্দিষ্ট করেছেন—জ্ঞান, যোগ, ভক্তি।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অননুকরণীয় ভাষায়—

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

অর্থাৎ জ্ঞানের পথে ব্রহ্মোপলব্ধি, যোগের পথে পরমাত্মদর্শন এবং ভক্তি পথে ভগবান প্রাপ্তি। এই তিনটি মার্গের মধ্যে ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়েছে; বিশেষত কলিযুগে ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ বলে আচার্যগণ মনে করেন। একমাত্র ভক্তিই ভগবৎদর্শন করাতে পারে—শাস্ত্রাদিতে তাই দেখা যায়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন 'ভক্ত্যামামভি জানাতি'—ভক্তিদ্বারাই আমাকে সম্যকরূপে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রিয়ভক্ত সুহৃদ উদ্ধবকে বলেছেন তিনি—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥

হে উদ্ধব, আমার প্রতি উর্জিত—একান্ত ভক্তি যেরূপ আমাকে লাভ করিবার উপায়,—যোগ, সাংখ্য-ধর্ম, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), তপস্যা বা ত্যাগ কোনোটিই সেরূপ উপায় নহে।

আরো বলেছেন ভগবান—'ভক্ত্যাহহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্'—সাধুগণের আত্মস্বরূপও প্রিয় আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাদের বশীভূত হই। এখানে 'একয়া' কথাটি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ভগবদপ্রাপ্তি বিষয়ে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব এখানে প্রতিপন্ন। ভক্তির

অনুষ্ঠান দ্বারাই চিত্তমালিন্য দূর হয় এবং ক্রমে চিত্তে ভক্তি গাঢ় হয়ে প্রেমে পরিণত হয় এবং ভগবান সেই প্রেমের বশীভূত হন—আচার্যগণ একথাই বলেন। আর এই ভক্তি সাধন পথে ভগবদশরণাগতি পরম আশ্রয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন ঃ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্॥

আবার বলেছেন ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং তাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িস্যামি মা শুচঃ॥

ভগবান বারবারই আর সব কিছু পরিত্যাগ করে তাঁর শরণ নিতে বলেছেন। স্বভাবতই আমাদের জিজ্ঞাস্য—এই শরণ বা শরণাগতির স্বরূপ কি?

ভক্তিশাস্ত্রে শরণাগতি সম্পর্কে পরম উপাদেয় এবং প্রেরণাদায়ক বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেই সমস্ত শাস্ত্রবচনের দু'য়েকটি নিয়ে আমরা অনুধ্যানের চেষ্টা করি। একান্তভাবে ভগবদচরণে আশ্রয় নেওয়াকেই শরণাগতি বলা হয়েছে—"ভগবৎ চরণ শরণ বরণ রূপা প্রপত্তি।" ভক্তিশাস্ত্র আরো বলেছেন ঃ

অনন্য সাধ্যে স্বাভীষ্টে মহাবিশ্বাস পূর্বকম্।
সদেকোপায়তা যাচ্ঞা প্রপত্তি শরণাগতি॥

অর্থাৎ অনন্য সাধ্য নিজ অভীষ্ট পরমেশ্বরকেই অবিচলিত বিশ্বাস পূর্বক একমাত্র উপায় বলে প্রার্থনাকে প্রপত্তি বা শরণাগতি বলা হয়। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁর প্রণীত হরিভক্তিবিলাসে শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ এইরূপে প্রকাশ করেছেন ঃ

'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রতিকূলস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতি॥'

ভগবানের প্রীতিজনক কার্যে সংকল্প বা প্রবৃত্তি, প্রতিকূল কার্য থেকে

নিবৃত্তি, ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁকে রক্ষাকর্তা বলে বরণ, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ এবং রক্ষাকর বলে দৈন্য ও আর্তি প্রকাশ—এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ। এই ছয়টি লক্ষণের মধ্যে 'গোপ্তৃত্বে বরণং' অর্থাৎ রক্ষাকর্তারূপে বরণই মুখ্য শরণাগতি অন্য পাঁচটি এই মুখ্য শরণাগতির সহায়ক বা পরিপূরক। 'আনুকুল্য সংকল্প' বলতে বুঝায় ভগবদ-ভজনের অনুকূল বিষয়ের সংকল্প, 'প্রতিকুলস্য বর্জনং'—অর্থাৎ ভগবদ ভজনের কিংবা শরণাগত ভাবের বিপরীত বিষয়ের বর্জন, 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাস' অর্থাৎ ভগবান অবশ্যই শরণাগত আমাকে রক্ষা করবেন—আমার যাতে কল্যাণ হয় তাই করবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস, 'আত্মনিক্ষেপ' অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ—সর্বপ্রকার অহংকার ত্যাগকরে শ্রীভগবানের উপর সমস্ত ভার অর্পণ, 'কার্পণ্য'—অর্থাৎ নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করে 'হে ভগবান আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই ভাবে আর্তি প্রকাশ।

হরিভক্তিবিলাসে আরো বলা হয়েছে ঃ

তবাস্মীতি বদন বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎ স্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগত॥

হে ভগবন, আমি তোমারই—এইরূপ মুখে যিনি বলেন, মনেতেও এইরূপ জানেন এবং যিনি শরীর দ্বারা ভগবল্লীলাস্থান আশ্রয় করেন—এই ত্রিবিধভাবে শরণাগত জন শ্রীভাগবতীয় পরমানন্দ লাভ করেন। এইরূপে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-আশ্রয় গ্রহণই যথার্থ শরণাগতি। আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পায়ে সমর্পণ করে একান্ত নির্ভরতার ভাব নিয়ে তাঁর শরণাগত হওয়া—ভক্তিমার্গের সর্বোত্তম আদর্শ। কিন্তু এই উন্নত ভাবাদর্শ জীবনে রূপায়িত করা. কায়মনোবাক্যে তাঁর আশ্রয় নেওয়া যে কত কঠিন—চিন্তা করলে কূল পাওয়া যায় না। 'আমি তোমারই, তুমিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা' এই পরম উন্নত ভাব—অহং সর্বস্ব আমাদের জীবনে গ্রহণ করা; অনুসরণ করা অতীব কঠিন সন্দেহ নাই। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ

করতে পারলে তো আমাদের নিজের বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

প্রভু কহে সনাতন কৃষ্ণ যে রতন ধন
বড় যে দুঃখেতে মিলায়।
দেহ গেহ পুত্রদার বিষয় বাসনা আর
সব আশা যদি তেয়াগয়॥

তবে ভক্তিশাস্ত্রে এই দুরূহ সাধনারও ক্রমিক পথনির্দেশ করেছেন আচার্যগণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলা হয়েছেঃ

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবো ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথমেই শ্রদ্ধা, তারপর সাধু সঙ্গ, পরে অনর্থানিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা ও রুচির উদয়। অনন্তর আসক্তি। পরে ভাব এবং পরিশেষে প্রেমের উদয় হয়। সাধকের প্রেমের আবির্ভাবের ইহাই ক্রম।

শ্রদ্ধা কি? শাস্ত্র বলেন 'গুরু শাস্ত্রবাক্যেষু বিশ্বাস শ্রদ্ধা।' এই শ্রদ্ধা বিশ্বাস লাভের উপায় কি? উপায় সাধু সজ্জনের সঙ্গ-প্রভাব। একবার প্রভুপাদ শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামী হরিদ্বারে সবজনবন্দিত শ্রীমদ্ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেছিলেন—'মহারাজ, শ্রদ্ধাবিশ্বাস কায়সা হোতা হ্যায়?' উত্তরে গিরি মহারাজ বলেছিলেন 'শ্রদ্ধা দেনেবালেতো…সব মহাত্মাই হ্যায়; মহাত্মাকো চরণরজ লেইকে মনকো পর রগড়া করাও তো শ্রদ্ধা উৎপন্ন হোগা।' স্বামীজি জানতে চাইলেন—'মনকো পর রগড়ানা ক্যায়সা?' তখন মহারাজ হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'শরীরকো পর তো সব কোই রগড়াতে হ্যায়, মনকো পর রগড়ানা চাইয়ে।' সাধু মহাত্মাদের সদুপদেশ অন্তরে গভীরভাবে চিন্তন এবং অনুসরণই বোধ হয় 'মনকো পর রগড়ানা'। সাধু সঙ্গ এবং মহৎ

কৃপাই বোধ হয় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসলাভের উপায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি—

সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥....
কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়,
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ যে করয়॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বার্থে নিবর্তন। ইত্যাদি

সাধুসঙ্গই যে ভগবদ ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। এমনকি একমাত্র কারণ তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয়—সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ॥

এইরূপে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশে ভক্তিসাধনের সার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে—

সাধু সঙ্গ নাম কীর্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা মণ্ডলে বাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥ চৈঃ চঃ

গীতার উপসংহারে শ্রীভগবান শ্রীমুখেই 'সর্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ' অর্জুনকে উপলক্ষ করে বলে গেছেন, শুধু বলা নয় প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি,

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ সঙ্গী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

এই পরমবাক্য অন্তরে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে, আমরা যেন আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর শরণাগত হতে পারি।

সংসারে নানাবন্ধনে জড়িয়ে আছি, নানা আবরণে আবৃত। তাইতো তাঁর আলো দেখতে পাই না, পাই না তাঁর কৃপার পরশ

উপলব্ধি করতে। অথচ ভালোমন্দ সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে তিনিই তো আমাদের জীবনকে এক সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন। নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে, তাঁর কর্তৃত্বের উপর তো নির্ভর রাখতে পারি না, তাঁর নির্দেশ তো শুনতে পাইনা, তেমন করে তো নিজেকে, নিজের সব কিছুকে একান্ত নির্ভরতায় তাঁর চরণে সমর্পন করতে পারি না। এই অজ্ঞান আবরণ কবে ছিন্ন হবে, কবে তাঁর কৃপার মর্ম-মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবো, কবে নিঃশেষে আমার সব কিছুকে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারবো। সংসারে যখন যে অবস্থায় তিনি রাখেন, সর্বাবস্থায় তাঁর মঙ্গলময়ত্বের উপর নির্ভর রেখে কবে জীবনের পথে চলতে পারবো। এই যে তাঁর উপর নির্ভর রেখে চলতে না-পারার বেদনা, কবে তিনি কৃপা করে তা দূর করে দেবেন, কবে তাঁর একান্ত অনুগত, শরণাগত করে নিবেন—এই প্রার্থনাই নিরন্তর ধ্বনিত হোক সমগ্র সত্তায়। আমাদের অন্তরের আকূতি হোক :

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং নিরন্তর নিবাস জগৎ প্রণামে
দৃষ্টিং সত্যং চ দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

হে লীলাময়, আমাদের বাক্য তোমার গুণানুকীর্তনে, কর্ণদ্বয় তোমার লীলাকথা শ্রবণে, হস্তদ্বয় তোমার সেবাকার্যে, মন তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণে, দৃষ্টি তোমার মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে এবং মস্তক তোমার আবাসভূত এই জগতের প্রণামে রত থাকুক। যমলার্জুন ভঞ্জনের পরে শাপমুক্ত নলকুবের ও মনিগ্রীবের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত এই শ্রীকৃষ্ণ স্তব হোক-আমাদেরও সকলের নিত্য দিনের ঐকান্তিক-প্রার্থনা। কৃপাময় এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করুন, সত্য করে তুলুন।

শিবলিঙ্গ-রহস্য

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

ভারতীয় হিন্দুদের প্রাচীনতম প্রতীকোপাসনা হচ্ছে লিঙ্গোপাসনা। বর্তমানে দু' ধরণের লিঙ্গ দেখা যায়—(১) শিবলিঙ্গ ও (২) বিষ্ণুলিঙ্গ বা শালগ্রামশিলা। এই উভয় প্রকার লিঙ্গকেই ব্রহ্মলিঙ্গও বলা হয়ে থাকে। কাজেই, মনে হয়, শিবলিঙ্গ এবং বিষ্ণুলিঙ্গ উভয়েই উপনিষদের ব্রহ্মের প্রতীক। আবার বলা হয়েছে, এক ব্রহ্মই সকল দেবদেবী হয়েছেন। সুতরাং যে কোন দেবদেবীর উপাসনা আসলে ব্রহ্মেরই উপাসনা। তাই, বোধহয়, শিবলিঙ্গে অথবা বিষ্ণুলিঙ্গে সকল দেবদেবীর পূজোই করা চলে।

শৈবধর্ম সবচেয়ে প্রাচীন হিন্দুধর্ম। এই প্রাচীনতম শৈবধর্মের শিবলিঙ্গই আদিলিঙ্গ। মনে হয়, পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্মে, শৈবধর্মের প্রভাবে, লিঙ্গোপাসনা প্রবর্তিত হওয়ায় বিষ্ণুলিঙ্গের আবির্ভাব হয়।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, আদিলিঙ্গ এই শিবলিঙ্গের রহস্য উদ্ঘাটন করা। শিবলিঙ্গের আকৃতিতে দেখা যায়, নিচে রয়েছে প্রায় গোলাকার একটি সমতল আর সেই সমতলের ওপরে রয়েছে অর্ধগোলকাকৃতি শীর্ষযুক্ত একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভটিকে বলা হয় শিবলিঙ্গ আর নিচের প্রায় গোলাকার আধারটিকে বলা হয় গৌরীপীঠ। কোন কোন ছোট আকারের শিবলিঙ্গের স্তম্ভটিকে অনেকটা আলোকশিখার মতো ওপরের দিকে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে যেতে দেখা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে,—শিবলিঙ্গের এই রকম আকৃতি কেন? এই শিবলিঙ্গের অর্থই বা কি? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান হলেই শিবলিঙ্গের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে, সন্দেহ নেই।

শুরুতেই, শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে বর্তমানে যে বিকৃত-ধারণা কোন কোন মহলে বিদ্যমান রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। এই

বিকৃত-ধারণা অনুযায়ী, শিবলিঙ্গ হচ্ছে হর-গৌরীর যৌনাঙ্গের মিলিত রূপ। এই কদর্য-ধারণার উৎস কয়েকজন পাশ্চাত্য-পাণ্ডিতের অভিমত। ইতিহাসের গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে, প্রাচীন অনেক অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতির মধ্যে যৌনাঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, শিবলিঙ্গের উপাসনা সেই আদিম অসভ্যদের অসংস্কৃত ধর্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত; ইংরাজীতে যাকে Phallic-worship বলে, শিবলিঙ্গের উপাসনা আসলে তাই। আমরা, যারা ভারতীয়, বিশেষত যারা উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের অনেকেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের অন্ধ-ভক্ত, অনেকেই ভারতীয় প্রাচীন ধ্যান-ধারণার প্রতি আস্থাহীন। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন শিবলিঙ্গ সম্পর্কে এই কদর্য-ব্যাখ্যা দিলেন, তখন আমরা অনেকেই সেই ব্যাখ্যাকে বিনাবিচারে অভ্রান্ত বলে মেনে নিলাম।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে,—শিবলিঙ্গ সম্পর্কে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা যে ভ্রান্ত তা বোঝা গেল কি করে? শুধুমাত্র কদর্য বলেই কোন ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত বলা চলে কি? আর পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের অভিমত বলেই কি কোন অভিমতকে ত্রুটিযুক্ত বলা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়,—না, শুধুমাত্র কদর্য বলেই, শুধুমাত্র পাশ্চাত্য-পণ্ডিতদের অভিমত বলেই কোন অভিমতকে ভ্রান্ত, ত্রুটিপূর্ণ বলা চলে না। আমাদের নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, সেই অভিমত যুক্তিসিদ্ধ কিনা যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয় তাহলে আমাদের দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করতেই হবে যে, সেই অভিমত ভ্রান্ত, সেই অভিমত বিকৃত, সেই অভিমত কদর্য।

এবারে যুক্তিরূপ সুতীক্ষ্ণ শাণিত শর নিক্ষেপ করে দেখা যাক, সেই শরাঘাত সহ্য করার ক্ষমতা শিবলিঙ্গ সম্পর্কে পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য অভিমতের আছে কিনা।

প্রথমতঃ শিবলিঙ্গের উপাসনা যদি আদিম অসভ্যদের অসংস্কৃত

ধর্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত মিলিত যৌনাঙ্গের উপাসনাই হ'ত, তাহলে এটা একমাত্র আদিম অসভ্য বা অর্ধসভ্য জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো; কিন্তু দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই শিবলিঙ্গের উপাসনা ভারতের শিক্ষিত জ্ঞানবান জনসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত।

দ্বিতীয়তঃ শিবকে বিশ্বপিতা এবং গৌরীকে বিশ্বমাতা বলা হয়েছে; এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত কিছুই এই বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতার সন্তান; সন্তান হিসেবে কোন জ্ঞানবান সাধকই পিতা-মাতার সংযুক্ত যৌনাঙ্গকে উপাসনার প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারেন না; কিন্তু দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের জ্ঞানবান সাধকেরা শিবলিঙ্গকে তাঁদের বহিরঙ্গ উপাসনার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে এসেছেন।

তৃতীয়তঃ সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীগণ যৌন-সংসর্গকে সাধনার একান্ত অন্তরায় বলে মনে করেন এবং নিজেরাও যৌন-সংসর্গকে সর্বাবস্থায় পরিহার করে সাধনায় অগ্রসর হন; এই সংসারত্যাগী যোগীসন্ন্যাসীরা তাঁদের বহিরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে সংযুক্ত যৌনাঙ্গকে উপাসনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করবেন, একথা বিশ্বাস করা চলে না; অথচ দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীরা শিবলিঙ্গকে তাঁদের বহিরঙ্গ উপাসনার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এসেছেন।

চতুর্থতঃ শিবলিঙ্গ যদি সংযুক্ত যৌনাঙ্গের প্রতীক হ'ত, তাহলে এর আকৃতি পুরুষাঙ্গ ও স্ত্রীঅঙ্গের সংযুক্ত রূপ যেমন হয় তেমন হ'ত; কিন্তু শিবলিঙ্গের আকৃতি ঠিক তেমন নয়।

এইভাবে যুক্তি প্রয়োগে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, শিবলিঙ্গ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কদর্য ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ, ভ্রান্ত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল তাঁদের কেউ কেউ অবশ্য শিবলিঙ্গকে সংযুক্ত যৌনাঙ্গের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে চান নি। যেমন,—উইন্টারনিৎজ। তিনি তাঁর "History of Indian Literature" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"The linga-cult bears no trace of any phallic-cult of an obscene nature." অর্থাৎ লিঙ্গ উপাসনার মধ্যে অশালীন ধরণের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার কোন চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো বলেছেন,—The linga, generally in the form of a small stone column, is for the worshipper of Siva only a symbol of the productive and creative principle of nature as embodied in Siva"; অর্থাৎ, সাধারণতঃ ক্ষুদ্র প্রস্তর স্তম্ভের আকারে নির্মিত লিঙ্গ, শিবোপাসকদের কাছে, শিবের মধ্যে বিমূর্ত প্রকৃতিরাজ্যের উৎপাদন ও সৃজন প্রক্রিয়ার একটি প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়।

কিন্তু শিবলিঙ্গ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ ধোপে টেঁকে না। কারণ,—শিবের মধ্যে প্রকৃতিরাজ্যের উৎপাদন ও সৃজন প্রক্রিয়া বিমূর্ত, শিবলিঙ্গ যদি কেবলমাত্র এই ভাবেরই দ্যোতক হ'ত, তাহলে শিবকে তো কেবল সৃষ্টির দেবতা হিসেবেই পরিকল্পনা করা হ'ত; কিন্তু দেখা যায়, শিব প্রধানত ধ্বংসের দেবতা হিসেবেই পরিকল্পিত হয়েছেন।

তাহলে দেখা গেল, শিবলিঙ্গ সম্পর্কে পাশ্চাত্য-পাণ্ডিতদের ব্যাখ্যা—শিবলিঙ্গ আসলে, আদিম-অসভ্যদের অসংস্কৃত ধর্মবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত সংযুক্ত-যৌনাঙ্গ অথবা শিবের মধ্যে বিমূর্ত প্রকৃতি রাজ্যের উৎপাদন ও সৃজন প্রক্রিয়ার প্রতীকমাত্র কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়।

কাজেই প্রশ্ন জাগে,—শিবলিঙ্গ তাহলে কিসের প্রতীক? শিবলিঙ্গের মধ্য দিয়ে কোন মহাভাবই বা ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে?

শৈব-গুরু গোরক্ষনাথের ভাবশিষ্য বাবা গম্ভীর নাথের দুজন শিষ্য অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধু শান্তি নাথ শিবলিঙ্গকে জ্যোতিস্তম্ভ বা আলোকশিখার প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় এঁরা বলতে চেয়েছেন,—

শিবলিঙ্গের 'লিঙ্গ' শব্দের সঙ্গে পুরুষের পুরুষত্বব্যঞ্জক ইন্দ্রিয়বিশেষের

কোন মৌলিক সম্পর্ক নেই ; বিশ্বের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সূচক যৌনমিলনের সঙ্গেও এর নেই কোন মৌলিক সম্পর্ক।

'লিঙ্গ' শব্দ প্রাথমিকভাবে জননেন্দ্রিয়কে বোঝায় না। সংস্কৃতে 'শিশ্ন' বা 'উপস্থ' শব্দ দ্বারা বিশেষ জননেন্দ্রিয়কে বোঝায়। 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ এবং 'শিশ্ন' বা 'উপস্থ' শব্দের অর্থ ঠিক এক নয়। 'লিঙ্গ' শব্দের সাধারণ অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক বা কোন জিনিসের পার্থক্য প্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য। যেমন,—ধূম হচ্ছে অগ্নির লিঙ্গ ; পোষাক পরিচ্ছদের একটি নির্দিষ্ট ধরণ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পেশার লিঙ্গ ; একটি নির্দিষ্ট জননেন্দ্রিয় পুরুষ বা স্ত্রীর লিঙ্গ ; একটি নির্দিষ্ট ফল (effect) হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট কারণ (cause) এর লিঙ্গ ; একটি নির্দিষ্ট প্রতিরূপ বা বস্তু হচ্ছে একজন নির্দিষ্ট দেবতার লিঙ্গ ; কোন বস্তুর অংশবিশেষ হচ্ছে সমগ্র বস্তুটির লিঙ্গ ; চোখ-মুখের একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থার লিঙ্গ ; কোন একটি নির্দিষ্ট দৃশ্যবস্তু হচ্ছে কোন অদৃশ্য সত্তা বা মনে অনুভূত কোন তত্ত্বের লিঙ্গ ; ইত্যাদি।

শিবলিঙ্গের 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। শিবলিঙ্গের অর্থ শিবের প্রতীক।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই তত্ত্বদর্শী-মুনিঋষিগণ, মনীষী-সাধকগণ, মুমুক্ষু যোগীসন্ন্যাসীগণ জ্যোতি, আলোক, অগ্নি ও সূর্যকে চৈতন্যের প্রতীক বলে গ্রহণ করে এসেছেন ; চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতি, পরম-জ্যোতি, অখণ্ড-জ্যোতি ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হয়েছেন। এই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই যোগী-সন্ন্যাসী-মুনিগণ শিব নামে আরাধনা করেছেন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে,—

"যদাঽতমোস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।" অর্থাৎ, (সৃষ্টির প্রাক্কালে) যে সময় অজ্ঞান ও অবিদ্যা ছিল না, সে সময় দিনও ছিল না রাত্রিও ছিল না, সৎও ছিল না অসৎও ছিল না ; তখন কেবলমাত্র শিবই বর্তমান ছিলেন।

"একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থঃ।" অর্থাৎ, "যেহেতু একমাত্র

রুদ্রই বর্তমান, সেই কারণে ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় আর কোন বস্তুর অপেক্ষায় থাকেন না।"

"শান্তং শিবমদ্বয়ম্"। অর্থাৎ, শিব শান্ত অদ্বয়।

এই স্বপ্রকাশ, সর্বপ্রকাশক জ্যোতির্ময় শিবকে শৈব-যোগিগণ অন্তরে অনির্বাণ জ্যোতিরূপে দর্শন করেন এবং বাইরের জগতের সব আলোকবহুল পদার্থের মধ্যে সেই শিবেরই জ্যোতির ছটা অবলোকন করেন। সুতরাং এই শৈব সাধকগণ জাগতিক জ্যোতিকে স্বপ্রকাশ শিবজ্যোতির প্রতীকরূপে অবলম্বন করে সাধনায় ব্রতী হন, জীবনকে জ্ঞানালোকময় করবার জন্য প্রয়াসী হন।

কাজেই, শিবলিঙ্গ আসলে জ্যোতিস্তম্ভ বা আলোকশিখার প্রতিরূপ। শিবলিঙ্গ, প্রথম থেকেই, দীপশিখা বা আলোকস্তম্ভ বা প্রদীপ্ত জ্যোতিরূপেই সুকল্পিত। এই জ্যোতিকে প্রতীকোপাসনার ক্ষেত্রে সর্বত্র স্থায়ী রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই তাকে প্রস্তরীভূত করে প্রতিষ্ঠিত করার সুষ্ঠু পরিকল্পনা। শিবলিঙ্গ ক্ষুদ্রাকৃতি হলে দীপশিখার আকারে এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি হলে আলোকস্তম্ভের আকারে প্রতিষ্ঠিত করবারই বিধান।

শিবলিঙ্গের এই ব্যাখ্যার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়,—শিবলিঙ্গের নিম্নাংশকে গোরীপীঠ বা যোনিপীঠ বলা হয় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন,—"নিবৃত্তি মার্গের সাধকগণ প্রথমতঃ বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি উদাসীন হইয়া বৈদিক ধর্ম, সমাজধর্ম, ক্রিয়াকাণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ের বাহিরে বনে শ্মশানে পর্বতে শিবজ্যোতির ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিতেন এবং জীবনের সকল বিভাগ চৈতন্যালোকে আলোকিত করিয়া শিবময় করিতে প্রয়াসী হইতেন। পরে জ্ঞানালোকিত দৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই সচ্চিদানন্দের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া তাঁহারা নরনারী সাধারণের জীবনকে তত্ত্বজ্ঞানে আলোকিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজের সকল স্তরে শিবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সকলকে অখণ্ড জ্যোতির উপাসনায় দীক্ষাদান করিতে

ব্রতী হইলেন। প্রবৃত্তিমার্গের অধিকারী নরনারীদের সম্মুখেও শিব-জ্যোতির আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া প্রবৃত্তিধর্মকেও তাঁহারা নিবৃত্তি-পরায়ণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। দেববাদীদের ধর্মানুষ্ঠানে, সমাজ-বিধানে অধিকার নিরূপণে যে সব সংকীর্ণতা ছিল, যে সব অবিদ্যাজনিত ভেদবুদ্ধির প্রভাব ছিল, শিবজ্ঞানের আলোকপাতে সেই সব সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি নিরসন করিয়া তাঁহারা ক্রমে সমাজের উপর নূতন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। গৃহস্থ তত্ত্বপিপাসুগণ শিবোপাসক যোগী ও সন্ন্যাসীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লইয়া শিবকে গৃহদেবতা, কুলদেবতা, গ্রামদেবতা, জাতিদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শিব যেন গৃহস্থ হইলেন—কর্মের সহিত জ্ঞানের মিলন সাধিত হইল, ভোগের উপরে ত্যাগের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। গৃহীর কর্মময়ী ভোগময়ী বৈচিত্র্যমুখী বহুত্ব-প্রসবিনী চেতনা জ্ঞানিগুরু ত্যাগিগুরু আত্মচৈতন্য সমাহিত ভেদ-বুদ্ধিবিনাশিনী শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়া তদনুগত হইল। শিব ও উমার যোগ সাধিত হইল। বৈচিত্র্যজননী উমার প্রত্যেক সন্তান-সন্ততির মধ্যে শিবের অদ্বয় একত্ব প্রতিফলিত হইল। বিশ্বপ্রকৃতি শিবের যোনিপীঠ রূপে কল্পিত হইল। বিশ্বপ্রকৃতির আধারে জ্ঞানালোকময় চৈতন্যজ্যোতি সর্বাদিগ্‌দেশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।"

কিন্তু, ওপরে উদ্ধৃত শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মীমাংসাবাক্যের সমস্ত বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ,—

প্রথমত—নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ বৈদিকধর্ম পরিত্যাগ করে শিব-জ্যোতির ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—এটা, বোধ হয়, ঠিক নয়। কারণ,—যজ্ঞসর্বস্ব ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ঋষিধর্মও যেমন বৈদিকধর্ম, তেমনি যোগপ্রধান মুনিধর্মও বৈদিকধর্ম; বেদের কর্মকাণ্ড সংহিতা-ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করে ঋষিধর্ম এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক-উপনিষদকে অবলম্বন করে মুনিধর্ম। তাই, নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ বৈদিক-মুনিধর্ম অবলম্বন করে শিবজ্যোতি ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—এটা বলাই, বোধ হয়, সঙ্গত।

দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মীমাংসাবাক্য থেকে সাধারণভাবে মনে হয়, নিবৃত্তিমার্গের সাধকগণ সকলেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে শিবজ্যোতি-ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু, প্রকৃত ঘটনা, বোধ হয়, তা নয়।

উপনিষদে দেখা যায়,—নিবৃত্তিমার্গের সাধক মুনিগণের অনেকেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করতেন। তবে এঁরা, সাধারণত, লোকালয় থেকে দূরে অরণ্য পরিবেশে বসবাস করতেন। এঁরা কর্মকাণ্ডের যজ্ঞও করতেন; তবে জ্ঞানকাণ্ডের যোগকেই প্রাধান্য দিতেন।

বৈদিকযুগের প্রথমদিকে মুনিধারার সঙ্গে ঋষিধারার সংঘর্ষ হয়েছিল। এই বৈদিকযুগেরই শেষের দিকে আবার এই ধারা দুটির সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল; সকলের জন্যই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমদ্বয়ে ঋষিধারার এবং বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয়ে মুনিধারার প্রাধান্য রাখা হয়েছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মা, গার্হস্থ্যাশ্রমে বিষ্ণু এবং বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয়ে মহেশ্বর শিব[১] ছিলেন জীবন-সাধকের উপাস্যদেবতা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার "জাতিভেদপ্রথা, চতুরাশ্রম ও ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর" প্রবন্ধে করা হয়েছে।

কিন্তু, কিছুকালের মধ্যেই হিন্দু-জীবন-চর্যায়, নানান কারণে গার্হস্থ্য মুখ্য আশ্রমে পরিণত হয়—একদিকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুধুমাত্র উপনয়নানুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়, অন্যদিকে অনেকেই বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয়ে প্রবেশ নিরর্থক মনে করতে থাকেন। যে মুহূর্তে গার্হস্থ্য মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় সেই মুহূর্তেই ঋষিধারার প্রাধান্য সূচিত হয়। এরই প্রতিক্রিয়ারূপে মুনিধারার জাগরণ প্রয়াস ক্রিয়াশীল হয়।

১। এক্ষেত্রে মহেশ্বর শিব আসলে মহেশ্বর রুদ্র। উপনিষদের পরব্রহ্মই শিবনামে আখ্যাত। পরব্রহ্ম বা শিব ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি ক্রিয়া, বিষ্ণুরূপে পালন ক্রিয়া এবং রুদ্ররূপে সংহার ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

মুনিধারার এই জাগরণ প্রয়াস থেকে সংসারত্যাগী যতি বা সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মুনিধারার একটা অংশ ঘোষণা করেন,—যৌবন-প্রাপ্তির সাথে সাথে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ না করে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক যোগ বা পরমার্থ সাধনায় ব্রতী হতে হবে। ফলে সংসারত্যাগী যতি বা যোগী বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে মহেশ্বর শিব[১] একমাত্র উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। মুনিধারার অপর অংশ গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকেই যোগ-সাধনা চালাতে থাকেন।[২] এঁরাও মহেশ্বর শিবকে[১] এঁদের প্রধান-উপাস্য-দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে বেশীর ভাগ গৃহস্থ মানুষের কাছে বিষ্ণু প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন। ঋষিধারার যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণেরাও গ্রহণ করেন বিষ্ণুকে তাঁদের প্রধান-উপাস্য-দেবতা হিসেবে।[৩]

সংসারত্যাগী যতি বা যোগী সন্ন্যাসীগণ ছিলেন পুরোপুরি নিবৃত্তি-মার্গের সাধক, গৃহস্থ যতি বা যোগী-ব্রাহ্মণগণ[৪] ছিলেন প্রধানত নিবৃত্তি-মার্গের সাধক এবং পুরোপুরি প্রবৃত্তিমার্গের সাধক ছিলেন যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ সহ অন্যেরা।

নিবৃত্তিমার্গের সাধকদের মধ্যে সংসারত্যাগী যতি বা যোগী-সন্ন্যাসীদের কথাই, বোধহয়, শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মীমাংসা বাক্যে উল্লেখ করেছেন।

১। এক্ষেত্রে মহেশ্বর শিব হচ্ছেন মহেশ্বর রুদ্র।

২। মহাভারতে গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকেও যোগানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

৩। মহেশ্বর শিব (রুদ্র) হচ্ছেন ব্রাহ্মণগণের উপাস্য দেবতা। মনু-সংহিতাতেও বলা হয়েছে,—"বিপ্রাণাং দৈবতং শম্ভুঃ ক্ষত্রিয়াণান্তু মাধবঃ। বৈশ্যানান্তু ভবেৎ ব্রহ্মা শূদ্রাণাং গণপতিঃ স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ, বিপ্র বা ব্রাহ্মণগণের দেবতা শম্ভু বা শিব (রুদ্র), ক্ষত্রিয়গণের দেবতা মাধব বা বিষ্ণু, বৈশ্যগণের দেবতা ব্রহ্মা এবং শূদ্রগণের দেবতা গণপতি বা গণেশ। বর্তমানে অবশ্য সকল দেবতাই সকলের উপাস্য।

৪। যোগীব্রাহ্মণের অপর নাম রুদ্রজব্রাহ্মণ।

তৃতীয়তঃ শিবলিঙ্গ, বোধহয়, একমাত্র নিবৃত্তিমার্গের উপাসনার প্রতীক নয়। কারণ,—পরব্রহ্মই শিব ; এই পরব্রহ্ম বা শিব যখন সৃষ্টি ক্রিয়ায় রত থাকেন তখন তিনি ব্রহ্মা নামে, যখন পালন ক্রিয়ায় রত থাকেন তখন তিনি বিষ্ণু নামে এবং যখন সংহার ক্রিয়ায় রত থাকেন তখন তিনি রুদ্র নামে আখ্যাত হন।[১] সুতরাং আদিতে, বোধহয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়মার্গের উপাসনার প্রতীকরূপেই শিবলিঙ্গ পরিকল্পিত হয়। পরবর্তীকালে এই শিবলিঙ্গ-উপাসনা শুধুমাত্র নিবৃত্তিমার্গের উপাসকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং শিবলিঙ্গ শুধুমাত্র আলোকস্তম্ভ বা দীপশিখার প্রতীক এবং পরবর্তী সময়ে এই প্রতীক বিশ্বপ্রকৃতির আধারে জ্ঞানালোকময় চৈতন্যজ্যোতির দ্যোতকে পরিণত হয়—এমন কথা, বোধহয়, সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

এবারে—শিবলিঙ্গ আসলে কিসের প্রতীক ? শিবলিঙ্গের মধ্যে দিয়ে কোন্ মহাভাব ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে ? শিবলিঙ্গের প্রচলিত আকৃতিই বা কেন দেওয়া হয়েছে ?—এই মূল প্রশ্নগুলোর মীমাংসায় ব্রতী হওয়া যেতে পারে।

উপনিষদে বলা হয়েছে,—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। নির্গুণ নিরাকার অবাঙ্‌মনসোগোচর যে ব্রহ্মসত্তা তাকে 'পরব্রহ্ম' আর নামরূপে অভিব্যক্ত সগুণ সাকার বাঙ্‌মনসোগোচর যে ব্রহ্মসত্তা তাকে 'নামব্রহ্ম' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে উপনিষদে।

পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী। বিশেষত মহাকাশে, মহাশূন্যে পরব্রহ্মছাড়া আর কিছু নেই। আবার পার্থিব জগৎ নামব্রহ্মদ্বারা গঠিত। কাজেই বলা চলে,—পার্থিব জগৎ বা পৃথিবীই নামব্রহ্ম আর দ্যুলোক বা মহাকাশই পরব্রহ্ম।

পরব্রহ্ম ও নামব্রহ্মের মিলিত সত্তাই পূর্ণব্রহ্ম-সত্তা। কাজেই পার্থিব জগৎ বা পৃথিবী এবং তার ওপর অবস্থিত দ্যুলোক বা মহাকাশ মিলিত ভাবেই পূর্ণব্রহ্ম।

১। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও অন্যত্র এই কথাই বলেছেন।

উপনিষদের এই পরব্রহ্ম ও নামব্রহ্মই বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং শৈব শাক্তদের শিব ও শক্তি।

দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত পরব্রহ্ম বা মহাশিবের কামনা অনুযায়ী পার্থিব-জগৎরূপ নামব্রহ্ম বা মহাশক্তির ক্রিয়াশীলতাই নামব্রহ্মে পর-ব্রহ্মের লীলা, মহাশক্তিতে মহাশিবের লীলা।

ঋগ্বেদে কতকগুলো সূক্ত আছে যাদের দেবতা দ্যাবা-পৃথিবী। এই সূক্তগুলোতে বলা হয়েছে,—দ্যুলোক পিতা এবং পৃথিবী মাতা; এই দ্যাবা-পৃথিবী থেকেই সমস্ত দেবতা ও জগৎ-সংসারের সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। আবার বলা হয়ে থাকে,—শিব হচ্ছেন বিশ্বপিতা এবং গৌরী হচ্ছেন বিশ্বমাতা।

কাজেই সবকিছু মিলিয়ে বলতে হয়,—পৃথিবীর উপাদান নামব্রহ্মই আদ্যামাতা মহাশক্তি গৌরী এবং দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত পরব্রহ্মই আদিপিতা মহাশিব; দ্যুলোক বা মহাকাশ আদিপিতা মহাশিবের দ্যোতক এবং পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবী আদ্যামাতা মহাশক্তি গৌরীর দ্যোতক; পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবী এবং এর ওপর অবস্থিত দ্যুলোক বা মহাকাশ মিলিতভাবে পূর্ণব্রহ্ম বা শিবশক্তির দ্যোতক।

শিবলিঙ্গের আকৃতির মধ্যেও প্রতীকাকারে এই তত্ত্বই আভাসিত, মনে হয়। পৃথিবীর ওপরে দাঁড়িয়ে মহাকাশ বা দ্যুলোকসহ সমস্ত দিকে তাকালে দেখা যায়,—গোলাকার সমতল পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপর দণ্ডায়মান অর্ধগোলকাকৃতি শীর্ষযুক্ত স্তম্ভের মতো দ্যুলোক। এটাকে অনুকরণ করেই, বোধহয়, শিবলিঙ্গের আকৃতি পরিকল্পিত হয়েছে। দ্যুলোক বা মহাকাশের প্রতিরূপ অর্ধগোলকাকৃতিশীর্ষযুক্ত স্তম্ভটিকে বলা হয়েছে শিবলিঙ্গ এবং পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবীর প্রতিরূপ গোলাকার সমতলকে বলা হয়েছে গৌরীপীঠ। শিবলিঙ্গ গৌরীপীঠের ওপর দণ্ডায়মান।

দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত পরব্রহ্ম বা মহাশিব চৈতন্যস্বরূপ। আবার চৈতন্যের প্রতীক জ্যোতি, আলোক প্রভৃতি। সুতরাং শিবলিঙ্গ

অবশ্যই জ্যোতি-স্তম্ভ বা আলোক স্তম্ভের প্রতীক। তাই শিবলিঙ্গের অপর নাম জ্যোতির্লিঙ্গ মোটেই অসঙ্গত নয়।

এই শিবলিঙ্গ বা জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়তত্ত্বের মহাভাব অভিব্যক্ত রয়েছে, মনে হয়।

দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবে কামনা জাগ্রত হয়,—উৎপন্ন হোক, বহু হোক। ফলে পার্থিব জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন। পার্থিব জগতে বা পৃথিবীতে অবস্থিত সূক্ষ্মপঞ্চভূত স্থূলরূপ লাভ করে, পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত নতুন নতুন সামগ্রী সকলের সৃষ্টি হয়। সৃজন-ক্রিয়া-রতা এই পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তিই মহাসরস্বতী ; আর উৎপন্ন করার, বহু করার ভাবে ভাবিত মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবই মহাব্রহ্মা।

দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবে কামনা জাগ্রত হয়,—উৎপন্ন নতুন নতুন সামগ্রীসকল পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে স্থিতিশীল হোক। ফলে পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন। উৎপন্ন নতুন নতুন সামগ্রীসকল পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক স্থিতিশীল হয়। স্থিতি-ক্রিয়া বা পালন-ক্রিয়ারতা এই পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তিই মহালক্ষ্মী ; আর সামঞ্জস্যবিধান পূর্বক সমস্ত কিছুকে স্থিতিশীল রাখার ভাবে ভাবিত মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবই মহাবিষ্ণু।

দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবে কামনা জাগ্রত হয়,—স্থিতিশীল স্থূলবহু তাদের বহুত্ব ঘুচিয়ে সূক্ষ্ম একে পরিণত হোক এবং অবশেষে সূক্ষ্ম-একও কারণে বিলীন হোক। ফলে পার্থিব জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন। পার্থিব জগৎ বা পৃথিবীতে অবস্থিত স্থূলবহু তাদের বহুত্ব নাশের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম-একে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে সেই সূক্ষ্ম-একও আবার কারণে বিলীন হয়—পার্থিব জগৎ বা পৃথিবীতে অবস্থিত স্থূল-সামগ্রীসকল সূক্ষ্ম-পঞ্চভূতে রূপান্তরিত হয় এবং পরিণামে সেই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতও আবার দ্যুলোক বা মহাকাশে

ব্যাপ্ত মহাশিবে বিলীন হয়। স্থিতিশীল স্থূলবস্তুর ধ্বংসক্রিয়ায় রতা পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তিই মহারুদ্রাণা ; আর স্থিতিশীল স্থূলবস্তুকে ধ্বংস করে সূক্ষ্ম একে এবং সূক্ষ্ম-একককে ধ্বংস করে কারণে অর্থাৎ নিজের মধ্যে লয়প্রাপ্ত করার ভাবে ভাবিত মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবই মহারুদ্র

এই ভাবে দ্যুলোক বা মহাকাশে ব্যাপ্ত মহাশিবের কামনা অনুযায়ী পার্থিব-জগৎ বা পৃথিবীরূপা মহাশক্তির ক্রিয়াশীলতায় বিশ্ব প্রপঞ্চের সমস্ত কিছুর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়। তাই, বহির্জগতের এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব শিবলিঙ্গে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত, বলা যায়।

আবার শিবলিঙ্গের মধ্যে অন্তর্জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বও অভিব্যক্ত, মনে হয়।

মানবদেহের অভ্যন্তরে রয়েছে যোনিমণ্ডল এবং এই যোনিমণ্ডলের ওপরে অবস্থিত রয়েছে অর্ধগোলাকৃতিশীর্ষযুক্ত স্তম্ভাকার অন্তরাকাশ। এই অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত জ্যোতিস্বরূপ অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মার প্রাণকেন্দ্র অন্তরাকাশের শীর্ষে, ব্রহ্মতালুতে ব্রহ্মদ্বারের কাছে, সহস্র-দলপদ্মচক্রে অবস্থিত। অর্থাৎ, অন্তরাত্মা সহস্রদলপদ্মচক্রে সংহত। সহস্রদলপদ্মচক্রে সংহত এই অন্তরাত্মাই পরমাত্মা ; এই অন্তরাত্মাই আদিশিব। যোনিমণ্ডলে মূলাধারচক্র অবস্থিত। এই মূলাধারচক্রেই অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদির প্রাণকেন্দ্র। তাই এই মূলাধারচক্র থেকেই ইন্দ্রিয়াদির ওপর জৈবিক ভোগ-সুখের প্রেরণা আসে। কাজেই বলা চলে, মূলাধারচক্রে ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত-দেহ সংহত। মূলাধারচক্রে সংহত এই ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত-স্থূল-দেহের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীলা সূক্ষ্মা-শক্তিই আদ্যাশক্তি।

মানবদেহের মূলাধারচক্রই আদ্যামাতা আদ্যাশক্তি আর সহস্রদল-পদ্মচক্রই আদিপিতা আদিশিব। মূলাধারচক্র যে যোনিমণ্ডলে অবস্থিত সেই যোনিমণ্ডলই আদ্যামাতা আদ্যাশক্তি এবং এই যোনিমণ্ডলের

ওপরে অবস্থিত জ্যোতিস্বরূপ স্তম্ভাকার অন্তরাকাশই আদিপিতা আদিশিব। যোনিমণ্ডল ও অন্তরাকাশ সম্মিলিতভাবে শিবশক্তি-স্বরূপ। যোনিপীঠ-বিহারী শিবলিঙ্গ এই শিবশক্তি স্বরূপের প্রকৃষ্ট-প্রতীক। এই প্রতীকের নিচের দিকে রয়েছে যোনিমণ্ডলরূপা যোনিপীঠ এবং এই যোনিপীঠের ওপরে রয়েছে অন্তরাকাশরূপ জ্যোতির্লিঙ্গ।

অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবের বিচিত্র আনন্দ আস্বাদনের কামনায়, যোনিমণ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধিরূপা আদ্যাশক্তির ক্রিয়াশীলতায় মানবিক ভাব সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয়।

অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবে বহুকে সম্ভোগ করার কামনা জাগ্রত হয়। ফলে যোনিমণ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি-রূপা আদ্যাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন; ভেদবোধের জাগরণ ঘটে; খণ্ড-সত্তা, খণ্ড-চৈতন্য, খণ্ড-আনন্দের খেলা চলে; প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, হত্যাকাণ্ড সংঘটনের প্রেরণা আসে।

অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবে সমস্ত কিছুর সামঞ্জস্য বিধান পূর্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ বহুকে সম্ভোগ করার কামনা জাগ্রত হয়। ফলে যোনিমণ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধিরূপা আদ্যাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন; ভেদবোধ স্থিতিশীল হয়; প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ, সংগ্রাম, হত্যাকাণ্ড সংঘটনের প্রেরণা অন্তর্হিত হয়; ভেদবোধ থাকে, কিন্তু ভেদবোধ-জনিত ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধ হয়।

অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবে বহুকে একে পরিণত করার এবং সেই এককে সম্ভোগ করার কামনা জাগ্রত হয়। ফলে যোনিমণ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধিরূপা আদ্যাশক্তি ক্রিয়াশীলা হন; ভেদবোধ লুপ্ত হয়; খণ্ড-সত্তা, খণ্ড-চৈতন্য, খণ্ড-আনন্দের খেলার অবসান ঘটে; বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি আসে।

অন্তরাকাশে ব্যাপ্ত অন্তরাত্মারূপ আদিশিবে অদ্বয় কামনা জাগ্রত হয়। ফলে যোনিমণ্ডলে সংহতা ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধিরূপা আদ্যাশক্তি

ক্রিয়াশীলা হন ; পূর্ণ-অভেদবোধ জাগ্রত হয়—শিবোঽহং—বোধমাত্র বর্তমান থাকে।

এটাই সামগ্রিকভাবে শিবলিঙ্গের প্রকৃত তাৎপর্য ; সামগ্রিকভাবে এই মহাভাবই শিবলিঙ্গের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। এখানে দেখা গেল,—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব শিবলিঙ্গে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত রয়েছে ; প্রবৃত্তিমার্গের, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের সামরস্যের এবং নিবৃত্তিমার্গের সমস্ত তত্ত্বই শিবলিঙ্গে নিহিত রয়েছে। কাজেই, মনে হয়, শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-নির্বিশেষে সকল মার্গের উপাসকদের জন্যই পরিকল্পিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে শিবোপসনা থেকে বিছিন্নভাবে বিষ্ণু-উপাসনা প্রবৃত্তি মার্গের উপাসকদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করায় শিবলিঙ্গের উপাসনা কেবলমাত্র নিবৃত্তি মার্গের উপাসকদের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই স্তরে নিবৃত্তিমার্গের উপাসক যোগীসন্ন্যাসীরা শিবলিঙ্গকে দীপশিখার প্রতীকরূপেও, বোধ হয়, গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, দেখা যায়,—

শৈব-যোগী-সন্ন্যাসীরা যোগ-সাধনা ও ধ্যানের সময় সামনে দীপশিখা বা আলোকশিখা (জ্যোতি) জ্বালিয়ে রাখেন। এঁরা সাধনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন,—প্রকৃত-প্রজ্ঞা-রূপ-আলোকশিখা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে অপসারিত ক'রে সাধককে সমস্ত রকম অজ্ঞান জাত-বন্ধন থেকে মুক্ত করে ; তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল-শিখা সমস্ত রকম কামনা-বাসনা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ—সমস্তরকম পার্থিব-প্রবণতা, আবেগের তাড়না প্রভৃতি ভস্মীভূত করে ; অজ্ঞান-অনুভূত অনিত্য-সীমাবদ্ধ-জগতের বৈচিত্র্যসকল দাহ্যবস্তুর মতো আধ্যাত্মিক-জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে পরম একে পরিণত হয়, আধ্যাত্মিক আত্মানুভূতিতে মহাশ্মশান বা মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হয় যেখানে ঘটমান-জগতের বৈচিত্র্যময় সমস্ত কিছুই

ভস্মীভূত হয়ে অবলুপ্ত হয়, থাকেন কেবল স্বালোকিত অবিনশ্বর পরমাত্মা বা পরমশিব।

এই সময়েই, বোধহয়, শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠ বা যোনিপীঠের আকৃতি অনেকটা দীপশিখার আধার বা প্রদীপের মতো করা হয়; কিন্তু শিবলিঙ্গের আকৃতি অর্ধগোলকাকৃতি শীর্ষযুক্ত স্তম্ভের মতোই রয়ে যায়।

আরো পরবর্তীকালে নিবৃত্তিমার্গের শৈব-সাধকগণ, বিশেষতঃ সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসিগণ নতুন করে আবার নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জীবনকে তত্ত্বজ্ঞানে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে সমাজের সকল স্তরে শিবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, সকলকে অখণ্ড-শিবজ্যোতির উপাসনায় দীক্ষাদান করতে ব্রতী হন। এই প্রয়াসের ফলে প্রবৃত্তি-মার্গের উপাসক নরনারীদের প্রবৃত্তিধর্মও নিবৃত্তিপরায়ণ হয়ে পড়ে, শিবোপাসনা সমাজের সকলস্তরে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই সময়েই, বোধহয়, প্রধানতঃ-নিবৃত্তিপরায়ণ শৈবধর্মের ব্যাপক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে বৈষ্ণবধর্মকেও প্রধানতঃ-নিবৃত্তিপরায়ণ করে গড়ে তোলা হয় এবং শিবলিঙ্গের অনুকরণে বিষ্ণুলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলার উপাসনার প্রবর্তন করা হয়।

এই হল শিবলিঙ্গ-রহস্য। এইভাবে এই শিবলিঙ্গ-রহস্য উদ্ঘাটিত হলে স্পষ্ট দেখা যায়,—শিবলিঙ্গের উপাসনা আসলে বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা, শিবলিঙ্গের উপাসনা আসলে বেদের কর্ম ও জ্ঞান উভয় কাণ্ড অবলম্বনে শিব-শক্তির উপাসনা; শিবলিঙ্গের উপাসনার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মা-সরস্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী ও রুদ্র-রুদ্রাণীর উপাসনাও করা হয়, শিবলিঙ্গের উপাসনার মধ্য দিয়ে সকল দেবদেবীর উপাসনাও করা হয়; শিবলিঙ্গ কর্ম-জ্ঞান, যজ্ঞ-যোগ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি নির্বিশেষে সকল মার্গের সকল হিন্দু উপাসনারই অতি উৎকৃষ্ট প্রতীক;

শিবলিঙ্গ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের সকল প্রকার উপাসনারই প্রকৃষ্ট

পরিশেষে কামনা জানাই,—শিবলিঙ্গের মতো এমন একটি স্বার্থক প্রতীক সম্পর্কে সকল প্রকার ভ্রান্ত, বিকৃত ও কদর্য ধারণার অবসান হোক ; শিবলিঙ্গের উপাসনা হিন্দু-সমাজের সর্বত্র বিস্তার লাভ করুক ; শিবলিঙ্গের উপাসনাকে অবলম্বন করে সকল হিন্দুর সকল সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠুক। ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

যুগসঞ্চার

অধ্যাপক উমাপদ নাথ

ফাটল জিজ্ঞাসা করে : 'এখানে পাঁচিলে তোমার
শীত-দেহটাকে কুম্ভক-ফরমুলাযোগে
শীর্ণ ক'রে ক'রে
কোষবদ্ধ তরোয়ালের মতো
ঢুকিয়ে রাখতে চাও কেন?' আকস্মিক
মৃত্যুর মতো
যাদুদন্ত বেমালুম ঢেকে
কেমন যেন খয়েরি রঙের
মরচেপড়া হাসির ভঙ্গিতে
উত্তরে মুখর হলো ও : 'ইদানীং সন্ন্যাস নিয়ে আমি
নিরালম্ব স্বামী হয়ে
এইখানে নির্জন আশ্রমে
বায়ু সেবী তপস্যায়
নিজেকে বেঁধেছি একবারে।'

তারপর কোন-এক অলক্ষ্য সময়ে
কর্ণিকের বুকভরা নিবিড় মশলায়
ফাটল ভরাট হলে
যোগিবর
সর্বশেষ বারের মতন
আঁকুপাঁকু ক'রে ওঠে : 'বলে :
আমার কুটির মুখে হিংসার খিল
আঁটে কে রে?'

পাঁচিল জবাব দেয়ঃ 'ওরা সব
কর্ণিকের জাত ; ভেঙে কেটে পিটে ঠুকে
বুকভরা জীবন্ত মশলায়
ভাঙাকে নতুন করে, দিকে দিকে
ইমারত গড়ে।'

'আমি যে অনেক প্রাণ
নিয়েছি এবং নেবো—
তারই প্রতীক্ষায়
এখানে যোগীর বেশে
বিষে বিষে নীল তিতিক্ষায়
গোপনে ছিলাম, তার ?'
'শেষ !' এক তৃষিত উত্তর।

সাপের দাঁতের বিষ চক্রবৃদ্ধি সুদের মতন
বেড়েছিল অন্তরালে
প্রত্যয়ের ভিতে, আর
সংগ্রামের দ্রাঢ়িব্ব পাথরে। তার
পূর্ণচ্ছেদ আজ। আজ এক
যুগের সঞ্চার ॥
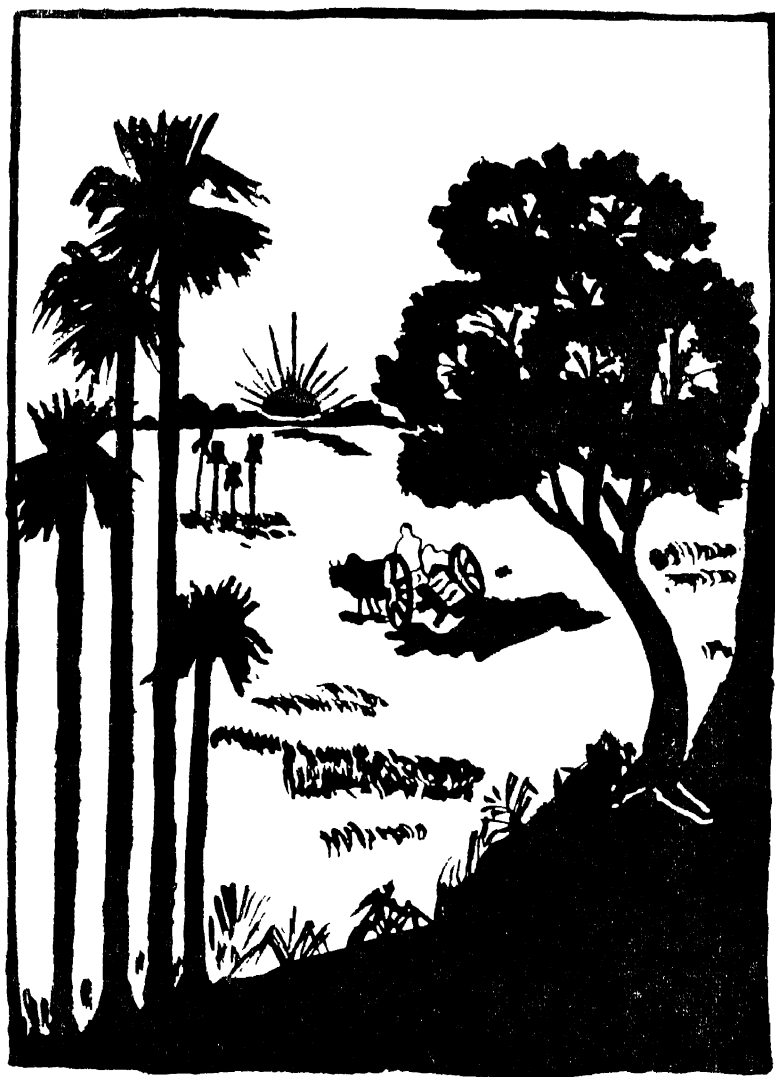
———

রুমা নাথ, বি. কম. (প্রথম বর্ষ)

॥ শরতের আগমনে ॥

অরুণাপ্রভা দেবনাথ

বরষার অবসানে প্রকৃতির আহ্বানে
স্নিগ্ধ শরৎ আজি এলো,
সরস-সবুজেভরা নিখিল বিশ্ব-ধরা
অপরূপ রূপ শোভা পেলো।

নীলাময় নীলাকাশে মেঘ-বলাকারা ভাসে
ডানা মেলে ভোর হ'তে সাঁঝে,
সুদূর গগন পারে গুরু গুরু হুঙ্কারে
বজ্রের শিঙ্গাটি বাজে।

গন্ধে আকুল করা শিথিল শিউলি ঝরা
উজ্জ্বল স্বর্ণালী প্রাতে—
শিশির-মুক্তোজ্জ্বলে শ্যামল দুর্বাদলে
রবির কিরণ পড়ে' তাতে।

শালুক, কমল কত ফুটে আছে শত শত
বিল-ঝিল-দীঘি-সরসীতে,
কাজল ভ্রমর অলি কী কথা যে যায় বলি'
গুণ্ গুণ্ প্রেম-সঙ্গীতে।

শুভ্র কাশের বনে দোলা দেয় ক্ষণে ক্ষণে
চপল হিমেল মৃদু বায়,
ধান সিঁড়ি নদী জলে নেয়ে নাও বেয়ে চলে
সোহাগী প্রিয়ার ঠিকানায়।

দিকে দিকে পড়ে সাড়া সবাই আত্মহারা
শরতের আগমনী সুরে,
আনন্দ স্রোত-ধারা বয় হয়ে দিশেহারা
সবাকার অন্তর জুড়ে।

বাজবে কাঁশর ঢাক সানাই ঢোলক শাঁখ
দশভুজার শুভাগমনে,
সবাকে বন্ধু ভেবে বুকে বুক টেনে নেবে
হিংসা দিয়ে বিসর্জনে।

মাতৃ-মূর্তিখানি হেরিলে হৃদয় জানি
ভরে যাবে শান্তি-সুধায়
তাইতো এ হিয়া-মন নিশিদিন সারাখন
রঙীন স্বপ্ন দেখে যায়।

খুশির শরৎ হেন চিরকাল আসে যেন
বাঙালীর প্রতিটি আলয়ে,
বঙ্গ মানব যত সুখে থাক্ অবিরত
সুখ-প্রীতি-স্নেহ-মায়া লয়ে।

—:o:—

অর্ঘ্য

মণিলাল মৈত্র গোস্বামী, এম. এ.

[সাহিত্যবিনোদ, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, স্মৃতিভূষণ, সিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী]

হে কবি! বিশ্ব বরেণ্য !!
তোমার কবিতা আমার ধ্যান।
মূর্ত্ত্য করেছ কবিতা তোমার
দিয়াছ তাহাতে প্রাণ ॥
কতরূপে তুমি সাজায়েছ তারে
করিয়াছ তারে রাণী।
দেওনাই তুমি নিমেষ তাহাকে
দিয়াছ অস্ফুটবাণী ॥
কত অলঙ্কারে বিভূষিতাকরি
করিয়াছ মধুময়ী।
নাহি প্রশ্বাস বটে উচ্ছ্বাস আছে
অনুপমা ভাবময়ী ॥
আকাশের মত উদার করেছ
দিয়াছ কত সে দান।
বিশ্বের বুকে ভারতী সে তোমার
গাহিতেছে যশোগান ॥
ঋকের মন্ত্র সামের ঝঙ্কার
যজুব ছন্দের মত
এ মরু তোমার করেছ উদ্যান
করিয়াছ রসায়িত ॥
নব বরষের লহ পূজা তুমি
ওহে প্রশান্ত ধীর।
নহি দিনমণি দীনমণি আমি
প্রণমি কর্ম্মবীর ॥

শৈবভারতী

শ্রীনরেশচন্দ্র নাথ

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সভা জ্ঞান-যজ্ঞ-হোমানল জ্বালি
তোমারে করিল যবে আহ্বান,
তুমি এলে এ-বঙ্গভূমিতে নবরূপে
নবমহিমায়—হে শৈবভারতী।
গুণীজন লেখনী প্রসূত শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শনাদি
রচনা সম্ভারে নিত্য তারা করিতেছে
তোমার আরতি।
জ্ঞানদাত্রী বাণীরূপা তুমি, মূলাধারে তোমার বসতি।
ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞান-পরা-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-
আদি-মহাশক্তি তুমি।
লজ্জা-ক্ষমা-ধৃতি-মেধা-স্মৃতি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা
নানা শক্তিরূপে সর্বব্যাপী, সর্বকাল
আছো তুমি সর্বঘটে অন্তরে বাহিরে।
কৈবল্যদায়িনী তুমি ওগো মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী,
জ্বালো-জ্ঞান-যোগ-বহ্নিশিখা অন্তরে অন্তরে।
দূর করো মোহময় অবিদ্যার ঘন আবরণ,
নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ করি দেহ-প্রাণ-মন জাগাও সবারে।
জাগো তুমি মাতা কুণ্ডলিনী।
জ্ঞানোদ্দীপ্ত-বাণী-রূপা—হে শৈব-ভারতী
ছন্দের নৈবেদ্য দিলাম তোমারে প্রণতি।

—:(০):—

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাচীনতা ও মহামায়ার স্বরূপ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

বিদ্যাভূষণ ব্যাকরণতীর্থ কাব্যরত্ন

সকল প্রকার তন্ত্র-শাস্ত্রের মধ্যে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' অতীব সমাদৃত ও সারবান গ্রন্থ। বিশেষতঃ চণ্ডী হিন্দুদের নিকট একটি পবিত্র গ্রন্থ। বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের সমালোচনা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমেই চণ্ডীর প্রাচীনতা সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিন্দু ছাড়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নিকটও চণ্ডী অতি প্রিয় ছিল। প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত যে চণ্ডীখানি নেপালে পাওয়া যায়, তা থেকেই এটা অনুমান করা হয়। 'গীতা' যেমন মহাভারতের অংশ তেমনি চণ্ডীও 'মার্কণ্ডেয়' পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত তেরটি অধ্যায়ই 'চণ্ডী' নামে খ্যাত।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক 'এফ. ইডেন্ পার্টিজার'—সাহেবের মতে চণ্ডী প্রাচীন "বৌদ্ধ-তন্ত্র-গুহ্য-সমাজতন্ত্র"-এর সমসাময়িক কালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণ, যেমন—দণ্ডী, ভবভূতি ও বাণভট্ট প্রমুখ, তাঁদের গ্রন্থে চণ্ডীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বীকার করেছিলেন। এছাড়া চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে 'যবন' এবং ৮ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে "মৌর্য্য" সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। যেমন—

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা॥ (চণ্ডী ১।৫)।

এখানে 'কোলা' অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয় কুল'। 'কোলাবিধ্বংসী' অর্থাৎ 'যবন'। আবার "কালকা দৌহৃদা মৌর্যাঃ" (৮।৬) ইত্যাদি শ্লোকে "মৌর্য"

শব্দটি থাকায় হিসাব মতে এটাই প্রমাণিত হয় যে চণ্ডী নিশ্চয়ই ৩য় বা ৪র্থ শতকে রচিত হয়েছিল। এছাড়া কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বৃহনন্দিকেশর প্রভৃতি পুরাণাদিতে চণ্ডীর উল্লেখ থাকায় চণ্ডীর প্রাচীনতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। অতএব দেবী পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, প্রভৃতি পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ থাকায় এটাই প্রমাণিত হয় যে উপরিউক্ত ঐ সব পুরাণের বহুপূর্বেই মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচিত হয়েছিল।

এবার মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পুরাণে বর্ণিত এই শ্রীশ্রীচণ্ডী অর্থাৎ মহামায়াই ক্যাত্যায়নী, পার্বতী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ভগবতী, কালী, প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রকাশিতা ও আবির্ভূতা। মহামায়া তত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপা চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয় ও মহামায়ার স্বরূপ। মহামায়া তত্ত্বটি স্বদেশে ও বিদেশে বহুল পরিমাণে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছে।

চণ্ডীতেও দেখা যায় মহামায়া শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্র মতে মহামায়া-যোগমায়া-যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া এই শব্দ চতুষ্টয় একার্থ বোধক। ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিনী টীকা মতে যোগনিদ্রাই যোগমায়া। আবার কালিকা পুরাণে (৬।৫৯) ব্রহ্মা যোগনিদ্রার এরকম বর্ণনা দেন, 'যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, মধ্য ও অধোদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অন্তর্হিত হন তাঁহারই নাম যোগনিদ্রা। উক্ত গ্রন্থে ৬।৫৬তে বিষ্ণুমায়ার স্বরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, "যিনি অব্যক্তকে স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন ভাবে ব্যক্ত রূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন তাঁহারই নাম বিষ্ণুমায়া" !

মহামায়া পরমেশ্বরী শক্তি। এই মহাশক্তির দ্বারাই জগতে জন্মলীলাদি ও সৃষ্টি সংহার প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। মহামায়াই জীবের বন্ধন ও মুক্তি সম্পন্ন করেন। ইনি সাধকদের কার্যসাধনের

জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন ও দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি নামে অভিহিতা হন।

নট যেমন লোকরঞ্জনের জন্য রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন রূপে উপস্থিত হয় তেমনি এই দেবী মহামায়া নিরাকারা সত্ত্বেও দেবতাদের কার্য সাধনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্বাদি গুণসমন্বিত নানা রূপ ধারণ করে থাকেন।

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জন হেতবে॥ ৫৮।
তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপানি নির্গুনা স্বগুনানি চ॥ ৫৯॥

দেবী ভাগবতে ৫ম স্কন্দে ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব কর্তৃক মহামায়ার এই স্বরূপ বর্ণনা জানা যায়।

আবার "গর্ভান্ত জ্ঞান সম্পন্নং·······।" কালিকা পুরাণের অন্তর্গত ইত্যাদি শ্লোক গুলি হতে মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে জানা যায় যে, "মাতৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত জ্ঞান সম্পন্ন শিশু প্রসূতি বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যিনি তাহাকে সর্বদা জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্বজন্মের সংস্কার দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে মোহ ও মমতা দ্বারা আবদ্ধ করেন। যিনি জীবকে লোভে ক্রোধে বার বার নিক্ষেপ পূর্বক কামনাসক্ত করিয়া দিবারাত্র চিন্তা যুক্ত, আমোদরহিত ও বাসনাযুক্ত করেন। সেই পরমেশ্বরই 'মহামায়া' বলিয়া কথিত হন"।

দেবী ভাগবতে বর্ণিত চণ্ডীর তিনটি মহাতত্ত্বে দেবীর তিনটি বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণিত হলেও ইঁহারা গুপ্তবতী টীকা মতে এক মহামায়ারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেমন---

নির্গুনা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলা ধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু-সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

(দেবী ভাগবত ১।২।১৯-২০)

অর্থাৎ "যিনি সদা নির্গুনা, নিত্যা ব্যাপিকা, অপরিণামিনী, ও শিবা এবং যিনি ধ্যানমগ্না, বিশ্বধারা ও তুরিয়ারূপে সংস্থিতা, তাঁহারই সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে—মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী"। আবার ভুবনেশ্বরী সংহিতায় জানা যায়—

যদ্ ভয়াদ্ যাতি বাতোঽয়ং সূর্যো ভীত্যা চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নি মৃত্যোবস্তদ্বৎ সা দেবী চণ্ডিকা স্মৃতা॥

অর্থাৎ—'যাঁহার ভয়ে বায়ু বহে, সূর্য-ভীত হইয়া গমন করে এবং ইন্দ্র অগ্নি ও মৃত্যু স্ব-স্ব কার্য করে সেই দেবীকেই চণ্ডিকা বলে"।

শান্তনবী টীকা অনুসারে এই দেবীকে বৈয়াকরণগণ বলেন 'শব্দশক্তি'; নৈয়ায়িকগণ বলেন বস্তুতত্ত্বাবসিত-সিদ্ধিভেদা; শৈবগণ—'শিবশক্তি'; বৈষ্ণবগণ—'বিষ্ণুমায়া'; শাক্তগণ—'মহামায়া'; পৌরাণিকগণ বলেন-'দেবী'।

লক্ষ্মীতন্ত্রে লক্ষ্মীদেবী দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেছেন আমি 'মহালক্ষ্মী'; সায়ম্ভুব মন্বন্তরে সকল দেবতার মঙ্গলের জন্য মহিষমর্দিনী রূপে পুনরায় আবির্ভূতা হয়েছিলাম। দেব শরীরস্থিত আমারই শক্তিকণা সমূহ হতে সম্ভূত পরম শোভারূপ আমি ধারণ করেছিলাম

যাই হোক্-এই 'চণ্ডী' অর্থাৎ মহামায়াই বিভিন্ন সময়ে দেবগণের বিভিন্ন কার্য সাধনের জন্য উমা, পার্বতী, কৌশিকী, মহালক্ষ্মী, কাত্যায়নী প্রভৃতি নামে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

সাধক রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা একটিমাত্র বাক্যের মধ্যেই অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। রামপ্রসাদ বলেছেন, --"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি"। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মতে "যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী"। পরিশেষে বলা যায় বৈদান্তিকগণ যাঁকে ব্রহ্ম বলেন তান্ত্রিকগণ তাঁকেই জগজ্জননী মহামায়া রূপে আরাধনা করেন। অতএব ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ ও অভিন্ন।

বায়ু ভক্ষণ

শ্রীমৎ স্বামী যোগেশ্বরানন্দ সরস্বতী

মানুষ মুখ দিয়ে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে এবং সেই খাদ্যবস্তু থেকে সারাংশ বা প্রাণ স্নায়ুর দ্বারা শোষণ ক'রে জীবন ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে খাদ্য ভক্ষণ। কিন্তু এই খাদ্য ভক্ষণ মানুষের জীবন-ধারণের একমাত্র উপায় নয়। জীবন ধারণ করার জন্য মানুষকে নাসিকার সাহায্যে বায়ু গ্রহণ ক'রে সেই বায়ুর সারাংশ বা প্রাণকেও স্নায়ুর দ্বারা শোষণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে বায়ু-ভক্ষণ।

ভারতীয় যোগিগণ যোগ-সাধনার মধ্য দিয়ে একটা বিস্ময়কর, আপাতঃ অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করেছিলেন। সেই ব্যাপারটি হ'ল খাদ্যভক্ষণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণের সাহায্যেই জীবন ধারণ করা। শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করেই জীবন ধারণ করে আছেন এমন যোগীপুরুষ বর্তমানযুগেও একেবারে বিরল নয়।

এই বায়ুভক্ষণকেই যোগশাস্ত্রে 'প্রাণায়াম' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দীর্ঘ যোগ-সাধনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধি অর্জন করতে পারলে শুধুমাত্র প্রাণায়ামের সাহায্যেই জীবন ধারণ করা সম্ভব হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—প্রাণবায়ুর ধারণা প্রক্রিয়া অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ধারণা প্রক্রিয়া সুদৃঢ়রূপে আসনে বসে অভ্যাস করতে হয়। শ্বাস প্রক্রিয়া হল বায়ু গ্রহণ এবং প্রশ্বাস প্রক্রিয়া হল বায়ু বর্জন। শরীরের শক্তি হল প্রাণ। ফুসফুসের গতিকে আয়ত্তে এনে আমরা প্রাণকে আয়ত্তে আনতে পারি। প্রাণকে আয়ত্তে আনলে মনও সহজে আয়ত্তে আসে; যেহেতু প্রাণ এবং মন উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত। গভীর নিদ্রার সময় প্রাণ এবং মন উভয়ই স্বরূপতঃ বিশ্রাম পায়। প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণ এবং আপন বায়ুকে শরীরে শোধন করা যায়।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলেছেন—জীবনের গতিকে প্রাণায়ামের সাহায্যে আয়ত্বে আনা যায়। পূরকের সাহায্যে বায়ু শরীরে প্রবেশ করে, রেচকের সাহায্যে শরীরস্থ বায়ু বাইরে আসে এবং কুম্ভকের সাহায্যে বায়ু শরীরে ধারণ করা হয়। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম বলা হয়েছে। যোগশাস্ত্রের এই প্রাণায়ামকে শ্বাস-প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও বলা যায়। বায়ুব প্রাণ শক্তিকে আয়ত্বে আনাকে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাণায়াম বলা হয়েছে। প্রাণকে শক্তির আসল উৎস বলা হয়, ইহাকে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ন্তাও বলা হয়। যমকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ। জীবনের সৃষ্টির পিছনে প্রকৃতির যে উৎস সেই প্রাণ-শক্তি জীবনকে ধারণ করে, পরিবর্তন করে এবং জীবনের সমতা রক্ষা করে। মানুষ তার প্রাণ-শক্তির বেশীরভাগ অংশ বায়ু হতে গ্রহণ করে। এই বায়ু গ্রহণ ব্যতীত মানুষ খাদ্য দ্রব্য হতে, জল হতে, এবং ত্বকের সাহায্যেও এই প্রাণশক্তি গ্রহণ করে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সাহায্যে বায়ু হতে প্রাণশক্তি আহরণ করা হয়।

মানবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলে ফুসফুসের সাহায্যে। ফুসফুস হল দু'টি স্পঞ্জের মত শ্বাস যন্ত্র যা বক্ষ গহ্বরে অবস্থিত। এই যন্ত্রেব সাহায্যে অক্সিজেনকে রক্তের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে বায়ু হতে প্রাণ শোষণ করা হয়। দুটি ফুসফুস ছশো লক্ষ কোষকে বহন করে। এই ছশো লক্ষ কোষের প্রতিটি কোষ যদি চওড়া অংশ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তা একশো বর্গফুট জায়গা দখল করতে পারে। সাধারণতঃ আমরা প্রতি মিনিটে ১৩ হতে ২০ বার শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করি অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার বার। যখন ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করি তখন তার পরিমাণ এই সংখ্যা হতে কম হয়। যোগীরা বলেছেন—মিনিটে ১৫ বার অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় ২১৬০০ বার শ্বাস গ্রহণ-বর্জন করা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় বায়ুর প্রাণ-শক্তি স্নায়ুর দ্বারা শোষিত হয়। তাই স্নায়ুমণ্ডলীর এই প্রাণ শোষন কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহের জন্য

শ্বাস-প্রশ্বাস খুবই ধীরে ধীরে হওয়া উচিত। কারণ, তাতে প্রচুর প্রাণ-শক্তি ঐ স্নায়ুমণ্ডলী শোষণ করতে পারে। বেশীর ভাগ প্রাণই শোষিত হয় যে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী এসে ফুসফুসের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা।

প্রাণায়াম তিনটি অংশে সাধিত হয়। এক—বাইরের বায়ু গ্রহণ (পূরক), দুই—ঐ বায়ু ধারণ (কুম্ভক) এবং তিন—অভ্যন্তরের বায়ুকে ত্যাগ (রেচক)। এই পদ্ধতিকে দেশ কাল ও সংখ্যা দ্বারা গণনা করা হয়। বায়ু ত্যাগকে বলা হয় রেচক, বায়ু গ্রহণকে বলা হয় পূরক, এবং বায়ু ধারণকে বলা হয় কুম্ভক। এই প্রাণায়াম তথা বায়ুভক্ষণ জীবনকালকে বর্দ্ধিত করে, জীবনকে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন করে, এবং শরীরের প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত করে। গ্রহণ-বন্ধ-ত্যাগ প্রাণায়ামের এই ক্রিয়াগুলি প্রাণকে সংরক্ষণ করে, শরীরের মধ্যস্থ এবং বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে। প্রাণায়াম প্রাণকে চক্রে চক্রে ধারণ করে। সগর্ভ প্রাণায়াম কোন মন্ত্রের সঙ্গে জপ করে করতে হয়। সঠিক সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে অনুশীলনের উপর।

বেদান্ত শাস্ত্র অনুযায়ী শরীরের অভ্যন্তরের সমস্ত আবর্জনা ত্যাগ করার নাম রেচক, শরীরের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করার নাম পূরক, এবং উহাকে স্থির ও একই দিকে প্রবাহিত করার নাম কুম্ভক। চিত্ত, মন এবং প্রাণ বা বায়ু-শক্তির পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যদি একটিকে আয়ত্ত্বে আনা যায় তাহলে সবগুলোই আয়ত্ত্বে আসে। বায়ু ও অগ্নি যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ঠিক তেমনই প্রাণ ও চিত্ত পরস্পর সংযুক্ত। যেমন বায়ু অগ্নিকে পছন্দ করে, তেমনি প্রাণ চিত্তের দিকে ধাবিত হয়। হঠযোগ প্রাণকে সংযত করে আত্ম-স্বরূপকে জ্ঞাত করায়, আর রাজযোগ চিত্তকে সংযত করে ব্রহ্মকে জ্ঞাত করায়। প্রাণকে সংযত করলে চিত্তও সংযত হয়। প্রাণই সমস্ত শক্তির উৎস, প্রাণই বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মানুষের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে থাকে তাই প্রাণশক্তি, প্রাণশক্তি

সর্বব্যাপী। তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, সমস্তই প্রাণ হতে উদ্ভূত, শারীরিক এবং মানসিক শক্তিও প্রাণ হতে উদ্ভূত। সমস্তই নির্গত হয় আত্মার উৎপত্তিস্থল হতে। প্রাণ সমস্ত জগতেই ব্যাপ্ত। ঊর্দ্ধ, অধঃ, সমস্ত কাজ, গতি, জীবন, এমন কি শূন্যস্থলও প্রাণের বিকাশ-স্থল। ইহা মনের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে ; ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং জানতে হবে প্রাণের ক্ষুদ্রতম অংশকেও কিভাবে আয়ত্ত্বে আনা যায়। প্রাণের ক্ষুদ্রতম অংশ আয়ত্ত্বে আনতে পারলেই সমগ্র প্রাণ আয়ত্ত্বে আসবে ; আর তখনই প্রাণের নিয়ন্ত্রণে বিকশিত বিশ্ব-প্রকৃতি সহজেই ধরা দেবে। যে যোগী এই গুপ্ত ব্যাপারে অধিগত হয়েছেন ; তিনি কোন শক্তিকেই ভয় করেন না। কারণ, সমস্ত শক্তির উপর তাঁর অধিকার জন্মেছে এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত শক্তি তাঁর হস্তগত। প্রাণের কার্য্যবিধি, সিষ্টোলিশ ও ডায়োষ্টলিশ প্রক্রিয়া হৃদ-যন্ত্রের উপরও লক্ষিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়, রেচন ক্রিয়ার সহায়, শুক্রধাতু নির্গমনের সহায়, পরিপাক রস-নির্মাণের সহায়। জিহ্বা দ্বারা কথা বলার সময় ; চিন্তার সময়, অনুভবের সময়ও প্রাণের কার্য্যবিধি লক্ষিত হয়। শরীর এবং মনের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার কার্য্যকে আয়ত্ত্বে এনে সমস্ত প্রকার গতি এবং শক্তিকে আয়ত্ত্বে আনা যায়। অনুভব করতে হবে তাহাই প্রাণ যাহা শ্বাস-প্রশ্বাস। মনকে একই চিন্তায় নিয়োজিত করে শ্বাস গ্রহণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভব না হয় ততক্ষণ ধারণ এবং তারপর ধীরে ধীরে ত্যাগ এইভাবে কোনরূপে জোর না করে শ্বাসের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিমজ্জিত আছে তাকে আয়ত্ত্বে আনতে হবে। তাহলেই যোগী হওয়া যাবে এবং চিরস্থায়ী আনন্দ, আলো এবং শক্তিলাভ করা যাবে।

প্রাণের এই যে স্পন্দন বা গতি তা মনের সংকল্প বা চিন্তাকে প্রবাহিত করে। প্রাণের উৎসস্থল হৃদয়। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। গুহ্যদ্বারে অপান বায়ু; নাভিদেশে সমান বায়ু, গলদেশে

উদান বায়ু, হৃদদেশে প্রাণ বায়ু এবং সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত ব্যান বায়ু। প্রাণের রং লাল। ধ্যান করতে হবে সেই ঐশ্বরিক আলোকে।

সগর্ভ প্রাণায়ামে ষোলবার ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে, পিঙ্গলা বা দক্ষিণ নাসাপুট বন্ধ করে ইড়া বা বাম নাসাপুট দিয়ে বায়ু গ্রহণ করতে হবে, তারপর চৌষট্টিবার ঐ মন্ত্র জপ করতে করতে উভয় নাসাপুট অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা বন্ধ করে বায়ুকে ধারণ করতে হবে এবং অবশেষে বত্রিশ বার ঐ মন্ত্র জপ করতে করতে ইড়া বা বামনাসাপুট বন্ধ করে পিঙ্গলা বা দক্ষিণনাসাপুট দিয়ে বায়ু ত্যাগ করতে হবে। বিপরীতক্রমে পুনরায় এই প্রক্রিয়া করতে হবে। অর্থাৎ ষোলবার ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ইড়া বা বামনাসাপুট বন্ধ করে পিঙ্গলা বা দক্ষিণনাসাপুট দিয়ে বায়ু গ্রহণ করতে হবে, তারপর চৌষট্টিবার ঐ মন্ত্র জপ করতে করতে উভয় নাসাপুট বা ইড়া পিঙ্গলা বন্ধ করে বায়ুকে ধারণ করতে হবে এবং অবশেষে বত্রিশবার ঐ মন্ত্র জপ করতে করতে পিঙ্গলা বা দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ করে ইড়া বা বামনাসাপুট দিয়ে বায়ু ত্যাগ করতে হবে। তাহলে একবার সগর্ভ প্রাণায়াম করা হবে।

এইভাবে এক সঙ্গে বেশ কয়েকবার সগর্ভ প্রাণায়াম করতে হবে। এই সগর্ভ প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণশক্তিকে আয়ত্তে আনা যায়।

সর্বক্ষেত্রে বামনাসাপুট বা ইড়া অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা এবং দক্ষিণনাসাপুট বা পিঙ্গলা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ করতে হয়।

আর এক ধরণের প্রাণায়াম আছে যাকে যোগশাস্ত্রে সূর্য্যভেদ বলা হয়েছে। এই প্রাণায়াম সিদ্ধাসনে বসে চোখ বন্ধ করে করতে হয়। প্রথমে বামনাসাপুট বন্ধ রেখে ধীরে ধীরে কোন শব্দ না করে দক্ষিণ-নাসাপুট দিয়ে যতক্ষণ সম্ভব আরামের সঙ্গে বায়ু গ্রহণ করতে হয়। তারপর উভয় নানাপুট বন্ধ রেখে বায়ু ধারণ করে চিবুককে বক্ষের সঙ্গে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত করে রাখতে হয়। ততক্ষণই বায়ু ধারণ করতে হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর ঘর্মাক্ত না হয়। অবশেষে চিবুককে উত্তোলন পূর্বক ধীরে ধীরে দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ রেখে বামনাসাপুট দিয়ে কোনরূপ

শব্দ না করে বায়ু ত্যাগ করতে হয়। বিপরীতক্রমে এই প্রক্রিয়া পুনরায় করতে হয়। অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ রেখে বামনাসাপুট দিয়ে ধীরে ধীরে বায়ু গ্রহণ করতে হয়। তারপর উভয় নাসাপুট বন্ধ রেখে বায়ু ধারণ করে চিবুককে বক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে হয় এবং অবশেষে চিবুককে উত্তোলন পূর্বক বামনাসাপুট বন্ধ রেখে দক্ষিণনাসাপুট দিয়ে ধীরে ধীরে বায়ু ত্যাগ করতে হয়। এইভাবে একবার সূর্য্যভেদ প্রাণায়াম হয়। সব প্রাণায়ামই বেশ কয়েকবার করতে হয়। এই প্রাণায়াম মস্তককে পরিশুদ্ধ করে, রোগ জীবাণু ধ্বংস করে, অতিরিক্ত বায়ুকে নষ্ট করে, বাতরোগ বিনষ্ট করে। ইহা মৃত্যুকে ধ্বংস করে, কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে।

—:o:—

যোগী গোরক্ষনাথ

(নাটিকা)

[যোগী গোরক্ষনাথ ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় গাছের তলায় উপবিষ্ট। সেই সময় তাঁর চিত্তবৃত্তি অন্তর জগতে বিচরণ করছিল। আপন মনেই কথা বলছিলেন তিনি। ভারতের সম্রাট নবযুবক মহারাজ ভর্তৃহরি তখন একটি কালো হরিণের পিছনে পিছনে নিজের ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন শিকারোদ্দেশ্যে। হঠাৎ গোরক্ষনাথের স্বগতোক্তি শুনতে পেয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনতে লাগলেন—]

গোরক্ষনাথ—আশীর্বাদ ভিক্ষা কর! প্রার্থনা কর!! প্রার্থনায় ধরা ফেটে যায়, প্রার্থনায় আকাশ উড়ে যায়। যে কাজ কেউ করতে পারেনা তা প্রার্থনাই করে দেয়। প্রার্থনা কর, প্রার্থনা।

ভর্তৃহরি—(স্বগত) কোনও মহাত্মা বলে মনে হচ্ছে।

গোরক্ষনাথ—যদি তুই তাকে দেখেই ফেলবি, তাহলে তার গোপনীয়তা আর বজায় থাকবে কি ? বিচিত্রের পর্দা তো এইজন্যেই, যাতে অন্য কেউ দেখে না ফেলে।

ভর্তৃহরি—ইনি কোনও তত্ত্বজ্ঞানী বলে মনে হয়।

গোরক্ষনাথ—সারা জগৎ পরমাত্মার অন্তরে এবং পরমাত্মা মহাত্মার অন্তরে। অতএব মহাত্মা কি পরমাত্মার চেয়ে বড় নয় ?

ভর্তৃহরি—এবারে দেখছি আরও সুদূর কল্পনা! জীবাত্মা আর মহাত্মা দুই-ই পরমাত্মার ভিতর থাকে, যেমন—চাঁদ আর তারারা থাকে আকাশের ভিতরে।

গোরক্ষনাথ—শক্তির উপাসক রাবণ হয়ে যায় এবং শিবের উপাসক রামও হয়ে যান।

ভর্তৃহরি—এদিক থেকে আমিও দেখছি এক রাবণ—কেন না, আমি রাজা হয়েও শক্তির উপাসক।

গোরক্ষনাথ—এই বিশাল পৃথিবীতে সবাই নারী—শুধু নারীই। আর তাদের ইচ্ছা এই জগতে যারা থাকে তারা সবাই নারী হোক ?

ভর্তৃহরি—এ কথাটার অর্থ বোঝা গেল না। লোকটা কিছুটা খামখেয়ালী বলেও মনে হয়।

গোরক্ষনাথ—এই বিশাল বিশ্বে সব পাগল বাস করে। যদি কেউ জ্ঞান ফিরে পায় তাহলে পাগলেরা তাকে পাগল বলে থাকে, কারণ তারা নিজেরাই পাগল।

ভর্তৃহরি—সবাই পাগল ? এবার দেখছি পাগলের প্রলাপ শুরু করেছে। মনে হয় চিন্তা করতে করতে লোকটা পাগলই হয়ে গেছে।

গোরক্ষনাথ—ধরা বলে আমি বড়ো, আকাশ বলে আমি বড়ো। স্ত্রীলোক বলে আমি বড়ো, আর পুরুষ বলে আমি বড়ো। আসলে বড়ো জমিও নয়, আর আকাশও নয়। যে নিজেকে বড়ো ভাবে সে ভুল করে ; আসলে এই বড়োর দাবী দুজনকেই ভুল পথে চালিত করে।

ভর্তৃহরি—ওহে শুনছো ? তুমি এদিকে কোনও কালো হরিণ দেখতে পেয়েছিলে ?

গোরক্ষনাথ—আমি এখানে থাকবো না। যেখানে সবাই অন্ধ, সেখানে আমি থাকবো না। যেখানে সবাই পাগল, সেখানে কি করে থাকবো আমি ? যে গ্রামে সবাই নেশাখোর সেই গ্রামে কেমন করে দিন কাটবে আমার ? না, না, এই নারীর জগতে কখনোই নিবাস হতে পারেনা আমার।

ভর্তৃহরি—ওহে, তুমি কে ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না ?

গোরক্ষনাথ—আপনার অপ্রকাশিত নাটক 'বিধান'-এর দুই ভাগ—প্রথম, বিয়োগান্ত নাটক এবং দ্বিতীয় মিলোনান্ত নাটক। বিয়োগান্ত নাটক আগে মঞ্চস্থ হলো, মিলনান্ত নাটক পরে দেখানো হবে। কিন্তু এই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা কখন পড়বে ? এর সমাপ্তি কোন্ শতাব্দীতে ? এমন না হয় যেন, যে

আপনি বিয়োগান্ত নাটকের সময়টাই গেলেন ভুলে। আপনার কোন দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু ভুলের ত্রুটি তো আছেই।

ভর্তৃহরি—আচ্ছা, এখানে কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে?

গোরক্ষনাথ—এই পৃথিবীটা মস্ত বড়। এই বিশাল মাটির দেশ জলের দেশের মাঝামাঝি ঘুমোচ্ছে, আর জলের দেশ আগুনের দেশে দোল খাচ্ছে। তবুও এই দেশের মানুষগুলো সব 'কীটাণু', নিশ্চিন্ততার সন্ধানে তারা বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিশাচর!

ভর্তৃহরি—পুরো পাগল বলেই মনে হচ্ছে। আমি জানতে চাইছি আগ্রার খবর, আর এ বলছে দিল্লীর খবর। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, অথচ, এখনও হরিণের কোন পাত্তা নেই।

[ইতমধ্যে গোরক্ষনাথের সেই পালিত হরিণ সেইখানে এসে উপস্থিত হলো—যার জন্য মহারাজ এত ব্যস্ত হয়েছিলেন। তাকে দেখামাত্র মহারাজ একটি তীর নিক্ষেপ করলেন আর হরিণটি তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে সেখানেই যোগী গোরক্ষনাথের কোলে গিয়ে পড়ল। ফলে তাঁর চিত্তবৃত্তি অন্তর জগৎ ছেড়ে আবার বাহ্যজগতে ফিরে এল। হরিণকে মৃত অবস্থায় দেখে গোরক্ষনাথ মহারাজকে বললেন—]

গোরক্ষনাথ—তুমি কে?

ভর্তৃহরি—ভারতের উদয়-অস্তের আমি রাজা।

গোরক্ষনাথ—ভারতের উদয় যখন হবে, তখন হবে, কিন্তু তোমার অস্ত এখনই হয়ে যাবে।

ভর্তৃহরি—কেন?

গোরক্ষনাথ—এই নিরপরাধ পোষা হরিণটিকে তুমি মারলে কেন?

ভর্তৃহরি—আমি রাজা। যাকে ইচ্ছে হয় মারি।

গোরক্ষনাথ—আমি তোমাকে রাজা বলে মানি না। তুমি শূর নও ক্রুর।

ভর্তৃহরি—তুমি না মানলে আমার কি আসে যায়?

গোরক্ষনাথ—আমরা না মানলে, তুমি কেমন করে রাজা হয়ে থাকবে?

ভর্তৃহরি—আচ্ছা!

গোরক্ষনাথ—তা নয় তো কি ?

ভর্তৃহরি—কি করবে আমার তুমি ?

গোরক্ষনাথ—যা তুমি হরিণের করেছ ঠিক তাই।

ভর্তৃহরি—তোমার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই—তবে আমায় মারবে কি করে ?

গোরক্ষনাথ—অস্ত্র দিয়ে মারে নপুংসকেরা। আমার প্রার্থনাই আমার তরবারি। প্রার্থনায় জমিও ফেটে যায়, তোমার মাথা ফেটে যাওয়া এমন কি বড়ো কথা ?

ভর্তৃহরি—আমি কি কোনও অপরাধ করেছি ?

গোরক্ষনাথ—গুরুতর অপরাধ।

ভর্তৃহরি—কি ?

গোরক্ষনাথ—মারতে সেই পারে, যে পারে জীবন দিতে। জীবন যে দিতে পারে না, তার মারমার অধিকার নেই, হুকুম নেই, আইন নেই।

ভর্তৃহরি—মরে আবার কেউ বাঁচে নাকি ? এ তো একেবারেই প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার।

গোরক্ষনাথ—প্রকৃতির নিয়মের কি জান তুমি ? প্রকৃতির নামই শুনেছো শুধু, তাকে কি কখনো দেখেছো ? বিষ খেয়ে মানুষ মরে যায়, কিন্তু শিব তো অমর হয়ে গেলেন। মূল ছাড়া কোনও গাছ হয় না, কিন্তু অমর লতা তো মূল ছাড়াই হয়ে থাকে ? সম্ভব এবং অসম্ভব দুই নিয়মের নিয়মাবলীর মালা যে প্রকৃতি পরে আছে তার নামটুকুই শুনেছো শুধু না কিছু জানোও।

ভর্তৃহরি—অত বকবক করার সময় নেই আমার। হরিণ নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে হবে।

গোরক্ষনাথ—হরিণকে নিয়ে ? হরিণকে ছেড়েই রাজধানী যাও তো একবার দেখি ? একে না বাঁচিয়ে তুলে তুমি এখান থেকে এক পাও নড়তে পারবে না। রাজধানীতে যাবার চেষ্টা না করে

বরং বলি হবার জন্য প্রস্তুত হও। হাজার কথার এক কথা। একে বাঁচিয়ে তোল, নয়ত মরবার জন্য তৈরী হও।

ভর্তৃহরি—তুমি কে ?

গোরক্ষনাথ—প্রজাদের নিয়ে ইচ্ছেমতো ভাঙাগড়ার খেলা রাজারা খেলে থাকে ; আমরা যোগীরা সেই রাজাদের ভাঙাগড়ার খেলা খেলি।

ভর্তৃহরি—তুমি কি পারবে এই হরিণটাকে জীবিত করতে ?

গোরক্ষনাথ—যদি জীবিত করতে পারি, তবে ?

ভর্তৃহরি—তবে ভারতের এই সম্রাট তোমার গোলাম হয়ে যাবে।

গোরক্ষনাথ—কামিনী, কাঞ্চন আর কীর্তির আপাতকমনীয় ত্রিমূর্তির রাজলোভ ছেড়ে নম্রতা, ব্রহ্মচর্য আর ত্যাগের আপাত ভয়াবহ ত্রিমূর্তির ভক্তিযোগে আসতে রাজী আছো তুমি ?

ভর্তৃহরি—নিশ্চয় আসবো আমি।

[অমরাবস্থা বা প্রাণসঞ্চারের আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী আচার্য গোরক্ষনাথ সেই মৃত হরিণটিকে সত্যিসত্যিই জীবিত করে দিলেন।]

গোরক্ষনাথ—রাজা ভর্তৃহরি !

ভর্তৃহরি—বৎস ভর্তৃহরি বলুন, বাবা।

গোরক্ষনাথ—রাজা বড় না যোগী বড় ?

ভর্তৃহরি—রাজা কেবল মারতে পারে, কিন্তু যোগী মারতেও পারে আবার প্রাণ ফিরিয়েও দিতে পারে।

[পারসনাথ সরস্বতী রচিত
'যোগী গোরক্ষনাথ'-এর বঙ্গানুবাদ।]

অনুবাদক { দেশপ্রিয় বসু ও ব্রজেশ মিশ্র

নাথ তীর্থ গীর্ণার

শ্রী গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন

সৌরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রদেশের অন্তর্গত জুনাগড় শহরের চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে গীর্ণার পর্বতমালা অবস্থিত। পর্বতমালাটিকে কেন গীর্ণার বলা হয়, তাহা স্থানীয় জনগণের নিকট অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারিলাম না। মনে হয় পর্বতটির আদি নাম গিরিনাথ পর্বত। যোগীগুরু দত্তাত্রেয় নাথই এই পর্বত তীর্থের প্রধান দেবতা। সম্ভবতঃ দত্তাত্রেয়ই এককালে গিরিনাথ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারই নামানুসারে পর্বতটির নাম গিরিনাথ হইয়া থাকিবে। পরে ধ্বনি বিপর্য্যয়ে ক্রমে গির্‌নাথ ও পরিশেষে গির্‌ণার বা গীর্ণার হইয়াছে। পর্বতটিতে বহু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যোগীগুরু দত্তাত্রেয়ের মন্দিরই প্রাচীনতম ও প্রধানতম। দত্তাত্রেয় নাথপন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজযোগী।

গীর্ণার পর্বতের পাদদেশে দুইটি ধর্মশালা স্থাপিত হইয়াছে। একটির নাম সনাতন হিন্দু ধর্মশালা, অপরটির নাম দিগম্বর জৈন ধর্মশালা। পর্বতের পাদদেশে কয়েকটি দোকান এবং অল্প কয়েকঘর লোকের বাস। ভারতের অপরাপর জঙ্গলে অধুনা সিংহ বিলুপ্ত প্রায় একমাত্র এই গীর্ণার পর্বতমালার গভীর জঙ্গলে কিছু সংখ্যক সিংহের বসতি আছে।

পর্বতমালার উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট। গীর্ণার পর্বতের দর্শনীয় স্থান সকল পরিদর্শন করিতে হইলে প্রায় নয় হাজার পিঁড়িয়া বা সিঁড়ি আরোহণ করিতে হয়, অসমর্থ ব্যক্তিগণের জন্য ডুলির ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যোদয়ের সময়ে পদযাত্রা আরম্ভ করিলে সকল স্থান দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নের মধ্যেই ফিরিয়া আসা যায়। তবে উপরে থাকিবার জন্য চট্টি বা ধর্মশালাও আছে।

পর্বতের পাদদেশে ধর্মশালার পার্শ্বেই কৃষ্ণমন্দির। মন্দিরটি অধিক প্রাচীন নয়। পর্বতারোহণের গেট পার হইয়া মাত্র ৫০টি সিঁড়ি আরোহণ করিলেই চোখে পড়ে রোকরীয়া হনুমানজীর মন্দির। ১০০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে যে চত্তর দেখা যায় তাহা পাণ্ডব ডেরী (থাকিবার স্থান) নামে খ্যাত। ২০০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে যে মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা শীতলা মাতাজীকা মন্দির নামে খ্যাত। ১৮০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে খোড়িয়া মাতাজীকা স্থাপন বা মন্দির দৃষ্ট হয়। ২৪০০ সিঁড়ি উঠিলে ভর্ত্তৃহরি গুফা বা গুম্ফা দৃষ্ট হয়। নাথযোগী রাজা ভর্ত্তৃহরি এক সময়ে এই স্থানে আসিয়া কিছুকাল সাধনা করিয়াছিলেন। ২৫০০ সিঁড়ি উঠিলে যে স্থানটি দৃষ্ট হয়, তাহা মালী পরব নামে খ্যাত; এই স্থানে রামজীর একটি মন্দির ও রাণক দেবী পাথর অবস্থিত। ৪২০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে সুভদ্রা বাইকী চরণ পাদুকা এবং শ্রীকৃষ্ণ পুত্র শাম্বের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ৪৩০০ সিঁড়ি উঠিলে দত্তাত্রেয় ভগবানকা গুম্ফা; এই স্থানে ভগবান দত্তাত্রেয় সাধনা করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ৪৫০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরে তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা জৈন ধর্মাবলম্বীগণের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান।

৪৭০০ সিঁড়ি উঠিলে যে স্থানটি দৃষ্ট হয়, তাহা গোমুখী গঙ্গা নামে খ্যাত। ৫০০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে মহালক্ষ্মীজীকা মন্দির দৃষ্ট হয়। ৫২০০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে দৃষ্ট হয় মহাকালী মন্দির। স্থানটিকে অনেকে সাচা কাকা বলে। ৫৫০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে দৃষ্ট হয় পর্বতের অন্যতম প্রধান দেবী অম্বাজীমাতার মন্দির, দেবী দুর্গাকে সৌরাষ্ট্র প্রদেশে অম্বাজীমাতা বলে। ৬০০০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে যে স্থানটি দৃষ্ট হয় তাহা গোরক্ষনাথজীকা ধুনা নামে খ্যাত। কথিত আছে যে শিবাবতার গোরক্ষনাথ একসময়ে এই স্থানে ধুনি জ্বালাইয়া তাঁহার আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যোগীগুরু

ভগবান দত্তাত্রেয়ের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং কিছুকাল রাজযোগ অভ্যাসে নিমগ্ন থাকেন। ৬৮০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে কমণ্ডুল কুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড দৃষ্ট হয়।

৭৫০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে ভগবান দত্তাত্রেয়ের মন্দির। মন্দির মধ্যে ভগবান দত্তাত্রেয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। অস্মদ্দেশে আমরা যাহাকে ত্রিনাথের মূর্তি বলি, তাহাই ভগবান দত্তাত্রেয়ের মূর্তি। মূর্তির তিনটি মস্তক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক। রাজযোগী দত্তাত্রেয় নাথ একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে সর্বসাধারণের পূজা পাইয়া থাকেন। সৌরাষ্ট্রের বহুস্থানেই ভগবান দত্তাত্রেয়ের মন্দির ও চরণ পাদুকা দৃষ্ট হয়। এমনকি দ্বারকায় দ্বারকাধিপতি রণছোড়জীর মন্দিরেও ভগবান দত্তাত্রেয়ের মূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। সমগ্র সৌরাষ্ট্র প্রদেশে দেবগণের মধ্যে রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণ, সোমনাথ মহাদেব এবং একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে দত্তাত্রেয়ই প্রধান দেবতা।

৪৭০০ সিঁড়ি অর্থাৎ গোমুখী-গঙ্গা হইতে ভিন্ন পথে ১০০ সিঁড়ি উঠিলে আনন্দগুম্ফা। ৪০০ সিঁড়ি উঠিলে সেবাদল আশ্রম দৃষ্ট হয়। স্থানটিকে ভৈরবজপ বলে। ৬০০ সিঁড়ি অতিক্রম করিলে পড়ে পাথরচটি। ১৫০০ সিঁড়ি আরোহণ করিলে দেখা যায় শেষাবন। ঐ স্থান হইতে দুই কিলোমিটার দূরে ভরতবন এবং এক কিলোমিটার দূরে হনুমানধারা অবস্থিত।

পর্বতোপরি উপরিউক্ত দর্শনীয় স্থানসমূহ ব্যতীত গীর্ণার রোডে ভগবান মন্দির, মৃগীকুণ্ড, দামোদর কুণ্ড, অশোক শিলা লেখ (সোনাপুরী), দেওয়ানচকে মিউজিয়ম ও রাজকোট রোডের উপর সক্করবাগে জু গার্ডেন প্রভৃতি কয়েকটি দর্শনীয় স্থান আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং শৈব ও জৈন ধর্মের স্মৃতিবিজড়িত গীর্ণার পর্বতটি হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থস্থান

———

অভিলাষ

শ্রীবলরাম নাথ

আমি চাহি জগতের প্রতিটি আলয়,
ঈশ্বর সেবার তরে হোক দেবালয়।
প্রতিটি মানব হোক ইষ্টগত প্রাণ,
চারিত্রিক পবিত্রতায় হোক বলীয়ান
অসত্য, আলস্য আর হীনতা নীচয়
শ্রীপ্রভুর মহানামে হয়ে যাক্ ক্ষয়।
প্রতি মানবের গুপ্ত হৃদি বীণা তারে,
উঠুক্ শান্তির রাগ নূতন ঝংকারে।
সমীরণ মৃদু তানে ছড়াক্ সৌরভ,
লভুক্ পৃথিবী তার যথার্থ গৌরব।
জনারণ্য পরিপূর্ণ প্রতিটি শহরে,
হাট-ঘাট-মাঠ তথা পল্লী কুঁড়েঘরে
সর্বত্র বিশ্ব-পতির মধুমাখা নাম,
বিরাজিত, মুখরিত হোক অবিরাম।
বীরত্ব, মহত্ত্ব, নিষ্ঠা, সচ্চরিত্র ধন,
সমগ্র বিশ্ববাসী করুক আহরণ।
সমুজ্জ্বল রত্ন সম উজ্জ্বলতারাশি,
মানব চরিত্র হতে উঠুক ঝলসি।

—:(*):—

কে গায় ঐ ?

ধীরেন দেবনাথ, এম্. এস-সি., বি. এড.

লাল রংয়ের Ambasador গাড়ীটা শাঁ শাঁ শব্দে এসে যখন 'পান্থ-নিবাস' নামের ডাকবাংলোটার সামনে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গাড়ী থেকে স্যুটকেস হাতে নেমে এলো অল্পবয়সী এক সুদর্শন যুবক—অভিনেতা-পরিচালক শতদ্রু সেন। শতদ্রু তার সাম্প্রতিক ছায়াছবি 'কায়াহীনের কান্না'র স্যুটিং এর জন্য লোকেশন নির্বাচন করতে এখানে এসেছে। গাড়ীর হর্ণ শুনে ভৃত্য দৌড়ে এলো বাংলোর বাইরে। মুখোমুখি হতেই শতদ্রু জিজ্ঞেস করল—'কেমন আছো ?' ভৃত্য একগাল হেসে শতদ্রুর হাত থেকে স্যুটকেসটা নিতে নিতে জবাব দিল—'আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্বাদে...... ...।' 'আমি আসব তা কী তুমি জানতে ?'—শতদ্রুর একথার উত্তরে ভৃত্য বলল—'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। আমাদের ম্যানেজারবাবু গত পরশু আপনার আসার কথাই বলেছেন।' ম্যানেজারবাবু কোথায় শতদ্রু জানতে চাইলে ভৃত্য জানাল যে তিনি বাড়ী চলে গেছেন। 'আমার জন্য ঘর ঠিক করে রেখেছে।' 'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। চলুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।' শতদ্রু ভৃত্যের পিছু পিছু তার ঘরের দিকে চলল। ঘরে ঢুকে ভৃত্য সব কিছু দেখিয়ে-বুঝিয়ে দিয়ে শতদ্রুকে বলল—'বাবু! আপনি জামা কাপড় ছেড়ে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে আসুন, আমি ততক্ষণে আপনার জলখাবারের ব্যবস্থা করি।' শতদ্রু বলল—'তাই হোক, তুমি যাও।'

গরম লুচি খেতে খেতে শতদ্রু বলল—'তোমার নামটা তো জানা হলো না।' ভৃত্য মুচকি হেসে বলল—'নাম আমার—রাখহরি। আজকালকার তুলনায় নামটা একটু বড়ই হয়েছে ; তবে এত বড় নামে

ডাকতে আপনার অসুবিধা হলে শুধু হলে 'হরি' বলে ডাকবেন।' 'তাহলে 'রাখ'র কোন প্রয়োজন নেই?'—এই বলে শতদ্রু হো হো করে হেসে উঠল।

রাতের আহারাদির পর শতদ্রুর সাথে রাখহরির বিস্তর কথা হলো। রাখহরি যখন কথা প্রসঙ্গে জানতে পারল অতিথি একজন সিনেমার লোক তখন তার মনে আনন্দ আর ধরে না। ও আরো আনন্দিত হলো এই কথা শুনে যে ওদের গাঁয়েই সিনেমার স্যুটিং হবে এবং ওকেও সেই সিনেমায় অভিনয় করতে হবে। অনেক রাত অবধি গল্প করার পর শতদ্রু শুয়ে পড়ল। রাখহরিও নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল কিন্তু আনন্দে তার ঘুম যেন আর আসছে না। সিনেমায় অভিনয় সে কী চাট্টিখানি কথা। শত চেষ্টা করেও রাখহরি সে রাতে ঘুমোতে পারল না।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন নীরব-নিস্তব্ধ। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজার সময় সংকেত ঘোষিত হলো। হঠাৎ শতদ্রুর ঘুম ভেঙে গেল দূর থেকে ভেসে আসা কোন মেয়েলী কণ্ঠের সকরুণ অথচ কামনা ভেজা গানের সুরে।

বঁধু কেন এলো না!
তবে কী আমার মনের খবর
আজো সে পেলো না।
বিরহের বেদনাতে—
জ্বলি এই মধুরাতে,
মিলন-বাসরখানি
সাজানো যে হলো না॥

শতদ্রু চিৎকার করে ডাকল—'রাখহরি।' শতদ্রুর ডাকে রাখহরি তাড়াতাড়ি শতদ্রুর ঘরে এসে জিজ্ঞেস করল—'কী হয়েছে বাবু, আমাকে ডেকেছেন কেন?' শতদ্রু কম্পিত কণ্ঠে বলল—'কে গায় ঐ?' রাখহরি উত্তর দিল—'আমিতো ভুলেই গেছিলাম, আজ যে

ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত, আপনি ভাগ্যবান বাবু, তাইতো ওর গান শুনতে পেলেন; হীরা বাঈর গান।' 'হীরা বাঈ—কে সে হীরা বাঈ?' শতদ্রুর একথার উত্তরে রাখহরি বলল—'সে এক ইতিহাস বাবু।' শতদ্রু অবাকজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল—'কী সে ইতিহাস?' রাখহরি বলল—'তবে শুনুন।'

"এই প্রতাপগড়ের জমিদার ছিলেন রায় কিরণ কিঙ্কর চৌধুরী। শুধু জমিদার কেন, প্রতাপগড়ের ভগবান বলতে পারেন। তাঁর নামে বাঘে-মোষে একঘাটে জল খেত। আমার বাবা জমিদার বাড়ীতে মালির কাজ করতেন। দশ বছর বয়সে বাবার হাত ধরে এ বাড়ীতে আসি। রানীমা ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি আমাকে তাঁর সন্তানের মতোই ভালবাসতেন। তাই আমার জন্য এ বাড়ীর দ্বার ছিল অবারিত। নিজের চোখে অনেক কিছুই দেখতাম; কানে অনেক কিছুই শুনতাম। তারপর অনেক দিন কেটে গেল। জমিদারী প্রথা বিলোপ হলো। দীর্ঘদিন পক্ষাঘাতে ভুগে জমিদার বাবু মারা গেলেন। রানীমা অনেক আগেই গত হয়েছিলেন। কালের অতলে তলে সব কিছু তলিয়ে গেল। সোনার রাজবাড়ী আজ যেন প্রেতপুরী। ঘাটের ঘরে পা দিয়েছি। জমিদার বাবুর তৈরী এ বাংলো আজ সরকারের। সেই প্রথম থেকে আজ অবধি এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর। কী ছিল আর কী হলো। সব কিছু যেন স্বপ্নের মতো লাগছে।

জমিদার কিরণ কিঙ্করের সাত বাঈজীর মধ্যে হীরাই ছিল পরমা সুন্দরী। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। চোখ দুটো ছিল হরিণের মতো টানাটানা। আর সে চোখে ছিল কামনার দৃষ্টি। সুদীর্ঘ ঘনকালো কেশরাশি পিঠের উপর দোল্ খেত। হীরা যেমনি ছিল নাচিয়ে তেমনি ছিল গাইয়ে। কিংবদন্তী ছিল, তার গানে না কী বৃষ্টি নাম্‌তো; মরা গাছে ফুল ফুট্‌ত। জমিদার বাবু একবার পশ্চিমে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই তিনি হীরাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। জমিদার বাবু বোধ হয় হীরাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন।

তিনি যেখানেই যেতেন হীরাকেও সাথে নিতেন। জমিদার কিরণ কিঙ্করের একবন্ধু বিক্রম বিজয় নাথ চৌধুরী ছিলেন ধর্মনাথপুরের আর এক জমিদার। দুজনেই প্রায় সমবয়সী ছিলেন। একবার কিরণ কিঙ্করের আমন্ত্রণে বিক্রম বিজয় প্রতাপগড়ে আসেন। বিক্রম বিজয় হীরার রূপে, নাচে, গানে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বিক্রম-হীরার মেলামেশা কিরণ কিঙ্করের মনে জ্বেলে দেয় হিংসার আগুন। বন্ধুত্বে চিড় ধরে তাই কিরণ কিঙ্কর বিক্রম বিজয়কে কিছু বলতে পারেন না। আবার চোখের সামনে ওদের প্রেমলীলার দৃশ্যও দেখতে পারেন না। তাই নিরুপায় হয়ে কিরণ কিঙ্কর হীরাকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতেই মন স্থির করলেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার জোছনা ঝরা রাত। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জলসা ঘরে চলে হীরার বিরামহীন নৃত্য-গীত। এরপর বিক্রম বিজয় চলে আসেন বাগান বাড়ীর এই শয়ন গৃহে। সেই শয়ন গৃহই এখন এই অতিথি-শালা। হীরা স্নান সেরে শ্বেতবসনে নিজগৃহে স্থাপিত রাধা-মাধবের সামনে আরাধনায় মগ্ন। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। কিরণ কিঙ্কর ঘরে ঢুকে পিছন থেকে গলা টিপে ধরেন। মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ। তখন রাত দুটো। ঐ রাতেই কিরণ কিঙ্করের লোকজন ঐ ঘরের মেঝেই হীরার লাশ পুতে ফেলে। এরপর প্রতি বছরই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাত দুটোর সময় মৃত্যুর রাতে গাওয়া হীরার শেষ গানটি শোনা যায়। বঁধু কেন এলো না.........।"

স্বামী বিবেকানন্দের

'বন্দীর মুক্তি'

গল্পের কবিতা রূপ

অসিত বরণ নাথ

রাজ্যের যত প্রজাবৃন্দ ভাবে এ কী ফন্দি,
রাজামশাই করিয়াছেন মন্ত্রীকে হায় বন্দী !
সকলেরই কাছে মন্ত্রী বড়ই ভালো লোক,
প্রজার কিসে হয় মঙ্গল সেই দিকে তাঁর চোখ :
এই মহলে আছেন তিনি রাজার বাবা থেকে,
রাজ্যের সব ব্যাপারই তাঁর জানা একে একে।
বর্তমানের দুষ্ট রাজা খুবই অত্যাচারী,
দিনে দিনে করেন শুধু করের বোঝা ভারী।
ভোগ-বিলাস আর মৃগয়াতে খরচ করে যান,
মন্ত্রী মশাই তাই রাজাকে করেন বাধা দান।
মন্ত্রীকে তাই বন্দী করেন রাজা রুষ্ট হয়ে,
প্রজারা কেউ খোলেনা মুখ অত্যাচারের ভয়ে।
পাহাড়ের এক দুর্গে রাজা পাঠান মন্ত্রীকে,
সেপাইরা সব দেয় পাহারা দুর্গের চারদিকে।
সেই দুর্গের চিলেকোঠায় জানালা একখান,
লাফদিলে শেষ জেনে মন্ত্রী ডাকেন ভগবান।
রোজবিকেলে মন্ত্রী-গিন্নী সেই পাহাড়ে যান,
দূর থেকে একদৃষ্টে তিনি মন্ত্রীর পানে চান।
একদিন এক শুকনো পাতা ফেলেন গিন্নীর কাছে,
পাথর বাঁধা সেই পাতাতে অনেক লেখাই আছে।

লেখার মর্ম অনুসারে পরদিন মন্ত্রী-বধূ,
আনেন দড়ি-কাছি-সুতো, গুবরে পোকা-মধু।
নির্দেশ মত পোকার পায়ে বেঁধে সুতো তার—
সাথে বাঁধেন দড়ি, দড়ি কাছিতে আবার।
দুর্গের দিকে ছাড়েন পোকা খড়্গো মধু দিয়ে—
পোকা পৌঁছায় মন্ত্রীর কাছে সাথে সুতো নিয়ে।
সুতো ধরে টানেন মন্ত্রী দড়ির পরে কাছি,
শক্ত করে জানালাতে বাঁধেন কাছিগাছি।
কাছি বেয়ে নীচে মন্ত্রী নেমে এসে রাতে—
রাজা ছাড়েন লয়ে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা সাথে।

॥ মাভৈঃ ॥

হরষিত দেবনাথ

আজি মহা দুর্যোগের ঘনঘটাকালে
হও স্থির। দিনমণি মেঘের আড়ালে
লুকিয়ে রয়েছে জেনো, রাখিও স্মরণ ;
উদ্যম সঞ্চার করে করো মহারণ।
মহাগিরি হবে জেনো লঙ্ঘিতে মোদের,
পথ কে রোধিবে এই দুর্বার স্রোতের ?
বহ্নি মোরা, নিষ্কলুষ-পুতশীল-শিখা,
দহনে সে চক্রান্তের হবে যবনিকা।
অমানিশা কালে দেখো উজ্জ্বল নক্ষত্র ;
হও স্থির, মনে রেখো এ চরম পত্র।
মিথ্যে অপবাদে নাহি হও বিচলিত,
মোদের পবিত্র দাবী নহে পরাজিত।
একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় দেখো অকস্মাৎ—
কেটে যাবে মাভৈঃ মাভৈঃ এ তিমির রাত।

শারদীয় শৈবভারতী প্রকাশনায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

—শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

পাত্র-পাত্রী বিভাগ

২৩/১এ ফীয়ার্স লেন, কলিকাতা-৭০০০১২

পাত্রী (২০) বি. এ. পাঠরতা, গৌরবর্ণা, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ও গৃহকর্মে নিপুণা। সূচী ও পোষাক প্রস্তুত কাজে পটু। ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কথোপকথনে অভ্যস্থা। উপযুক্ত পাত্র চাই। J. C. Debnath, Qrt. No. 460. Sector VI B, P.O-Balconagar, Dist-Bilaspur (M.P.)

পাত্রী (২৫) বি. এ. পার্ট ওয়ান, রং মধ্যম, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতার একমাত্র কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। শৈবাচার্য্য শ্রীমাখনলাল হালদার। বাজাররোড, নবদ্বীপ, নদীয়া।

পাত্রী (২৩), দশম মান, শিব গোত্র, ফর্সা, (৫'-৩") সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা (ঢাকা বিক্রমপুর) বনেদী বংশ, সরকারী চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, C/o-মহামায়া বস্ত্রালয়, ৫৭, ষ্টেশন রোড, কলকাতা-৩২।

পাত্র (৩১) বি. কম., কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীয়া (৯০০)। সুশ্রী, শিক্ষিতা নাথ পাত্রী চাই। চাকুরীরতা বা শিক্ষিকা অগ্রগণ্য। ফটোসহ যোগাযোগ করুন—রাধেশ্যাম নাথ, এন. এস. ডি, জি. আর. জে টিফিন ক্লাব। সি. পি. টি, বি. বি. রোড, বি. এন. আর, কলি-৪৩।

পাত্রী (২১), উচ্চতা (৫'-১"), মাঝারী গড়ন, উজ্জল শ্যামবর্ণা, দশম মান, টেলারিং-এ ডিপ্লোমা, গৃহকর্মে নিপুণা। উপার্জনশীল পাত্র চাই। জি. কে. পোদ্দার, ড-১৪/এ, কল্যাণী, নদীয়া।

পাত্রী (২৪) সুন্দরী, সুগঠনা, স্বাস্থবতী এবং উচ্চতা (৫'-২")। বি.এস.সি. (১ম বিভাগ) ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাঠরতা। পূর্ববঙ্গীয় গৃহকর্মে নিপুণা ও শান্ত স্বভাবা পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা অফিসার পাত্র চাই। যোগাযোগ করিবার ঠিকানা শ্রীগোষ্ঠবিহারী দেবনাথ, ২৩/১এ, ফিয়ার্স লেন, কলি-৭০০০১২।

পাত্রী (২৪), (৫'-১"), বি. এ. পার্ট ওয়ান, ফর্সা, স্বাস্থবতী, সুকেশী, সুশ্রী, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই।

এবং

পাত্র (৩২), বি. এস. সি (ডি), বিজনেস্ ম্যানেজমেণ্ট, এল. এল. বি. একটি বেসরকারী ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার (১৮০০/-) বদলে আপত্তি নাই। ফর্সা, সুন্দরী ২৬/২৭ এর মধ্যে অন্তত: স্কুল ফাইন্যাল পাত্রী চাই। শ্রীনীলমণি নাথ। সুস্কিয়া গভর্ণমেণ্ট কোয়াটার নং এ/৬, পোঃ জগদ্দল, ২৪-পরগণা।

পাত্রী এম. এস. সি, এল. টি, কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যাণ্টের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী। মাসিক বেতন ৯০০ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। শ্যামবর্ণা (৫'-৫"), সুস্বাস্থ্য, সুমুখশ্রী। শিক্ষিত সুউপায়ী পাত্র ৩৭ মধ্যে চাই। দুর্গাপুরের পাত্র অগ্রগণ্য। Shyamaprasad Nath, 36, Rambag, Allhabad, 211003.

পাত্রী বয়স (১৮), উচ্চতা (৫'-২"), প্রয়াত ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র কন্যা। পাত্রীর বড দুই ভাই গ্রাজুয়েট এবং উভয়েই ব্যাংক কর্মচারী। নবম ক্লাসে পাঠরতা, ফর্সা, সুশ্রী, স্লিম ফিগার, সুকেশী, গৃহকর্মে নিপুণা, উপযুক্ত পাত্র চাই। Usharani Samaddar, Barisal Pally, P.O.-Rahara, Dist.—24-Parganas, West Bengal.

পাত্রী (২০) সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মে নিপুণা, স্কুল ফাইন্যাল অনুত্তীর্ণা, সূচী ও সেলাই কাজে বিশেষ পারদর্শিনী। শিক্ষিত ও উপার্জনশীল পাত্র চাই। শ্রীঅমল দেবনাথ, তারাপুকুর ওয়েষ্ট পল্লী। পোঃ-আগড়পাড়া, জিঃ ২৪ পরগণা।

পাত্র (২৭), (৫' ৭") বি, এস. সি, বিটি, সুন্দর গঠনযুক্ত, মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, মাসিক আয় চার অঙ্কের, এছাড়া নিজস্ব বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা আছে। (১৯-২৩) গ্রাজুয়েট/উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী শান্ত স্বভাবা ও সুরুচি সম্পন্না পাত্রী কাম্য।

এবং

পাত্রী (২১), (৫'-১") ফর্সা, সুশ্রী ও স্লিম, স্কুল ফাইন্যাল পাশ, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা। উপযুক্ত সুচাকুরে পাত্র চাই, উপযুক্ত পাত্রে যথোচিত মর্যাদা সহকারে বিবাহ দিতে আগ্রহী। শ্রীবাস চন্দ্র পণ্ডিত। ১৩, কাশী ব্যানার্জী লেন, লক্ষীতলা পাড়া, পোঃ শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৩৭, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, ক'লকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামুল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৯

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

শিবনামাবল্যষ্টকম্

হে চন্দ্রচূড় মদান্তকশূলপাণে স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
হে পার্বতী-হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং সংহার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
বারাণসীপুরপাতে মণিকর্ণিকেশ বীরেশ দক্ষমখকাল বিভোগণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠগণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগ নৃপালকলাপমাল সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বৃষাকপে হে মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাধিবাস।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং শিবনামাবল্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

সম্পাদকীয়

শারদীয়া দুর্গাপূজা সমাপ্ত। মহাদেবী দুর্গার মৃন্ময়ীমূর্তির বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালী-হিন্দু-সমাজে ঈশ্বরী বিজয়ার সূচনা হয়েছে।

ইশ্বরী বিজয়া বাঙালী-হিন্দুদের সমস্ত রকম বিভেদ ভুলতে, একটা মহান-ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরণা জোগায়। এই উপলক্ষে সকলে পরস্পর কোলাকোলি করে আবদ্ধ হয় প্রীতির বন্ধনে। ঈশ্বরী বিজয়ার পর বাঙালী-হিন্দু-সমাজ সামগ্রিকভাবে একটা মহা-সম্মিলন-উৎসব পালন করে।

আমরা 'শৈবভারতী'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী, কর্মকর্তা সকলেই সেই মহা-সম্মিলন উৎসবের অংশীদার।

তাই ঈশ্বরী বিজয়া উপলক্ষে সকলের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে কামনা জানাই,—আমাদের মধ্য থেকে সকল প্রকার বিভেদ অপসারিত হোক; আমাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক; আমাদের সকল প্রচেষ্টা শুভ হোক।

সামনে কালীপূজা ও দেওয়ালী। সেই কালীপূজা ও দেওয়ালী উপলক্ষে বাঙালী-হিন্দু-সমাজ আর একবার উৎসব পালন করবে।

মহাশিবই মহাকাল এবং মহাশক্তি দুর্গাই মহাকালী। বিশ্বপিতা মহাকালের ইচ্ছানুযায়ী বিশ্বমাতা মহাকালী বিশ্বসংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করে চলেছেন।

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন সন্তানের কাছে জগজ্জননী মহাকালী ভয়ঙ্করীরূপে প্রতিভাত হন, কিন্তু জ্ঞানবান সাত্ত্বিক সন্তান জগজ্জননীর সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেই শুভঙ্করী মূর্তিকে খুঁজে পান।

জগজ্জননীর সেই শুভঙ্করী রূপকে প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রয়োজন ঘোর অমানিশার ঘনান্ধকারে জ্ঞানের আলোকসজ্জা। এই মহাতত্ত্বেরই বাহ্যিক প্রকাশ কালীপূজার রাতে দেওয়ালী।

তাই কালীপূজা ও দেওয়ালীতে আমাদের সকলেরই প্রার্থনা হোক—জ্ঞানের আলোকসজ্জা যেন আমাদের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করতে পারে ; বিশ্বজননীর ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেই যেন আমরা শুভঙ্করী মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ করে ধন্য হতে পারি।

বৈষ্ণবাচার্য্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি-গ্রন্থাগার

সুধীবৃন্দ !

আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ ইং ১।১২।৮২ বুধবার পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে যে, "রাধাগোবিন্দ স্মৃতি-গ্রন্থাগার"-এর আংশিক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে—তাঁহার পুণ্য জন্মদিনে সেই গৃহপ্রবেশের দিন স্থির করা হইয়াছে। উক্ত শুভদিনে নবদ্বীপবাসী জনগণকে এবং শুভানুধ্যায়ী স্বজাতিবৃন্দকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। আশাকরি আপনাদের শুভাগমনে এই দিনটি আনন্দদায়ক হইবে।

নিবেদক

শ্রীহরলাল নাথ

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতি

শ্রীমাখনলাল হালদার

সম্পাদক, রাধাগোবিন্দ স্মৃতি-গ্রন্থাগার

ফিজি দ্বীপের আতঙ্ক

ভুপেশ চন্দ্র সেন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবে মাত্র ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েছি। আমার পরবর্তী লক্ষ্য একটি উপযুক্ত চাকুরী, কিন্তু এই বাজারে আমাকে কে চাকুরী দেবে ?

একদিন নিত্যনৈমিত্তিক খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটি চাকুরী খালির বিজ্ঞাপনে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

ফিজিদ্বীপে জঙ্গল কেটে সাফ করার কাজ দেখাশুনার জন্য একজন সাহসী যুবক চাই, আবেদন করুন—

বালফুর এণ্ড বালফুর কোম্পানী, ১নং পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, লনডন।

আমি সবসময়ই বাইরে যেতে একপায়ে খাড়া। সুতরাং আর সময় নষ্ট না করে আমি ঐ পদটির জন্য আবেদন করলাম, যদিও জানতাম এই বাজারে এটা বৃথা চেষ্টা। তারপর একদিন ব্যাপারটা ভুলেও গেলাম।

হঠাৎ একদিন পিয়ন এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল। ভাবলাম নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে। তা'ছাড়া আমার মত হতভাগাকে কে চিঠি লিখছে।

চিঠিখানি নাড়াচাড়া করতে করতে খামের উপর নজর পড়ল—লেখা আছে—বালফুর এণ্ড বালফুর এই কোম্পানীর নাম। দেখে হাসি পেল—বুঝলাম রিগ্রেট চিঠি এসেছে। যাই হোক চিঠি খুলে ফেললাম —চিঠি পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বারে বারে পড়লাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে—ইন্টারভিউ চিঠি।

....

বালফুর এণ্ড বালফুর কোম্পানীর বড় সাহেবের কামরায় বসে আছি।

মনে হ'ল আমায় দেখে বড় সাহেব বেশ খুশী হয়েছেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন মিঃ ব্রাউন, তুমি পিস্তল চালাতে জান?

প্রশ্নটা শুনে, আমি হকচকিয়ে গেলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমার পিস্তলের হাত খুবই পাকা ছিল।

আমি বাবার কাছে বেশ কিছুদিন যাবৎ অস্ত্রচালনার শিক্ষাগ্রহণ করেছিলাম। আমার বাবা ছিলেন একজন পাকা শিকারী।

আমি বললাম,—বিলক্ষণ, দরকার হলে পরীক্ষা দিতে রাজী আছি স্যার!

জবাব—কোন দরকার নাই। আমি তখন পাল্টা প্রশ্ন করলাম—স্যার এ প্রশ্ন কেন করছেন, আমাকে কি লড়াই করতে হবে।

বড় সাহেব হেসে বললেন—মোটেই না। জায়গাটা নিগ্রো প্রধান এবং কাজ কর্মের শেষে শ্রমিকেরা মদ খেয়ে প্রায় রোজই মাতলামি করে। তবে মাত্রা ছাড়ায় না। যদি তারা টের পায় যে তাদের কাজের উপর খবরদারী করতে যে এসেছে, সে একজন অভিজ্ঞ পিস্তল ছুড়িয়ে, তবে ভয়ে তার সঙ্গে কোন গোলমাল করতে সাহস পাবেনা এবং তাকে খুবই সমীহ করে চলবে।

তুমি তো আমার প্রশ্ন শুনে খুবই ভয় পেয়েছিলে, ছোকরা, এই বলে বড় সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। সাক্ষাৎকার শেষ করে বড় সাহেবের ঘর থেকে খুশী মনে বেরিয়ে এলাম। যাক অতি সহজেই আমার একটা চাকুরী হয়ে গেল, এবং অবশেষে একসময় আমার কর্ম-স্থল ফিজি দ্বীপ অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম।

....

ফিজি দ্বীপে যখন পৌছলাম, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

বড় সাহেব চিঠি দিয়ে ওখানকার উপরওয়ালা মিঃ হেনরীকে আগে থেকেই আমার আসার খবর জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সুতরাং ওখানে পৌছে আমার কোন অসুবিধা হল না। একটা জিনিষ দেখে অবাক হলাম, ওখানে সভ্যতার চিহ্ন মাত্র নজরে পড়ল

না। জাহাজঘাটা পার হয়ে যখন নিজের আস্তানায় পৌঁছলাম, তখন সামনে বিশাল সীমাহীন জঙ্গল দেখে নিজের কাজের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারলাম।

দেখলাম, জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। প্রচুর গাছ কাটা হয়ে গেছে, এবং কাটা গাছগুলো এখানে সেখানে, যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

সেই জঙ্গলের ভেতর একটু ফাঁকা জায়গায় আমার থাকবার জন্য একটি ছোট ছিমছাম কাঠের বাংলো।

এখানেই আমাকে তল্পীতল্পা গুটিয়ে উঠতে হল।

আমার দেখাশুনার ভার একজন নিগ্রোর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। নিগ্রোটির নাম উইলিয়াম।

ওখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে আর একটি বড় বাংলোয় হেনরী সাহেব থাকতেন।

আজ সাতদিন হ'ল আমি এখানে এসেছি। এবং এর মধ্যে একদিনও আমি আমার কর্মস্থল ভাল করে ঘুরে দেখার সুযোগ পাইনি। তাছাড়া এই বাংলোয় আগে কে ছিল, সে কথাও কিছু জানা হয়নি। তাই সেদিন উইলিয়াম ঘরে ঢুকতেই, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, উইলিয়াম, তুমি এখানে কতকাল আছ ?

উইলিয়াম বলল—প্রায় দু'বৎসর। আবার প্রশ্ন করলাম—এই বাংলোতে আগে কি কেউ থাকতেন ?

উইলিয়াম হেসে বলল,—হ্যাঁ' এর মধ্যে আরও দু'জন লোক কাজ করে গিয়েছেন। আপনি তৃতীয় ব্যক্তি।

এই বলে উইলিয়াম আমাকে সতর্ক করে দিল—সাবধান, এই ব্যাপার যেন হেনরী সাহেবের কানে না যায়। তবে তিনি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটাবেন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই ঘোরাল বলে মনে হ'ল।

তখন আমি উইলিয়ামকে অভয় দিয়ে বললাম তোমার কোন ভয় নেই। হেনরীর কানে এই কথা পৌঁছাবে না। তুমি অকপটে আমায় সব খুলে বল, কেন ওঁরা এর আগে কাজ ছেড়ে চলে গেলেন ?

এবার জবাব পেলাম,—সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কাজ ছেড়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত আমার বড় সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল—মিঃ ব্রাউন, তুমি পিস্তল চালাতে জান ?

... ...

এদিকে কাজ এগিয়ে চলল। পরদিন ভোর হতেই দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই উইলিয়াম নিয়ম মাফিক হাসি মুখে ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করল—সাহেব, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?

এখানে বলে রাখা দরকার যে উইলিয়াম প্রত্যহ ঘরে ঢুকে একই প্রশ্ন করত। কেন তখন বুঝতে পারিনি।

আমি বললাম—হ্যাঁ, খুব ভাল ঘুম হয়েছে।

আবার প্রশ্ন—আপনার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয়নি তো ?

আমি বললাম না —।

কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন জাগল, লোকটা বার বার এই কথা জিজ্ঞাসা করছে কেন ?

মনের কথা চেপে গেলাম, আর কিছু বললাম না, বুঝতে পারলাম এর জবাব ও দেবে না। এবার আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম—উইলিয়াম, কৈ তুমিতো আমাকে এই জায়গাটা ঘুরে দেখাবার কথা কিছু বললে না ?—উইলিয়াম সহাস্যে বলল, এতদিন আপনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই দেখাইনি। চলুন আজ দেখাব। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন, এখুনি আমরা রওনা হবো. নচেৎ সন্ধ্যে হয়ে গেলে সব লোকজন চলে যাবে !

অল্প সময়ের মধ্যে আমি তৈরী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই আমি চারদিক ঘুরে বাংলোর অবস্থানটা বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। আমার শোবার ঘরে খুব বড় বড় চারটে জানলা। একটি জানলা পূর্বদিকে, সেদিকে তাকাতেই নয়নাভিরাম গাঢ় নীলরংয়ের

সমুদ্র দৃষ্টি গোচর হ'লো। তটরেখা আমার বাংলো থেকে মাত্র ৫০/৬০ গজ দূরে হবে। সমুদ্রের গর্জন ওখান থেকেও ভেসে আসছিল।

এখান থেকে আমাদের হাঁটা ছাড়া অন্য কোন যাতায়াতের বন্দোবস্ত ছিল না। তাছাড়া বিশাল বিশাল আকাশচুম্বি গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য একফালি সরু পা চলার পথ, আর দুদিকেই গভীর বন। উইলিয়াম আগে আগে যাচ্ছিল—হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ হলো, চড়-চড় চড়াৎ! আমি চমকে উঠে উইলিয়ামকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওটা কিসের শব্দ? উইলিয়াম আগের মতই হেসে জবাব দিলে—ভঁয় নেই চলুন—সবই স্বচোখে দেখতে পাবেন।

হঠাৎ সরু রাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিল সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল প্রায় শ' খানেক নিগ্রো মজুর কুঠার হাতে জঙ্গল পরিস্কারের কাজে ব্যস্ত। সেই সময়ই একটি বিশাল গাছ আমার আসার কিছুক্ষণ আগে কুঠারের শেষ আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে। সেই বৃক্ষ পতনেরই শব্দ আমি তখন শুনতে পেয়েছিলাম।

উইলিয়াম এখানে এসে থেমে দাঁড়াল এবং সবাইকে ডেকে আমার কাছে জমায়েত হতে বলল। সবাই কাছে আসতেই, উইলিয়াম তাদের সম্বোধন করে বলল—এই আমাদের নূতন সাহেব। ইনি এখন তোমাদের কাজের দেখাশুনা করবেন। তোমরা অবশ্যই ভালভাবে কাজকর্ম করবে এবং তোমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ওনার গোচরে আনবে। বুঝলে—এবার যাও আবার কাজ শুরু করো।

সেখান থেকে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে আমরা এবার অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌঁছলাম। উইলিয়াম হাত উঁচু করে সামনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বলল, ঐ দেখুন, দ্বীপবাসীদের থাকবার বস্তি। আমরা সবাই এখানে বসবাস করি। নিকটে আর কোন বসতি নেই।

হাত ঘড়িতে দেখলাম তখন দেড়টা বেজে গেছে।

আমি বললাম—উইলিয়াম অনেক বেলা হ'ল। আমাদের ফিরতে হবে না?

উইলিয়ামের মুখে হাসি লেগেই আছে। সে বলল—অত তাড়াতাড়ি করার কোন দরকার নেই। এখানে আপনার মধ্যাহ্ন ভোজের ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পা চালিয়ে চলুন।

অবশেষে কিছুক্ষণের মধ্যেই বস্তিতে এসে পৌঁছলাম দেখলাম সামনে একটি ছায়া ঘেরা গাছের নীচে একটি কাঠের টেবিলের উপর খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে এবং সেখান থেকে অল্প দূরে দশ-পনের জন স্ত্রী ও বৃদ্ধ আমাকে দেখবার জন্য ওখানে জমায়েত হয়েছে।

আমাকে দেখেই হঠাৎ তাদের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে গেল এবং আমি পরিস্কার বুঝতে পারলাম তাদের মধ্যে যেন একটা গভীর ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে। তারা তাদের ভাষা ও ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরাজীতে নিজেদের মধ্যে যেন কোন কিছু বলাবলি করছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল। আমি খুব মনোযোগ সহকারে ওদের কথার ভাবার্থ বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম একটি ছোট্ট ইংরাজী শব্দ শুনে Devil (শয়তান)।

তখন প্রায় তিনটে বাজে। এইমাত্র আমি মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে চেয়ারে বসে একটু বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম যেন দূর থেকে কোন লোক দ্রুত বেগে বস্তির দিকে ছুটে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি অল্প বয়স্ক নিগ্রো হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে অনতিদূরে বিশ্রামরত উইলিয়ামের পায়ের কাছে বসে পড়ে ওদের ভাষায় খুব উত্তেজিত অবস্থায় কী যেন বলল। লোকটার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন!

তাকিয়ে দেখলাম উইলিয়ামের মুখও ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠবার আগেই উইলিয়াম আমার কাছে এসে খুব সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—সাহেব, শীগ্‌গীর কাজে ফিরে চলুন, জবরদস্ত

হেনরী সাহেব কাউকে কোন খবর না পাঠিয়ে হঠাৎ এসেছেন, আমাদের কাজের তদারক করতে। তার কাজে যে গাফিলতি করে, তার ফল বড় মারাত্মক।

এখানকার সব ব্যাপারই কী রকম হেঁয়ালীর মত ঠেকছিল। এই হেনরীর হঠাৎ আগমন আমাকেও ভাবিয়ে তুলল। তবে কি কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে!

দ্রুতপদে আমরাও কর্মস্থলের দিকে রওনা হলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। এমন সময়, হঠাৎ একটি শব্দ শুনে দু'জনেই থমকে দাঁড়ালাম। পরিস্কার শুনতে পেলাম—সপাং-সপাং-সপাং-সপাং— পর মুহূর্তে অব্যক্ত বেদনা ও গোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে এল। তখন আমরা দু'জনেই দ্রুতপদে ছুটে চলেছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যে দৃশ্য নজরে পড়ল তাতে মধ্যযুগের বর্বরতার কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল—আমি হাঁপাতে হাঁপাতে উইলিয়ামকে উদ্দেশ্য করে বললাম—উইলিয়াম একি ব্যাপার? হেনরী ঐ নিগ্রোটিকে গাছে বেঁধে চাবুক দিয়ে কেন মারছে?

উইলিয়াম বলল—হেনরী একজন জবরদস্ত অত্যাচারী লোক। তিনি মাঝে মাঝে হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তা নিজের চোখে দেখবার জন্য এখানে চলে আসেন এবং যদি দেখতে পান যে কেউ কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, তবে তার আর রক্ষে নেই। ঐ দেখুন, ওর হাতে কত মোটা ও কত লম্বা চাবুক। দেখেছেন স্যার. ঐ চাবুকের কী প্রচণ্ড শক্তি। লোকটার সারা পিঠ ফেটে কিভাবে রক্ত ঝরছে।

আমি আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে বললাম। মিঃ হেনরী থামুন—লোকটা মরে গেলে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমার দিকে তাকিয়ে হেনরী রুক্ষস্বরে বলল—কী হে ছোকরা,

তুমিতো নূতন এসেছো—ভাল করে কাজ কর্ম দেখবে। এরা সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকি দেয়। তুমিতো জান, আর মাত্র সাত দিনের মধ্যে সাদা চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত সমস্ত গাছ কেটে জঙ্গল পরিস্কার করতে হবে, এটাই ওপরওয়ালার নির্দেশ।

আমি বললাম—আমি উপরওয়ালার সমস্ত নির্দেশই পেয়েছি। কিন্তু এরকম নির্মমভাবে চাবুক মারার নির্দেশ পাইনি—তাছাড়া আপনার এই রকম অমানুষিক অত্যাচারের জন্য কর্মীদের মধ্যে যে কোন সময় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। সেটা কি আপনার খেয়াল আছে?

আমার কথা শুনে হেনরীর লাল মুখ ক্রোধে আরও লালবর্ণ ধারণ করল—কর্কশ কণ্ঠে বলল—চুপ কর ছোকরা। তুমি যদি আমার কথার উপর কথা বল, তা হলে তোমার অবস্থাও ঐ গাছে বাঁধা লোকটার মতই হবে। এই বলে চাবুক দিয়ে লোকটাকে দেখাল।

একটি কথা এখানে বলা দরকার, হেনরী চেহারার দিকে দিয়ে একটি ছোট খাট দৈত্য। উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছফুট, আমার চেয়ে প্রায় ছয় ইঞ্চি উচ্চতায় লম্বা। তা'ছাড়া ওর শারীরিক গঠন দেখলে মনে হয় ও একাই ৪/৫ জন বিশালকায় নিগ্রোর মহড়া নিতে পারে।

সুতরাং ওর কথা শুনে আমিও দমে গেলাম, যদিও শারীরিক দিক দিয়ে আমার শক্তি কম ছিল না। কিন্তু ওর সঙ্গের শক্তি তুলনা করা বাতুলতা।

ততক্ষণে হেনরী চাবুক হাতে নিকটস্থ একটি সদ্য কাটা গাছের গুড়ির উপর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বসে পড়ে আবার আমাকে সম্বোধন করে বলল—দেখো, ছোকরা, আমাকে কাজের ব্যাপারে ঘাঁটাবে না —আমার আদেশ অমান্য করার চেষ্টা করবে না. তা'হলে এক কলমের খোঁচায় তোমার চাকরী চলে যাবে। তুমি ভেবোনা এই অপদার্থ ফাঁকিবাজ নিগ্রোটাকে এখনই আমি বাঁধন মুক্ত করে দেব। মোটেই তা নয়, ওকে ঐখানে আমি সন্ধ্যা অবধি আটকে রাখব এবং ওকে

ছাড়ব সন্ধ্যার পর।. বুঝেছো, এবার তুমিও এখানে অপেক্ষা কর।

তখন আমি উইলিয়ামের দিকে তাকাতেই দেখি, হেনরীর কথা শুনে ওর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে। আমাকে শুধু ইসারায় চুপ করে থাকতে বলল।

তারপর এক সময় ধীরে ধীবে সন্ধ্যেব অন্ধকার নেমে এল। ঠিক সেই মুহূর্তে যে গাছেব সঙ্গে সেই নিগ্রোটিকে হেনরী বেঁধে রেখে ছিলেন। সেই গাছেব একটি মোটা ডাল সবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠল। তারপর যা ঘটল তা দেখে আমরা সবাই গভীব বিস্ময়ে ও আতঙ্কে নির্বাক হয়ে পাথরেব মূর্ত্তিব মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

হেনরী হঠাৎ ছ'হাত তুলে চাৎকার দিয়ে বলে উঠল—বাঁচাও-বাঁচাও আমাকে শয়তান ধরেছে।

যেন মনে হ'ল কোন এক অদৃশ্য শক্তি হেনরীর গলা চেপে ধরেছে এবং হেনরীর মত অতবড় শক্তিশালী লোক ছ'হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছে সেই লৌহ নাগপাশের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। পরক্ষণে আবার আর একটা অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল যা নাকি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

উইলিযাম তখন দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। দেখলাম হেনরীর হাতের সেই চাবুকটা এখন কে যেন ফাঁসের দড়ির মত ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছে। আর হেনরী ছ'হাত দিয়ে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সেই ফাঁস ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। পর মুহূর্তে হেনরী এক ঝটকা মেরে ফাঁস ছাড়িয়ে, দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সামনে সমুদ্র লক্ষ্য করে ছুটে চলল। ততক্ষণে আমারও হুঁস ফিরে এসেছে। আমি আমার পকেট থেকে পিস্তল বের করে বললাম—উইলিয়াম চল, হেনরীর পেছন পেছন যাই লোকটাকে তো বাঁচাতে হবে।

আমরা দুজনেই তখন হেনরীর পেছন পেছন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করেছি।

যতই হেনরীর নিকটবর্ত্তী হতে লাগলাম ততই আমাদের আগে আগে আর একটা ভারি পদক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পেলাম !

আমি তখন কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। চোখের পলকে আমার পিস্তল তুলে শব্দ লক্ষ্য করে তিন তিনবার গুলি করলাম—শব্দ হলো গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম !

গুলির প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত বন ভূমি কেঁপে উঠল এবং গাছের উপর উপবিষ্ট পাখীরা সব ডানার প্রচণ্ড শব্দ করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালাল।

তারপরই মনে হ'ল সব চুপচাপ। ততক্ষণে সেই ভারী পদক্ষেপের শব্দও থেমে গেছে। তবে কি আমার পিস্তলে কাজ হয়েছে ! আমি আর উইলিয়াম যখন হেনরীকে অনুসরণ করে সমুদ্রের ধারে পৌঁছলাম, তার আগেই হেনরী তার লঞ্চে চেপে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিক চক্রবালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

[ক্রমশঃ]

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৪১ সংখ্যক শ্লোকের টীকা :—

* বিন্দুনাদকলাতীত :—বিন্দু হচ্ছে কুণ্ডলিনীশক্তি। ষট্চক্রের প্রথম স্থান মূলাধারচক্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি সার্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গকে পরিবেষ্টিত করে সুগভীর নিদ্রায় নিমগ্না। সাধক সাধনার দ্বারা তাঁকে জাগ্রতা করে ষট্চক্র ভেদ করে মস্তকে সহস্রদলপদ্মস্থিত পরম মঙ্গলময় সদাশিবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে অপার্থিব আনন্দরসে আপ্লুত হন। এর ফলে সাধনার ঘটে সিদ্ধি ও সাধক লাভ করেন ব্রহ্ম-সাযুজ্য।

নাদ হচ্ছে প্রণব। উপনিষদ্ বা বেদান্তমতে প্রণবকেই বলা হয় নাদব্রহ্ম। প্রণব পরম জ্যোতির্ময়, দিব্য তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত। প্রণব বা ওঁকার ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট :—(অ) অকার, (উ) উকার ও (ম) মকার। "মহানির্বাণতন্ত্রে" সদাশিব প্রণবের অর্থ সম্পর্কে পার্বতীকে বলেছেন,

"অকারেণ জগৎপাতা সংহর্তা স্যাদুকারতঃ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥"

তৃতীয়োল্লাসঃ, শ্লোক-৩২

অ-কারের অর্থ জগতের পালনকর্তা, উ-কারের অর্থ জগতের সংহারকর্তা ও ম-কারের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্তা ; এইরূপ প্রণবের অর্থ কথিত হয়। অ-কার হচ্ছে স্থূলদেহ, উ-কার হচ্ছে সূক্ষ্মদেহ ও ম-কার হচ্ছে কারণদেহ। অ-কার উ-কারে, উ-কার ম-কারে, ম-কার নাদে নিয়ত লয় প্রাপ্ত হচ্ছে।

কলা হচ্ছে মানুষের দেহের অন্তর্গত পরমপিতা শিব ও পরমাপ্রকৃতি শক্তির অধিস্থানভূত সূক্ষ্মক্ষেত্র। দেহস্থিত শিব ও শক্তির অধিষ্ঠিত এই সূক্ষ্মক্ষেত্রগুলিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয় বলে এদের ষট্‌চক্র বলা হয়েছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ছয়টিকে একত্রে ষট্‌চক্র বলা হয়। গুহ্যদেশে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুর, হৃদিপদ্মে অনাহত, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ ও ভ্রূযুগলমধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। তন্ত্রসাধক তন্ত্রসাধনার দ্বারা নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগিয়ে ষট্‌চক্র ভেদ করে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে শির'পরে সহস্রারে আসীন শিবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটান। নির্বিকল্প সমাধিযোগে সাধক এইভাবে শক্তিকে শিবে লীন করতে পারলে জীবের জীবত্ব অপসারিত হয়। তখনই ঘটে জীবের শিবত্বে উত্তরণ অর্থাৎ জীব তখন শিবে রূপান্তরিত হন। দেহের এই পরম সাম্যাবস্থায় বিন্দু, নাদ ও কলার কোনরূপ স্পন্দন অনুভূত হয় না। সাধক সেইসময় বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত এক অচিন্ত্যনীয় অপার্থিব অলৌকিক চৈতন্যময় শিবস্বরূপে নিয়ত বিরাজ করেন। পরমারাধ্য গুরুদেব শিবস্বরূপ পরমব্রহ্মময়; এইজন্য তাঁকে এখানে বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত চৈতন্যস্বরূপ, শাশ্বত, শান্ত, ব্যোমাতীত ও নিরঞ্জন বলা হয়েছে।

বিশেষ অর্থে বিন্দু, নাদ ও কলাতীত বলতে প্রণবকে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রণব ও ব্রহ্ম পরস্পর সংশ্লিষ্ট, এক ও অভিন্ন। যিনি ব্রহ্মকে জানতে পেরেছেন, সগুণ ও নির্গুণ অথবা শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মভেদে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন, আত্মচৈতন্যযুক্ত ব্রহ্ম বা শক্তিযুক্ত চৈতন্যময়ব্রহ্মকে দর্শন করেছেন; তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করা হয়। 'মহাভারতে'র "বনপর্ব্বে" অজগরপ্রশ্নে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলেছেন,

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

মানুষ জন্মগ্রহণকালে শূদ্র থাকে, সংস্কার বা উপনয়ন হলে তাঁকে দ্বিজ বলা হয়, বেদপাঠনিরত ব্যক্তিই বিপ্র এবং যিনি ব্রহ্মকে জানতে পেরেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। অন্যত্র বলা হয়েছে,

"সপ্তাঙ্গং চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

যিনি সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ ও ত্রিস্থান বিশিষ্ট এবং পঞ্চদেবতাস্বরূপ ওঁকার বা প্রণব অবগত নন, তিনি কেমন করে ব্রাহ্মণ হতে পারেন। সেইজন্য ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে হলে প্রণবের সপ্তাঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চ-দেবতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা একান্ত অপরিহার্য।

"প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা, (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ঁ) নাদ, (˙) বিন্দু, (—) কলা এবং (=) কলাতীত। চতুষ্পাদ যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্ত্যবস্থা। পঞ্চদেবতা যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

প্রণব তিন প্রকার যথা, অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপর-প্রণবও আবার তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।....... শব্দব্রহ্ম স্বরূপ অপরপ্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্ত্বগুণ ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাত্ত্বিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার, সাত্ত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু। •সাঙ্খ্যমতাব-লম্বীরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রণবের ষষ্ঠ অঙ্গ কলা (অঙ্কুর) শব্দের অর্থ মহেশ্বররূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত ; এবং রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দ-শক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্, পাণি,

পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ; এবং সাত্ত্বিক, বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বাগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ব এই পঞ্চভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায়ই কলা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

এক্ষণে এই প্রণবের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্তুতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই চারটি অবস্থা আছে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য, তাহাকে স্থূল বলে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা সূক্ষ্ম। গুণত্রয়ে স্থিত হইলে বীজ বলা হয়। নির্গুণ অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটি অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ বলা যায়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যথা, বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, প্রণবের প্রথম স্থান ; হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের দ্বিতীয় স্থান ; অব্যাকৃত ও সুষুপ্ত্যবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, প্রণবের তৃতীয় স্থান ; সুতরাং জীবের সমষ্টির ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপর প্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ-দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ।

....

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায় ; তিনি মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে

উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কার-তত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকেন না; উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাই; উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইঁহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন।

....　　....　　....　　....

...অনুপস্থিত চৈতন্যকে পরপ্রণব বলা যায়। অনুপস্থিত চৈতন্যে অঙ্গাদি সমুদায় লয়প্রাপ্ত হইয়া আছে; সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। পরপ্রণব ও অপরপ্রণব অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়।....সপ্ত আম্নায় মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তাঁহার পাদচতুষ্টয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ তাঁহার তিন স্থান। হিরণ্যগর্ভ (শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টি), শক্তিযুক্ত ঈশ্বর, শক্তির সহিত মিলিত মহেশ্বর, শক্তির সহিত একীভূত পরশিব ও পরমব্যোম (পরমব্রহ্ম), তাঁহার পঞ্চদেবতা।

তান্ত্রিকেরা মহাপ্রণবকে শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপ্রণবরূপ শিবের সপ্তমুখই সপ্ত আম্নায়। তন্মধ্যে দুইমুখ গুপ্ত এবং পঞ্চমুখ প্রকাশিত আছে। এইজন্য শিবকে পঞ্চবক্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। 'ওঁ' এই মহাপ্রণবেও অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু, এই পঞ্চ অঙ্গ ব্যক্ত আছে; কলা ও কলাতীত এই দুই অঙ্গ অব্যক্ত রহিয়াছে। সপ্ত আম্নায়ের (শিবের সপ্ত মুখের) নাম,—তৎপুরুষ (অকার), অঘোর (উকার), সদ্যোজাত (মকার), বামদেব (নাদ), ঈশান (বিন্দু),

নীলকণ্ঠ (কলা) ও চৈতন্য (কলাতীত)। তৎপুরুষকে পূর্ব্ব মুখ, অঘোরকে দক্ষিণ মুখ, সদ্যোজাতকে পশ্চিম মুখ, বামদেবকে উত্তর মুখ, ঈশানকে উর্ধ্ব মুখ, নীলকণ্ঠকে গুপ্ত অধো মুখ ও চৈতন্যকে সর্ব্বমুখের মধ্যস্থলস্থিত অব্যক্ত সপ্তম মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

....

...জগতে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় আছে, তাহাই মহাপ্রণবের পাদচতুষ্টয়। ত্রিস্থান অর্থাৎ মহাপ্রণব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আধার। সত্ত্বগুণ দীপশিখার ন্যায় উর্ধ্বগামী, লঘু প্রকাশক ও সুখসন্তোষস্বরূপ। রজোগুণ বাসনাময়, অনুরাগময়, মোহময় ও কামক্রোধাদির আকর। তমোগুণ গুরু, দুঃখময়, আবরক ও নিদ্রা আলস্য প্রভৃতির কারণ। মহাপ্রণবকে আশ্রয় করিয়াই এই গুণত্রয় নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে। পঞ্চদেবতার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে।"†

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মাভেদে ব্রহ্ম এবং প্রণব এক ও অভিন্ন। পূর্বে "শ্রীশ্রীগুরুগীতা"র ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম" অর্থাৎ গুরুই পরম ব্রহ্ম। এখানে ব্রহ্ম ও প্রণব একাত্ম কল্পিত হওয়ায় পরমব্রহ্মময় গুরুদেব ও প্রণব অভিন্ন কথিত হয়েছে। স্বয়ং ব্রহ্মময় বলে প্রণবের সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতার যাবতীয় গুণাবলী শিবস্বরূপ পরম বন্দনীয় গুরুদেবের শরীরে নিয়ত বর্তমান। সেইজন্য গুরুদেবকে বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত চৈতন্যস্বরূপ, শাশ্বত, শান্ত, ব্যোমাতীত ও নিরঞ্জন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

---

† উর্দ্ধৃতিটি পরমারাধ্য সশক্তিক গুরুদেব কুলাবধূতাচার্য শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত "মহানির্ব্বাণতন্ত্রম" গ্রন্থের "প্রথম খণ্ডে"র তৃতীয়োল্লাসে অবস্থিত এবং পরমারাধ্য সশক্তিক পরম গুরুদেব কুলাবধূতাচার্য ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন রচিত প্রণব ব্যাখ্যার ২৩ সংখ্যক টীকার সংক্ষিপ্ত অংশ মাত্র। যাঁরা বিস্তৃতভাবে প্রণব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী, তাঁদের মূল গ্রন্থটি পড়তে অনুরোধ করছি।

তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীতি বৈ শ্রুতিঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা * সর্ব্বদারাধয়েদ্ গুরুম্ ॥ ৫৪ ॥
পাঠান্তর ঃ * বচসা চৈব।

"নেতি নেতি" ইত্যাদি বলে শ্রুতি (বেদ) যাঁকে নির্দেশ করেছেন, সেই শ্রীগুরু (গুরুব্রহ্ম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। সেইজন্য কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্বদা (পরমব্রহ্মস্বরূপ) শ্রীগুরুর আরাধনা করবে।

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ।
সৃষ্ট্যাদিকসমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥ ৫৫ ॥

কেবল গুরুসেবা দ্বারা গুরুর কৃপাপ্রসাদেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সদাশিব সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্যে সমর্থ হয়েছেন।

দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষচারণাঃ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিম্ ॥ ৫৬ ॥

দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষ ও চারণগণ, এমনকি মুনিগণও (যথার্থ) গুরুদেবের শুশ্রূষা (সেবা) করার বিধি (নিয়ম) জানেন না।

ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৫৭ ॥

গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ দেবতা ও গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষ ও কিন্নরগণ, ঋষিগণ এবং সর্বপ্রকার সিদ্ধগণও মুক্ত নন।

ধ্যানং শৃনু মহাদেবি সর্ব্বানন্দপ্রদায়কম্।
সর্ব্বসৌখ্যকরং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৫৮ ॥

হে মহাদেবি! সবানন্দপ্রদায়ক (সকলপ্রকার আনন্দদায়ক), সর্বসুখকর, নিত্য ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদ (ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ) ধ্যান (শ্রীগুরুধ্যান) শ্রবণ কর।

মহাহঙ্কারগর্ব্বেণ বিদ্যাতপঃকলান্বিতঃ।
সংসারকুহরাবৃত্তির্ঘটীযন্ত্রে ঘটো যথা ॥ ৫৯ ॥

অত্যন্ত অহঙ্কার ও গর্বের জন্য স্বল্পবিদ্যা ও স্বল্পতপস্যান্বিত ব্যক্তি ঘটীযন্ত্রে ঘটের পুনরাবৃত্তির ন্যায় সংসারগহ্বরে পুনঃ প্রবিষ্ট হয় (পুনর্জন্ম লাভ করে)।

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি,
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি,
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥ ৬০ ॥ *

(আমি) শ্রীমৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ গুরুশব্দ কীর্তন করি (জপ করি), শ্রীমৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ গুরুকে ভজনা করি, শ্রীমৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ গুরুকে স্মরণ করি এবং শ্রীমৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ গুরুকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥ ৬১ ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম্ *।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ৬২ ॥

পাঠান্তর: *সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্।

যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ (পরম ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দময), পরম সুখদাতা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ; যিনি (শীত ও উষ্ণাদি সকল প্রকার)

---

* ৬০ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৬৭ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত মোট আটটি শ্লোকে পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিভিন্ন প্রকার ধ্যান ও ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ৬০ সংখ্যক শ্লোকে পরমব্রহ্ম শ্রীমদ্গুরুদেবের উপাসনার সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারিত। পরবর্তী শ্লোকসমূহে পর পর তিনটি ধ্যান বিন্যস্ত করা হয়েছে। ৬১ ও ৬২ সংখ্যক শ্লোকযুগ্মে প্রথম ধ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। এই ধ্যান শ্রীমদ্গুরুদেবের যে নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধি বিবৃত, ৬৩ সংখ্যক শ্লোকটি তারই উপসংহার। ৬৪ সংখ্যক শ্লোকে দ্বিতীয় ধ্যান এবং ৬৫ সংখ্যক ও ৬৬ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে তৃতীয় ধ্যান বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধ্যানে শ্রীমদ্গুরুদেবের সাকার ধ্যানের সূচনা এবং তৃতীয় ধ্যানে সেই সাকার মূর্তিটি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। ৬৭ সংখ্যক শ্লোকটিতে ধ্যেয় শ্রীমদ্গুরুদেবের ধ্যানের স্থান নিরূপণ করা হয়েছে।

দ্বন্দ্বের অতীত, গগনসদৃশ (আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও অসীম), "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমিই তিনি' আদি মহাবাক্যের লক্ষ্য ; যিনি এক (অদ্বিতীয়), নিত্য (শাশ্বত), বিমল (মালিন্যহীন, শুভ্র), অচল (চিরস্থির), সর্বপ্রকার ধী-শক্তির সাক্ষীস্বরূপ ; যিনি ভাবাতীত (সমস্ত ভাবের অতীত), ত্রিগুণাতীত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের অতীত) ; সেই সদ্‌গুরুকে প্রণাম করি।

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং* নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥ ৬৩ ॥

পাঠান্তর : *নির্ব্বিকারং।

যিনি নিত্য (বিনাশহীন), শুদ্ধ (নির্মল), নিরাভাস (আভাসশূন্য), নিরাকার (আকারহীন) ও নিরঞ্জন (সগুণ ও নির্গুণ উপাধিশূন্য বা গুণত্রয়রূপ কালুষ্য অঞ্জনবিহীন) ; যিনি নিত্যবোধস্বরূপ, চিদানন্দময় (চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) ; সেই ব্রহ্মস্বরূপ গুরুকে আমি প্রণাম করি।

হৃদম্বুজে কর্ণিকামধ্যসংস্থং,
সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং,
সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্ ॥ ৬৪ ॥

হৃদয়পদ্মে (অনাহতচক্রে) কর্ণিকা বা বীজকোষমধ্যবর্তী, সিংহাসনে আসীন দিব্যমূর্তিধারী, (মস্তকে) চন্দ্রকলা বিভূষিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সুখময় ও অভীষ্ট বরপ্রদানকারী গুরুদেবকে ধ্যান করবে।

শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং,
মুক্তাফলা*ভূষিতদিব্যমূর্ত্তিম্।
বামাঙ্গপীঠে** স্থিতদিব্যশক্তিং,
মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপাণিদানম্ ॥ ৬৫ ॥

পাঠান্তর : *মুক্তফল, **বামাঙ্গপীঠ।

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং,
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং,
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥ ৬৬ ॥

শ্বেতাম্বরপরিহিত, শ্বেতচন্দনচর্চিত, মুক্তাফলের মালায় বিভূষিত দিব্যমূর্তিধারী, বামাঙ্গপীঠে বা বামক্রোড়ে দিব্যশক্তি বিশিষ্ট, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, পরিপূর্ণ কৃপার আধার, আনন্দময় ও (ভক্তের নিকটে) আনন্দপ্রদ, প্রসন্ন, জ্ঞানস্বরূপ, নিজবোধযুক্ত (আত্মজ্ঞানসম্পন্ন) যোগিশ্রেষ্ঠ, (যোগীন্দ্রগণের) পূজ্য এবং ভবরোগের একমাত্র বৈদ্য, (সংসার-ব্যাধি বিনাশক), শ্রীমদ্‌গুরুদেবকে আমি নিত্য ভজনা করি।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৭ ॥

প্রাতঃকালে মস্তকস্থিত শ্বেতবর্ণ (সহস্রদল, পদ্মে* দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, বর ও অভয় মুদ্রাধারী ও শান্ত মূর্তি গুরুদেবকে তাঁর নাম উচ্চারণ করে স্মরণ করবে।

[ক্রমশঃ

* এ সম্বন্ধে "শ্রীমদ্‌গুরুপাদুকাপঞ্চকস্তোত্রম্"-এ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

আমি দরিদ্র

খগেন্দ্র নাথ পণ্ডিত

বিশ্বের মাঝে নিঃস্ব আমি গো—অর্থ, সম্পদ হারা,
কোন্ বিধাতার অভিশাপ ইহা,—কোন্ বিধাতার ধারা ?
নাই অট্টালিকা, নাই দাসদাসী—
বসন, ভূষণ, নাই রাশি রাশি ;
আহার অভাবে থাকে উপবাসী মোর পুত্র পরিবার।
বাগ ও বাগিচা নাই কোন দিন—
শত অনটনে তনু-মন ক্ষীণ ;
যা' কিছু জোটাই খেটে প্রতিদিন দিন চলা তায় ভার ॥
আমোদ প্রমোদ শুনি কাণে শুধু—
জীবন আমার মরুময় ধূ ধূ ;
সিক্ত বসন শুকাই পড়নে, আঁচলে মুছি গো মাথা।
গামছা জোটে না মাথা মুছিবার—
বিছানা জোটেনা ঘরে শুইবার ;
বালিশের কথা কি বলিব আর, দরিদ্রের হেন ব্যথা ॥
মনে কত আশা বড় হ'য়ে উঠি—
তার তরে করি কত খাটা-খাটি ;
'আমি' বুদ্ধিহীন তাই অতি দীন, কিছুতে না ভরে পেট।
শিক্ষা, দীক্ষা, ধনে যারা বড়—
মোদের অর্থ হয় সেথা জড়ো ;
খাটুনির ভাগ সব তারা পায়, করে থাকি মাথা হেট ॥

পুত্র-কন্যা মোর অর্থাভাবে হায়—
মানুষ না হয়ে পশু হয়ে যায় ;
আমি দরিদ্র কি করি উপায়, নাই এর প্রতিকার।
ভাগ্যে নাই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলি—
শুধু চেয়ে রই দুই চোখ মেলি ;
প্রাণ ফেটে যায়, অভাবেতে জ্বলি, ভেবে মরি অনিবার॥
হে দয়াল প্রভু! কবে যে আমার--
ঘুচাইবে তুমি এ দুঃখ অপার ;
মুছাইয়া দেবে চিরতরে মোর দুই নয়নের জল।
সেই সে দিনের কত দেরী আর—
সুখের মুখটি দেখিব আবার ;
মানুষের মত মানুষ হইব, প্রাণে পাব নব বল॥

——

॥ শুভেচ্ছা ॥

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, এ্যাড্‌ভোকেট

মানুষ যখন বন্দী ছিল

আদিম যুগের অন্ধকারে—

কোন্ দরদী হানলো আঘাত

প্রথম তাহার বন্ধ দ্বারে !

নূতন আলোর ছন্দ নবীন

জানিয়ে দিলো জ্ঞানের দিশা,

মণিমানিক উঠলো জ্বলে

ঘুচলো মনের অমানিশা।

এখনো ঐ গহন কোণে

লুকিয়ে আছে আঁধার কালো,

'শৈবভারতী' প্রকাশ করে

নূতন জ্ঞানের মশাল জ্বালো।

অন্ধ মনের মণিকোঠায়

জ্বালাও জ্ঞানের আলোক শিখা,

নূতন যুগের হে অগ্রদূত !

ভালে তোমার বিজয় টিকা।

— —

॥ নূতনের মোহে ॥

শ্রীবিজয় দেবনাথ

পিলসুজের দিন অস্তপ্রায়,
চারিদিকে বৈদ্যুতিক বাতির ছটা।
চোখে আর পড়ে কই—
সন্ধ্যাবেলায়,
তুলসীতলায়
গ্রাম্য বধূর প্রদীপ জ্বালা'!
মধু ভরা বুকে, চিন্‌তাম—
বঙ্গের যে স্নেহময়ী মাকে,
সন্ধ্যাবেলায় কলসী কাঁখে
জল নিয়ে যাবার ছিল যে ধুম।
জায়ার কোমল কর স্পর্শে
কেড়ে নিত যে ঘুম।
আজ সবই স্বপ্ন সম
কোথায় বা সেই ভগ্নীস্নেহ!
কি জানি, আসেনিতো জীবনে মম
তেমন সুখের আবেশ।
চারিদিকে যখনই তাকাই
সবই যেন নূতন ছবি,
ভাবি হায়, হারাব কি আজ
পুরাতন পৃথিবীর সবই!

———

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈব নাথ-তন্ত্রের উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(১)

ভূমিকা ঃ রাজকীয় আমল হইতেই ত্রিপুরা রাজ্যে নাথদের* ঘন বসতি। দেশ বিভাগের ফলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ,মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলা হইতে আরও বহু নাথ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। মোট যোগফল ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়। যেহেতু বর্তমান লোকগণনায় জাতি লিখিত হয় না, কাজেই গণনার বিবরণী হইতে নাথ সম্প্রদায়ের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করার পথ বন্ধ। তবে ভোটদাতাদের বিভিন্ন তালিকা দৃষ্টে উপরোক্ত সংখ্যা অমূলক বলিয়া মনে হয় না। গণনার দ্বারা সঠিক সংখ্যা নিরূপণের উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে, কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহ ও ব্যয় সঙ্কুলানের অভাবে কাজটি হয় হয় করিয়াও হইয়া উঠিতেছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের দশটি মহকুমার মধ্যে ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, আগরতলা ও বিলোনিয়া—এই কয়টি মহকুমায়ই সংখ্যাধিক্য। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ধর্মনগর এবং সহরাঞ্চলে আগরতলাতেই অধিক নাথের বাস। ধর্মনগরে এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে কয়েক ঘর নাথ দৃষ্ট হয় না। আগরতলা সহরের দুইটি বিরাট এলাকা নাথ প্রধান—ধলেশ্বর ও শিবনগর। উহা সহরের পূর্ব দ্বারে

---

* নাথদের দুইটি বংশ—(১) বিন্দুবংশ ও (২) নাদবংশ। বিন্দুবংশ পিতা-পুত্র-ক্রমে এবং নাদবংশ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রসারিত হইয়াছিল। বিন্দুবংশের গৃহস্থ নাথগণ 'যোগীব্রাহ্মণ বা রুদ্রজব্রাহ্মণ' নামে এবং নাদবংশের সন্ন্যাসী নাথগণ 'যোগী' নামে পরিচিত ছিলেন।

—সম্পাদক

অবস্থিত। নামগুলিও শৈবধর্মের দ্যোতক। ধলেশ্বর ধবলেশ্বর (ধবল — শ্বেত + ঈশ্বর) শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। ধবলেশ্বর শিববাচক। তাহা ছাড়া এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিব এবং শৈবধর্মের সহিত জড়িত। ত্রিপুরার সুপ্রাচীন রাজা ত্রিপুর প্রজাপীড়ক ছিলেন। স্বয়ং শিব ত্রিশূলাঘাতে তাহাকে বধ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করেন। তাহার পর রাজার দীর্ঘ উৎপীড়ন জনিত দারিদ্র্যাদি নানা ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রজাগণ শিবের আরাধনা করেন—

অপরাধ দুঃখ ভোগ করিল বিস্তর।
কার্য্য সিদ্ধি হবে সবে ভজিলে শঙ্কর ॥
মন্ত্রণা করিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিল।
একত্র হইয়া সবে পর্বতে চলিল ॥
কিরাতের মতে সবে পূজা আরম্ভিয়া।
বলিদান কৈল বহু ছাগ আদি দিয়া ॥[১]

পূজায় তুষ্ট হইয়া শিব আবির্ভূত হইয়া বর প্রদান করেন—

ত্রিনয়ন পঞ্চানন আশুতোষ শিব।
বহু কষ্ট পাইতেছে দেখি সব জীব ॥
পূজা স্থানে আসিলেন অখিলের নাথ।
দেখি দণ্ডবৎ হইল ত্রিপুরা অনাথ ॥[২]

শিবের বরে ত্রিপুরের মহিষী হীরাবতীর গর্ভে শিবসদৃশ, প্রজারঞ্জক রাজা ত্রিলোচনের জন্ম হয়। কথিত আছে, শিবের ঔরসেই ত্রিলোচনের উৎপত্তি—

ক্রমে সম্বৎসর ব্রত করে হীরাবতী।
ঋতুকাল জানিয়া আসিল পশুপতি ॥

১। রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড, ২৫-২৭ সংখ্যক পয়ার।

২। ঐ গ্রন্থ, ত্রিপুর খণ্ড, পয়ার সংখ্যা ২৯ ও ৩৪।

শিবের ঔরসে পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
ত্রিলোচন জন্মিবেক শিব আজ্ঞা হৈল ॥[১]

সুতরাং ত্রিলোচন হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ত্রিপুর রাজগণ নাথদের সগোত্র (শিবগোত্র) ইহা স্পষ্ট (ত্রিপুরা রাজগণ শিবগোত্র)।* পরবর্তী অনেক ত্রিপুর নরপতির "ফা"[২] উপাধিও নাথদের মধ্যে ব্যবহৃত "পা" উপাধির সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে। ফা উপাধিধারী ত্রিপুর রাজগণ যথা—ঈশ্বর ফা (পূর্বনাম নীলধ্বজ), ধনরাজ-ফা, মুচং ফা (পূর্বনাম হরিহর), মাই চোঙ্গা ফা (চন্দ্রশেখর), ফতর ফা (কাশীরাজ), কালান্তর ফা (মাধব), চন্দ্রফা (চন্দ্ররাজ),

---

১। রাজমালা ত্রিপুর খণ্ড, চতুর্দ্দশ দেবপূজাবিধি, শেষ পয়ার (পাঠান্তর)। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'রাজমালা', ১ম লহর, পৃষ্ঠা ১৬, পাদটীকা ৮ দ্রষ্টব্য।

২। রাজমালা (কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত), মোট ৭১ জন রাজার ফা উপাধি ছিল, পৃষ্ঠা ৯১।

---

* বিন্দুবংশের গৃহস্থ নাথদের (যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণদের) আদি পুরুষ রুদ্র বা শিব। বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্থান ললাট হইতে একাদশ রুদ্রের উৎপত্তি হয়। সেই একাদশ রুদ্রের একাদশ পত্নীর গর্ভে বহু সন্তানের জন্ম হয়। এই ভাবেই যোগধর্ম-পরায়ণ যোগী ব্রাহ্মণ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ নাথদের সৃষ্টি হয়। একাদশ রুদ্র আসলে একাদশ জন যোগমার্গের ঋষি বা মুনি ছিলেন তাঁহারা যোগসাধনা করিয়া শিবকে জ্ঞাত হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যোগীব্রাহ্মণ বা রুদ্রজব্রাহ্মণদের এই রুদ্রোৎপত্তি বা শিবোৎপত্তি নানান স্থানে নানান ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রজাপীড়ক রাজা ত্রিপুরের উৎখাতকারী ত্রিলোচন, বোধ হয়, নাথদের বিন্দু বংশের যোগীব্রাহ্মণ বা রুদ্রজব্রাহ্মণ ছিলেন ; তিনি, বোধ হয়, ত্রিপুরের মহিষীকে মাতার মর্যাদা দিয়াছিলেন। —সম্পাদক

সাগর ফা, হাচুং ফা বা আচং ফা (সুরেন্দ্র), তৈছুং ফা বা তেজং ফা, যুঝারু ফা বা হামতার ফা (হিমতি), জঙ্গি ফা বা জনক ফা (রাজেন্দ্র), আদিধর্ম ফা, ডুঙ্গুরু ফা, দানকুরু ফা (হরি রায় কিরীট)। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই রাজার দানপত্রে "ধর্ম পা"[১] এই পা উপাধিযুক্ত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরবর্তী ফা-রাজগণ খারুং ফা বা কুরুঙ্গু ফা, মুকুন্দ ফা বা কুন্দ ফা, যশ ফা (যশোরাজ), মোচং ফা (উদ্ধব), ছেংতুম ফা বা সিংহতুঙ্গ ফা (কীর্তিধর). আচং ফা বা কুঞ্জহোম ফা (রাজসূর্য). খিচুং ফা (মোহন), ডাঙ্গর ফা (হরিরায়), রাজা ফা ও রত্ন ফা[২]। নাথ সম্প্রদায়ের পা উপাধিধারিগণ যথা—হাড়ি পা, কানু পা, জালন্ধরি পা ইত্যাদি। "ফা" যুক্ত বানানও আছে—হাড়িফা পূর্বেতে গেল, দক্ষিণে কানফাই (গোর্খবিজয়, পৃ. ৮, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত), রাজ উপাধি ফা. পা = নাথ উপাধি পা, ফা।

এই ফা উপাধিধারী রাজগণের কাল নির্ণয় সম্পর্কে মোটামুটি দিগদর্শন করা যাইতেছে। আদি ধর্ম পা (ফা) বা কিরীট ৫১ ত্রিপুরাব্দে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন।[৩] সুতরাং তাঁহার কাল—৫১ – ৩ = ৪৮ বঙ্গাব্দ = ৬৪০ খৃষ্টাব্দ (৪৮ + ৫৯২)। ত্রিপুরাব্দ বঙ্গাব্দের ৩ বৎসর পূর্বে প্রবর্তিত হয়। সুতরাং উহা তিন বৎসর বেশী। ত্রিপুরাব্দের প্রবর্তক হিসাবে ত্রিপুররাজ যুঝারু ফা-র নাম শোনা যায়। যুঝারু ফা ধর্ম পা-র উর্ধতন ৪র্থ পুরুষ।[৪] সুতরাং যুঝারু ফার কাল

১। রাজমালা পৃ. ২০৮ দ্রষ্টব্য। ২০৭ পৃষ্ঠায় 'আদি ধর্মপাল' লিখিত হইয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ ছাপার ভুল।

২। রত্নফা-ই শেষ ফা উপাধিধারী রাজা। ইনি পরে মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করিয়া রত্নমাণিক্য নামে পরিচিত হন। তখন হইতেই ত্রিপুর রাজগণ মাণিক্য উপাধি ব্যবহার করিতে থাকেন। রত্ন ফা বা রত্নমাণিক্যের কাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দী। (ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৯৬ দ্রষ্টব্য)।

৩। ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২০৭-২০৮।

৪। রাজমালা, পৃ. ২০৮।

৬৪০ — ৫১ = ৫৮৯ খৃষ্টাব্দ। যুঝারু ফার পূর্ববর্তী ফা রাজগণ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রথম ফা রাজা ঈশ্বর ফা যুঝারু ফা হইতে উর্ধতন ৪৩তম পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের সব ঐতিহাসিক কিনা তাহাও বলা দুষ্কর। যাই হউক প্রতি শতাব্দীতে প্রায় আটজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া ধরিলে উক্ত ৪৩ জনে ৫০০ বৎসরের মত সময় গত হয়। এই হিসাবে ঈশ্বর ফার কাল ৫৮৯ — ৫০০ = ৮৯ খৃঃ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী। শেষ ফা রাজা রত্ন ফার দুইটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি ১২৮৮ শকাব্দের (=১৩৬৬ খৃঃ)।[১] সুতরাং রত্নফার কাল খৃঃ ১৪শ শতাব্দী। দেখা যাইতেছে ১ম শতাব্দী হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সার্ধ সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া ত্রিপুর রাজগণের নামের সহিত নাথদের মধ্যে ব্যবহৃত পা বা ফা উপাধি বিদ্যমান।

ফা ও পা : ব্যুৎপত্তি

ফা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে (রাজমালা, পৃ. ৯১)— (১) শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয় রাজগণ ফ্রা উপাধি ধারণ করিতেন। ফ্রা হইতে ফা আসিয়াছে। (২) ত্রিপুরী ভাষায় ফা অর্থ পিতা। এই পিতৃবাচক ফা শব্দই ত্রিপুর রাজগণ উপাধি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন, ত্রিপুরার রাণীদের নামের সঙ্গে মাতৃবাচক মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

তার পুত্র **ভাঙ্গর ফা** নামে নরপতি,

...**ভাঙ্গর মা** ছিলেন তার পত্নীর যে নাম।

রাজমালা, ভাঙ্গর ফা খণ্ড (১ম লহর, পৃ. ৬০)

কিন্তু পা উপাধিও ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা, ধর্ম পা) তাহার কি হইবে ?

নাথদের পা বা ফা উপাধি সম্পর্কে বলা হয়। উহা সংস্কৃত পাদ শব্দজাত এবং সম্মানার্থক। পা পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ফা হইয়াছে।

১। রাজমালা গ্রন্থ পৃ. ১৯৬।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (Obscure Religious Cults, p. 391, পাদটীকা ২ সহ), সুকুমার সেন (নাথপন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য শীর্ষক প্রবন্ধ) প্রভৃতি বিদ্বানের এই মত। ব্রিগ্‌স্‌ মহোদয় মনে করেন পাওনাথ পন্থী নাথ যোগীদের উপাধি পা ; অর্থাৎ পা পাওনাথের নামের আদ্যক্ষর। তিনি আবার বলেন পা শব্দটি তিব্বতী ভাষার (Gorakhnath and the Kanphata Yogis. p. 67)।

তিব্বতী এবং ত্রিপুরী প্রভৃতি পূর্ব ভারতীয় পাহাড়ী ভাষাগুলি একই চীন-তিব্বতী (Sino-Tibetan) অথবা তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় (Tibeto-Burman) ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাই তিব্বতী পা (7 বাংলা ফা) এবং ত্রিপুরী ফা (পা) একই শব্দ হইতে পারে। সুতরাং নাথদের পা, ফা এবং ত্রিপুর রাজবংশের ফা (পা) উপাধি একই শব্দ মনে করা চলে। অর্থের সামান্য ব্যবধান এ অনুমানের বাধক হইতে পারে না।

ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা শিব প্রবর্তিত

ত্রিপুর রাজবংশ শিবসম্ভূত। শুধু তাহাই নহে। ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতারূপে প্রসিদ্ধ বিখ্যাত "চতুর্দশ দেবতা"ও শিব প্রবর্তিত। শিবই ত্রিপুরার জনগণকে চতুর্দশ দেবতার পূজা করিতে নির্দেশ দেন—

(শিবের উক্তি)

চতুর্দশ দেব পূজা করিব সকলে।
আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী হইলে॥
··মহাদেবে বিধি কহে শুনে মন্ত্রিগণে.
করপুটাঞ্জলি হৈয়া শুনে সর্বজনে॥[১]

১। রাজমালা গ্রন্থ, চতুর্দশ দেব পূজাবিধি, পৃ. ১৫। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে মাইল পাঁচেক পূর্ব-দক্ষিণে পুরাতন হাবেলী বা পুরাণ আগরতলা। খয়েরপুর হইতে হাওড়া নদী পার হইয়া পদব্রজে গমন করিতে

লক্ষণীয় এই যে এই চতুর্দশ দেবতার মধ্যে শিবই প্রথমে উল্লিখিত এবং মুখ্য দেবতা। চতুর্দশ দেবতার মধ্যস্থলে তাঁহার স্থান।

হর উমা হরি মা বাণী কুমার গণেশ,
ব্রহ্মা পৃথিবী গঙ্গা অব্ধি অগ্নি যে কামেশ।
হিমালয় অন্ত করি চতুর্দশ দেবা।...[১]

এই চতুর্দশ দেবতার যে প্রতিমূর্তি (মুখমাত্র) পূজিত হয় উহাও নাকি শিবই নির্মাণ করাইয়া দেন—

চতুর্দশ দেবতার চতুর্দশ মুখ।
নির্মাইয়া দিল শিবে আপনা সম্মুখ ॥[২]

[ক্রমশঃ

হয়। তথায় চতুর্দশ দেবতা বা চৌদ্দ দেবতার বাড়ী (মন্দির)। উক্ত তিথিতে প্রতি বৎসর ঐ মন্দিরে চৌদ্দ দেবতার পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। পূজায় অসংখ্য বলি প্রদত্ত হয়। ত্রিপুরার এই বিরাট পূজা গবেষকদের অনেক খোরাক যোগাইবে। এককালে এই দেবতার সম্মুখে নরবলিও হইত। বন্দী পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁকে উদয়পুরে চৌদ্দ দেবতার সম্মুখে বলি দেওয়া হইয়াছিল। তখন উদয়পুরে ঐ মন্দির ছিল।

১। রাজমালা গ্রন্থ, পৃ. ১৬।

২। রাজমালা গ্রন্থ, পৃ. ৫৬।

শিউলি ঝরার ব্যথা

শ্রীবিজয় দেবনাথ

আজ ভাইফোঁটা। একটি মাস আগে আগমনী গানের মাধ্যমে যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল, আজ বলা চলে, তারই পরিসমাপ্তি। এই কয়টি দিন উৎসবে মুখর ছিল বাংলার আকাশ বাতাস। সব কিছুতেই ছিল উৎসব উৎসব গন্ধ। আজও যে নেই, সেটা বলব না। আছে, তবে সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি যেন জোয়ার না এনে ভাটার টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উৎসবকে। মনে হয় সদ্য সমাপ্ত এই একটি মাসের আনন্দ যেন প্রকৃতিও ভুলতে পারছে না। সেটারই প্রকাশ হয়ত বা এই বিদায় মুহূর্তে কান্নার মাঝে।

আজও ছুটির দিন নাই অফিস যাবার তাড়া নেই সীতেশের। আর এমন বাদলধারায় কোথায় ই বা যাবে। তেলেভাজা মুড়ি নিয়ে নিজের বৈঠকখানা ঘরে জানালার ধারে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগল। ভাবনা জেগে উঠল মনে। মানসপটে দেখল শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাদের সকলের মধ্যে এই আজকের দিনটিকে নিয়ে সে কি চঞ্চলতা! কিন্তু তার? তার তো বোন নেই। ভাবতেই তার মন উদাস নেত্রে হারিয়ে যেতে লাগল অতীতের ফেলে আসা দিনগুলিতে। এ্যালবাম ঘাটতে ঘাটতে খুঁজে পেল যেন কিছু। খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠল সীতেশ। তবে ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই আর্জি জানাল ঈশ্বরের কাছে—দিলে যদি তবে হারাতে হল কেন? না পাওয়ার ব্যথা এক, আর পেয়ে হারানোর ব্যথা যে আরও প্রকট।

এই যে তোমার চা। বললাম চা একেবারে খেয়ে তবে এস, তা বাবুর সবুর সইল না—চায়ের কাপ প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ইলা। হঠাৎ স্বামীর দিকে নজর পড়তেই কেমন যেন হয়ে গেল সে।

চোখ দুটিতে বারিধারা একটানা বয়ে চলেছে। উদাসভাবে জানালা পথে তাকিয়ে। কোলের উপর প্লেটে মুড়ি তেলেভাজা তেমনটিই রয়েছে। স্বামীর পাশে বসে হাত দিয়ে একটু ঠেলে জিজ্ঞাসা করল—কিগো তোমার কি হল ? তুমি অমনভাবে বসে আছ কেন ?

স্ত্রীর উপস্থিতি সীতেশের প্রথমে বোধগম্য হয়নি। এবার বুঝতে পারতেই চমক ভাঙল তার। তোয়ালে দিয়ে দুটি চোখ মুছতে মুছতে বলল—না, এমনি বসে আছি। তারপর মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলল—আজ ভাইফোঁটা, তাই না ইলা ?

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ? আমাদের বিয়ে হয়েছে এই পাঁচ বৎসর। প্রতি বৎসরই ভাইফোঁটায় তোমায় এমন দেখি। অথচ জিজ্ঞেস করলে বলনা কিছুই। আরে বাবা, সবার কি বোন থাকে, না সবার ভাই থাকে ? এই যেমন আমার ভাই নেই। তা বলে কি তোমার মত এমন হা হুতাশ করছি ? না করলে পাওয়া যাবে ?

—বুঝবে না ইলা। তোমার না পাওয়ার ব্যথা, আর আমার পেয়ে হারানোর ব্যথা। সে ব্যথা যে আরও বেশী প্রকট—আরও বেশী গভীর।

ইলা আশ্চর্য হল। এই পাঁচ বৎসরে সে কোনদিন জানতেও পারেনি তার কোন ননদ ছিল। —পেয়ে হারানোর ব্যথা! কি বলছ তুমি ? একটু পরিষ্কার কর।

ব্যথায় জর্জরিত সীতেশ হাসবার চেষ্টা করল—আজ পরিষ্কার করব ইলা। শোন, রাণাঘাট—বনগাঁ লাইনে গাংনাপুর ষ্টেশনে নেমে বাজারের ভিতর দিয়ে, পোষ্ট অফিসের পাশ দিয়ে মরাম দেওয়া যে রাস্তাটি চলে গেছে সোজা, সেই রাস্তায় মাইল খানেক গেলেই যে গ্রাম সেই গ্রামে আমার এক মাসীমার বাড়ী। আজ থেকে আটটি বৎসর আগে আমি, ব্যাচেলর অবস্থায়, শেষবারের মতো যাই মাসীরবাড়ী কালীপূজায়। মাসতুতো ভাই বোনদের নিয়ে পূজার দিন এবং পরদিন নানান জায়গায় ঠাকুর দেখে বেশ কেটে গেল। যথারীতি

এসে গেল ভাইফোঁটার দিন। আমি বাড়ী আসতে চাইলাম। কিন্তু বোন অনিমা বলল—আজ কি দিন জান ? আজ অন্য কোথাও যেতে নেই। আমি তোমায় ফোঁটা দেব। বাড়ীতে গেলে তো পাবে না।

ছোট্ট বোনটার গাল দুটি টিপে দিয়ে হাসলাম, আবার দুঃখও পেলাম বাড়ীতে বোন না থাকার দুঃখে। তাছাড়া মাসীমাও নিষেধ করলেন। অগত্যা থাকতে হল। যথা সময়ে আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাধা হল। পরনের ধুতি পাঞ্জাবী খুলতে যখন ব্যস্ত, অনিমা দেখেই ছুটে এল —আরে আরে এগুলো খুলছ কেন ?

—কেন আবার কিছু আছে নাকি ? ফোঁটাতো হয়ে গেছে। মিষ্টিও অনেক খেলাম। বাকিটা না হয় এসব খুলে হাল ফ্যাশানের প্যাণ্ট শার্ট পরেই হবে। কি হবে না ?

দুষ্টু হাসি হেসে অনিমা বলল—না, এখনও অনেক বাকি এবং সেটা হবে এই পোষাকেই।

—সেকি !

—হ্যাঁ, ওই পাশের বাড়ীর অজিত কাকুর মেয়ে শিউলিদি তোমায় আজ ফোঁটা দেবে বলেছে। ওর তো ভাই নেই তাই।

বছর দশেক বয়সের অনিমার মুখে পাকা পাকা কথা শুনে হাসি পেল। শিউলি বলায় আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। শিউলি গত দুদিন আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখেছিল। ও নাকি তখন স্কুল ফাইনাল ক্যাণ্ডিডেট। অনিমার কথায় উত্তর দিলাম—কই আমায় তো কিছু বলেনি ?

—আমায় বলেছে আর মায়ের কাছে বলে গেছে। তুমি গল্প কবিতা লেখ শুনেই শিউলিদি তোমায় দাদার মত ভালবেসে ফেলেছে।

—কে ওকে বলেছে ?

—কাল দুপুরে তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে তখন ও এসেছিল আমাদের বাড়ী। মায়ের কাছে তোমার সব কথা শুনেছে।

এক অনাস্বাদিত আনন্দে মনটা নেচে উঠল। আবার সংকোচও হতে লাগল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়ীতে যেতে হবে শুনে। কিন্তু আর বেশিক্ষণ থাকা হল না। অনিমা টেনে নিয়ে গেল শিউলিদের বাড়ী। ছাড়া পেলাম সেই দুপুরের ভুরিভোজনের পর। অবশ্য শুধু শিউলির কথায় নয়, ওর বাবা-মার কথায় আমাকে অতক্ষণ থাকতে হয়েছিল এবং আসার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হয়েছিল, প্রতি বৎসর ওই দিনটিতে আমি ওদের ওখানে যাব। কিন্তু জান ইলা! আমায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হল। যাওয়া আর হল না।

কেন কেন ?—এতক্ষণ শোনার পর প্রথম মুখ খুলল ইলা।

স্মিতহাস্যে উত্তর দিল সাতেশ—মাসীমার বাড়ী হতে ফিরে আসার পর নূতন বোনটির সঙ্গে আমার চিঠির যোগাযোগ চলতে লাগল। কিন্তু বেশিদিন নয়। কয়েক মাস পর মাসীমার একখানি চিঠি পেলাম. সেই সঙ্গে শিউলিরও। মাসীমার চিঠির এক জায়গায় লেখা ছিল—সাতেশ, তুমি শিউলিদের বাড়া আর চিঠি দিওনা। ওদের খোঁজ খবর রাখবে আমাদের বাড়ী মারফৎ। কারণ তুমি জানতে চেও না। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে।

শিউলির চিঠি খুলতে সমগ্র ব্যাপারটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল—দাদা, সেদিন আপনার কাছে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম আজ সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছি। কারণ সমাজের সূক্ষ্ম অথচ কঠিন বেড়াজাল ভাঙবার সাহস আমার নেই। আপনাকে দাদার আসনে স্থান দিতে পেরে সত্যিই আমি গর্বিত, কিন্তু সমাজ অতি নিষ্ঠুর। বিষাক্ত বায়ু এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে গেছে। তাই তারা ভাই বোনের ভালবাসাকেও সম্মান দিতে জানে না। দেখে অত্যন্ত নীচ দৃষ্টি দিয়ে। যাক দাদা, আমার অনুরোধ আপনার এই বোনটিকে যেন ভুল বুঝবেন না। প্রতি বৎসর ভাই ফোঁটার দিনে যেখানেই থাকুন দুর হতে আমায় আশীর্বাদ করবেন আর আমিও আপনার নামে ফোঁটা তুলে রাখব।

আর কিছু লেখে নি ?—ইলা করুণভাবে বলল।

কান্না ভেজা গলায় সীতেশ উত্তর দিল—অনেকদিন আগের চিঠিতো ; সব মনে নেই। তবে জান ইলা! চিঠি খানিতে দু'ফোঁটা চোখের জলের নিশানা পেয়েছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয় চিঠিখানি লেখার সময় শিউলি কেঁদেছিল।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলা বলল—কান্নার কথাইতো এটা।

—হ্যাঁ ইলা আমি আজও তাই ভুলতে পারিনা শিউলি ফুলের মত পবিত্র আমার বোন শিউলির ঝরে যাওয়ার কথা। সমাজের বিষাক্ত বায়ু কেমনভাবে গ্রাস করে নিল ওকে আমাব জীবন হতে। সেজন্য পেয়ে হারানোর বেদনায় আমি জর্জরিত হয়ে পড়ি প্রতি বৎসর এই দিনটিতে, যখন সকলের মাঝে দেখি চাঞ্চলতা। তবুও সেখানে আর কোনদিন আমি যাইনি শুধু শিউলির মনে আঘাত লাগতে পারে এই ভেবে।

নিজের আঁচল দিয়ে সাতেশের চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে ইলা বলল—এবার ওঠ, চলো ওই ঘরে, আবার চা করব।

সীতেশ আর ইলা ওঘরে চলে গেল। ইলার সান্ত্বনার আশ্রয়ে সীতেশ নিজেকে সঁপে দিল। বাইরে প্রকৃতি সেই একইভাবে বিষাদের সুর বয়ে নিয়ে চলেছে।

—:*:—

মুসৌরীর মিষ্টি স্মৃতি

রুমা নাথ

হরিদ্বার, ঋষিকেশ ঘুরে অবশেষে এসে পৌঁছলাম দেরাদূনে। সঙ্গে দিদি এবং জামাইবাবু। জামাইবাবু বললেন পরের দিন সকালে বাসে চেপে উঠতে হবে মুসৌরীতে। সেদিন রাতে থেকে গেলাম একটা হোটেলে। রাতে হোটেলের চারতলা ছাদের উপর থেকে দেখলাম দূরে পাহাড়ের গায়ে তারার মত বিন্দু বিন্দু আলোর মালা। দিদি বললেন ওটাই মুসৌরী শহর। দেখে আশ্চার্য হয়ে গেলাম। দূর থেকে সেই আলোক সজ্জায় সজ্জিত শহরটা আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে লাগল।

সকালের মিষ্টি রোদে আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মাথায় রঙের খেলা শুরু হয়েছে, সোনা রোদে গেরুয়া হয়ে আসে বেলা বাড়ার সংকেত নিয়ে। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাসের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বাসে চড়ে রওনা হলাম সেই স্বপ্নময়ী শহরের দিকে। বাস পাহাড়ের কোল ঘেষে উঠতে লাগল। রাস্তাগুলো যেন বিরাট অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। বাসের মধ্যে বসেই সেই সৌন্দর্যময়ী শহরের সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করতে লাগলাম। শুধু পাহড় আর পাহাড়। কোথাও বা পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে চাষাবাদ করা হয়েছে, কোথাও বা পাহাড়ের গা বেয়ে ক্ষীণ জলধারা নেমে এসেছে।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাস উঠছে উপরে আর অন্যদিকে গভীর খাদ। তাকালেই শরীরের সমস্ত রক্ত যেন বরফ হয়ে যায়। একবার পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর অবশেষে এসে নামলাম মুসৌরীর কোলে। বাস থেকে নামার সাথে সাথেই এক ঝলক ঠাণ্ডা

হাওয়া সমস্ত শরীর জুড়িয়ে দিল, আর তারপরেই বেশ বুঝতে পারলাম সেখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। দেরাদূনে গরমে খাওয়ার জল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিল না আর সেখান থেকে কিছুটা দূরেই যে এমন ঠাণ্ডা হতে পারে তা ছিল আমাদের কল্পনারও অতীত।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গাইড সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা হলাম সেই রহস্যময়ী শহরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে বাড়াগুলো যেন মনে হতে লাগল চিত্রপটে আঁকা সুদৃশ্য ছবি। পাহাড়ের কোলে হেঁটে বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় দেখলাম অনেকগুলো পাইন গাছ ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেছে; যেন মনে হয় কেউ অনেক যত্নে ওগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। প্রকৃতির এমন অপরূপ রূপ এর আগে আমি কোনদিন দেখিনি। প্রকৃতিদেবী যেন তার অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন এই স্বপ্নময়ী শহরটাকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরে একটা পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে গাইড বললেন ওই পাহাড়টার নাম 'উটপাহাড়'। দেখে আশ্চর্যবোধ হল। সত্যিই যেন মনে হয় একটা উট নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করছে। পাহাড়ের গায়েই গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, হস্টেল। কিছু স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের চোখে পড়ল।

হঠাৎ সেই শান্ত পরিবেশে একটা দৈত্য যেন এসে পড়ল। মেঘ, মেঘ, আর মেঘ, চারিদিকে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস, আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম আশ্রয়ের জন্য। সামনেই ছিল একটি "শিশু উদ্যান", তার মধ্যেই আশ্রয় নিলাম, আর তার পরেই শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। সে বৃষ্টি থামার তখন কোন লক্ষণ ছিল না। নিরুপায় হয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপছি। ইতিমধ্যে আরো অনেকেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামল। কিন্তু বৃষ্টি থামলে কি হবে? দুরন্ত মেঘগুলো দুষ্টু ছেলের মত দৌড়ে এসে সবাইকে ভিজিয়ে দিতে লাগল। জামাইবাবু 'রোপ ওয়ে'-তে ওঠার

জন্য টিকিট কেটে আনলেন। সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমরা গিয়ে উঠলাম 'রোপওয়ে'র ভিতর। চলতে শুরু করল সেই অজানা অচেনা যানটা। কাঁচের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে তাকালাম। সমস্ত শরীর মুহূর্তে বরফ হয়ে গেল। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কারেন্টের সাহায্যে ঝুলতে ঝুলতে উঠছি। পড়লে মৃত্যু অবধারিত। নীচে কোথায় যে পাহাড়ের শেষ তা আর চোখে পড়ে না। দুটো পাহাড়ের শেষ সীমান্ত যেন একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একসময় 'রোপওয়ে' থামল, ঠাণ্ডায় বেরোতে পারলাম না। চালক বললেন এটা 'উট পাহাড়'। দূর থেকে যে 'উট পাহাড়' দেখেছিলাম তারই পিঠে উঠেছিলাম। তারপর আবার নেমে এলাম। ঝির ঝির করে বৃষ্টি তখনও হয়েই চলেছে। আর ঘোরা হলনা। দেখার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও ঘোরার আর উপায় ছিল না। পাহাড়ের গায়ে জল পড়ে রাস্তা হয়ে উঠেছিল বিপদসঙ্কুল। বাধ্য হয়েই ফিরে এলাম বাসস্টাণ্ডে। তারপর সেখান থেকে দেরাদুনে।

বলতে গেলে মুসৌরীতে আমরা কিছুই দেখিনি। তবুও মুসৌরীর সেই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে চিরঅঙ্কিত হয়ে থাকবে।

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—**বি. দেবনাথ**

পাত্র আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র (৩০), (৫'-১০"), বি-এস-সি, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী চাকুরে—ষ্টীলে কর্মরত এবং উচ্চতর ট্রেনিং-এ নিযুক্ত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের গ্রাজুয়েট, সঙ্গীতজ্ঞা, দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা, সুন্দরী শান্তস্বভাবা পাত্রী (২৪/২৫) চাই। অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দেবনাথ, পোঃ—হাবড়া-প্রফুল্লনগর, ২৪ পরগণা, পিন—৭৪৩২৬৮।

পাত্রী—২৭ বৎসর P. U. ফেল। ফর্সা, সুশ্রী দোহারা, আদিনিবাস ঢাকা বিক্রমপুর বর্তমান সন্তোষপুর। কর্মরত পাত্র কাম্য। পি. এন. ভারতী, ১নং কালিবাড়ী রোড, সন্তোষপুর যাদবপুর, কলিকাতা—৭৫।

পাত্র—কলিকাতায় ব্যবসায়ী, স্কুল ফাইনাল অনুত্তীর্ণ, মাসিক আয় ১৫০০ টাকা, বয়স ২৮, স্বাস্থ্য মাঝারী, উপযুক্ত পাত্রী চাই।

এবং

পাত্রী—(২৭) বি. এ, Part I উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, উচ্চতা ১.৫২ সেমি. স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী, গৃহ কর্মনিপুণা সম্ভ্রান্ত পরিবার। সত্বর যোগাযোগ করুন। শ্রীভুবন মোহন ভৌমিক, বিধান পল্লী, পোঃ ইছাপুর নবাব গঞ্জ, জেলা—২৪ পরগণা।

পাত্র—(২৮) এম. বি. বি. এস ডাক্তার। এম. ডি. পাঠরত, সুপুরুষ। পাত্রী চাই ইঞ্জিনীয়ার/ডাক্তার কিম্বা এম. এ./এম. এস-সি পাশ। সুন্দরী গ্রাজুয়েট পাত্রী হইলেও চলিবে। পত্রে যোগাযোগ করুন—বি. দেবনাথ, ৫২/৬ এস. বি. নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬।

পাত্রী—(২৫) (৫') শ্যামবর্ণা, বি. এ. পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়াছে। ক্লাসিকে ফোর্থ ইয়ার, টাইপ জানা, গৃহকর্ম ও সূচীশিল্পে নিপুণা, পাত্র সরকারী কর্মচারী হইলেই ভাল হয়। শ্রী বি. দেবনাথ, ৫২/৬ এস. বি. নিয়োগী, গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬।

পাত্র—(২৭) (৫'-৬") কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী কর্মচারী (৬৫০)। হলদিয়ায় ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে কর্মরত। এস. এফ. অনুত্তীর্ণ, সুন্দর স্বাস্থ্য, নিজস্ব বাড়ী। পাত্রী চাকুরীরতা হইলে ভাল হয়।

এবং

পাত্রী—ঐ ভগ্নী (২৪) (৫'-২") এস. এফ পাশ। শ্যামবর্ণা, সুগঠনা, রুচীশীলা সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে সুনিপুণা, উপার্জনশীল পাত্র চাই। [বদল সম্বন্ধেও আপত্তি নাই]—শ্রীগোপাল রায়, Income Tax Office. B. Ward, Dist-III (2), 4th floor. 18 Rabindra Sarani, Cal-1

পাত্রী—(২৯) B. A,, B. Ed., উচ্চতা ৫'-২" ও পাত্রী—(২৫) B. A., (৫'-৫") গৌরবর্ণা, সুশ্রী, গৃহ ও সূচী কর্মে নিপুণা। উপার্জনশীল পাত্র চাই। H. L. Nath, 27/44, Namdih Road, Burmamines, Jamshedpur-831007 (Bihar)।

পাত্রী—(১৫), গায়ের রঙ ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী এবং গৃহকর্মে নিপুণা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছে, উপযুক্ত চাকুরী বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শ্রীনিলমনি দেবনাথ, ১৫, হর্কাস কর্ণার (মৌসুমী) পোঃ-কাঁচড়াপাড়া, জেলা-২৪ পরগণা।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন সদস্য চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ: যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৯

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

শিব-স্তোত্রম্

ওঁ কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব "ওঁ"—কারায় নমো নমঃ॥
নমন্তি ঋষয়ো দেবা নমন্ত্যপ্সরাং গণাঃ।
নরা নমন্তি দেবেশং "ন"—কারায় নমো নমঃ॥
মহাদেবং মহাত্মানং মহাধ্যানপরায়ণম্।
মহাপাপহরং দেবং "ম"—কারায় নমো নমঃ॥
শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকানুগ্রহকারকম্।
শিবমেকপদং নিত্যং "শ"—কারায় নমো নমঃ॥
বাহনং বৃষভো যস্য বাসুকিঃ কণ্ঠভূষণম্।
বামে শক্তিধরং দেবং "বা"—কারায় নমো নমঃ॥
যত্র যত্র স্থিতো দেবঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর।
যো গুরুঃ সর্ব্বদেবানাং "য"—কারায় নমো নমঃ॥
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে॥

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ! নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ড-পাশাসি-পাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

সম্পাদকীয়

অনেকেই মনে করে থাকেন, 'নাথ বা দেবনাথ' পদবীধারী সকলেই একজাতিভুক্ত। এই ধারণার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের একটি অংশও 'নাথ' শব্দ দ্বারা তাঁদের জাতিগত পরিচয় প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক কি ?

শ্রীখগেন্দ্রনাথ ভৌমিক ভারতবর্ষে (পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, কনৌজ, কেরালা, গুজরাট, ছোটনাগপুর, তামিলনাড়ু, দিল্লী, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, সাঁওতালপরগণা, সিংভূম, হরিয়ানা প্রভৃতি স্থানে), বাংলাদেশে এবং নেপালে বসবাসকারী বিভিন্ন হিন্দু-জাতির পদবী নিয়ে সমীক্ষা করেছেন। সেই সমীক্ষার ফলাফল তিনি তাঁর "পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে প্রকাশও করেছেন। সেখানে দেখা যায়,—'নাথ বা দেবনাথ' পদবী রুদ্রজব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, তিলি, কর্মকার, তন্তুবায়, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে।

আমরা জানি, 'নাথ বা দেবনাথ' রুদ্রজব্রাহ্মণদের বিশেষ ব্রাহ্মণ-পদবী ; এই পদবী 'শৈব ও শাক্ত' ধর্মের আদি-গুরুকুলের পদবী। তাহলে এই পদবী অন্য জাতির মধ্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে কেন ?

'শৈব ও শাক্ত' ধর্মের আদিগুরুগণ সকলেই গৃহস্থ ছিলেন ; তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মার ললাট থেকে উৎপন্ন একাদশ রুদ্রের বংশধর। তাই তাঁরা রুদ্রজব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে এই রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের একটা অংশ সন্ন্যাস অবলম্বন করে একটি সন্নাসী-সম্প্রদায় স্থাপন করেন। এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ 'যোগী' নামে পরিচয় দেন এবং 'নাথ' পদবীই ব্যবহার করেন।

এই ভাবে নাথগুরুগণ দুটি বংশে—(১) বিন্দু বংশে (গৃহস্থ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বংশে) এবং নাদবংশে (সন্ন্যাসী যোগী বংশে) বিভক্ত হয়ে পড়েন।

গৃহস্থ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী যোগী এই উভয় প্রকার নাথ-গুরুর কাছ থেকেই সকল বর্ণের সকল হিন্দু-গৃহস্থই সাধারণ দীক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু রুদ্রজব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন গৃহস্থ সাধারণ দীক্ষার পরেও 'নাথ' পদবী ব্যবহার করতে পারতেন না। তবে সন্ন্যাসী যোগী নাথগুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করার পর সকলেই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করতে পারতেন।

হিন্দু-গৃহস্থদের ক্ষেত্রে 'নাথ' পদবী ব্যবহারের উপরোক্ত বিধিনিষেধ পরবর্তীকালে শিথিল হয়ে যায়। সেই সময় অন্য জাতির গৃহস্থদের অনেকে সন্ন্যাসী যোগী-নাথগুরুর কাছ থেকে সাধারণ দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েই 'নাথ' পদবী ব্যবহার করেন। এই ভাবেই অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে 'নাথ' পদবী এসে যায়

সুতরাং 'নাথ বা দেবনাথ' পদবী দেখলেই সকলকে একজাতিভুক্ত বলে মনে করা ঠিক নয়, ঠিক নয় 'নাথ' শব্দ দ্বারা কোন জাতিগত পরিচয় প্রদান করাও।

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈব নাথ-তত্ত্বর উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দশ দেবতার পুরোহিত

এই দেব-পূজার পুরোহিতের ব্যবস্থাও শিবই করিয়া দেন। এই পুরোহিত সাধারণ ব্রাহ্মণ নহেন, স্থানীয় লোকও নহেন। প্রধান পুরোহিত 'চণ্ডাই' এবং সহকারী 'দেওড়াই' নামে খ্যাত। সমুদ্রের দ্বীপে ইঁহাদের বসতি—

(শিবের উক্তি) পূজাব যে পূর্বদিন প্রাতঃকাল লাভে।
সংযম করিবে চণ্ডাই দেওড়াই সবে॥
পূজাবিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে।
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জনে॥
তাহাকে আনিবা যাইয়া রাজার সহিতে।
যেখানে পূজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে॥[১]

'চণ্ডাই' সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয় লিখিয়াছেন—'চণ্ডাই দেবালয়ের মোহান্ত স্থানীয় ব্যক্তি। রাজমালা আলোচনায় ইঁহাদের সদাচার, ধর্মাচরণ, ত্যাগস্বীকার এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধীয় যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ইঁহারা ঋষিকল্প যোগীপুরুষ ছিলেন (চণ্ডাই, দেওড়াই = যোগমার্গের সাধক)।

১। রাজমালা, পৃ. ১৬; পৃ. ২৭ এও চণ্ডাই দেওড়াই প্রসঙ্গ আছে। তদতিরিক্ত গাঁলিম নামক পূজারীর কথাও আছে।

এই শ্রেণীর সংসারত্যাগী তপস্বীগণের জাতি বিচার করিতে যাওয়া সকল কালেই অসম্ভব।'[১] সেন মহাশয় আরও লিখিয়াছেন (পৃ. ১৩৬), 'চণ্ডাই' শব্দ ত্রিপুরার হালাম উপজাতির 'চুয়ান্তাই' শব্দ হইতে জাত। হালাম ভাষায় চুয়ান্তাই অর্থ ব্রাহ্মণ। কিন্তু প্রশ্ন হইল—ব্রাহ্মণ বাচক চুয়ান্তাই শব্দ হালাম ভাষার নিজস্ব হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? উপজাতিরা চতুর্বর্ণে বিভক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্গত না হওয়ায় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বাচক শব্দাবলীও তাহাদের নিজস্ব হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না; পরন্তু হিন্দুধর্ম ও আর্য্যভাষা হইতে গৃহীত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, 'চণ্ডাই' ব্রাহ্মণ কিনা সেন মহাশয় তাহাও নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে যোগিপুরুষ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমান লেখকের ধারনা, চণ্ডাই শব্দ চন্দ্রদ্বীপ হইতে আগত নাথ-পুরোহিত* বাচক। (চণ্ডাই চন্দ্রদ্বীপবাসী নাথ), মৎস্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ গঙ্গার মোহনার সন্নিকটবর্তী দ্বীপ বিশেষে উৎপন্ন হন।[২] আবার নাথ সম্প্রদায়ে -আই যুক্ত নাম প্রচলিত ছিল এবং

১। রাজমালা, পৃ. ১৩৬।

২। দ্রষ্টব্য: কৌলজ্ঞান নির্ণয়, ১৬শ পটল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চন্দ্রদ্বীপকে বাখরগঞ্জ জেলার চন্দ্রদ্বীপের সহিত অভিন্ন মনে করেন। ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচীর মতে নোয়াখালি জেলার সন্দ্বীপই প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১ম সংখ্যা তৎ সম্পাদিত কৌলজ্ঞান নির্ণয় গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ২৯-৩২)। পঞ্চানন মণ্ডল বলেন—"মীননাথ 'বঙ্গদেশে', সম্ভবতঃ দক্ষিনবঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদিলীলা সুন্দরবন

---

* নাথদের বিন্দুবংশের যোগীব্রাহ্মণ বা রুদ্রজব্রাহ্মণ এবং নাদ-বংশের সন্ন্যাসীযোগী উভয়েই গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য করিতেন; তবে, সন্ন্যাস দীক্ষা দানের অধিকার একমাত্র নাদবংশের সন্ন্যাসী যোগীদেরই ছিল। —সম্পাদক

এখনও বিরল নহে। যথা—গোরক্ষনাথকে গোরখাই, মীননাথকে মীনাই, গাভুর সিদ্ধাকে গাভুর সিদ্ধাই বলা হইয়াছে—

এক শিষ্য আছে মোর যতী গোরখাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই ॥[১]

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই।
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই ॥[২]

হাসিয়া উত্তর দিল যতী গোরখাই।
ভাল কথা কহিয়াছ কদলীর মাই ॥[৩] ইত্যাদি।

সুতরাং চন্দ্রদ্বীপবাসী নাথকে চন্দ্র + আই = চন্দ্রাই > চন্দাই > চণ্ডাই বলা হইয়া থাকিতে পারে এবং এই শব্দ ত্রিপুরার কোন উপজাতীয় ভাষায় গৃহীত হইয়া 'চুয়াস্তাই' উচ্চারিত হইলেও হইতে পারে। শিব প্রধান চতুর্দশ দেবতার অর্চনায় শৈব নাথ পুরোহিত নিযুক্ত করা অস্বাভাবিক নহে। আর সেই প্রাচীনযুগে নাথেরা গুরুতা পৌরোহিত্যে বৃত হইতেন।

সন্নিহিত সমুদ্র অঞ্চলে বলিয়া মনে করি। গোর্খবিজয়ের সাগর বঙ্গোপসাগরের ইঙ্গিত হইতে পারে। কৌলজ্ঞানের চন্দ্রদ্বীপ নিশ্চয়ই সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চল। মধ্যলীলা কামরূপে···" (গোর্খবিজয়, ভূমিকা)। গোর্খবিজয়ে (পৃ. ৬-৭) কথিত আছে— মহাদেব সমুদ্রের মধ্যে গমন করতঃ গৌরীকে পরমতত্ত্ব শুনাইতেছিলেন। তথায় মীন নাথ মৎস্যরূপে তাহা শ্রবণ করেন। এই প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত Obscure Religious Cults, পৃ. ৩৬৪ দ্রষ্টব্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের মতে চণ্ডাই দেওড়াই কোন দ্বীপে ছিলেন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে প্রবাদ অনুসারে উহা বঙ্গোপসাগরের অবস্থিত আদিনাথ তীর্থ (রাজমালা, পৃ. ১৩৮)।

১। গোর্খবিজয়, পৃ. ৬২

২। ঐ পৃ. ৮।

৩। ঐ পৃ. ৪১।

দেওড়াই শব্দের ব্যুৎপত্তি

এখন 'দেওড়াই' শব্দ নিয়া একটু আলোচনা করা যাউক। রাজবলী নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় কামাখ্যা দেবীর পূজারীগণের উপাধি দেওড়ি।[১] দেওড়াই ও দেওড়ি সমার্থক এবং একই মূলোৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন মূল শব্দ 'দেবরায়'। কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না। মূলশব্দ 'দেবল' হইতে পারে কিনা চিন্তনীয়। রাজমালায় আছে, চণ্ডাই, দেওড়াই এবং গালিম ইহারা যতি পুরুষ এবং ত্রিপুরা হইতে বহু দূরবর্তী এক দ্বীপের অধিবাসী। ত্রিপুররাজ ত্রিলোচন তাঁহাদিগকে ঐ স্থান হইতে আনয়ন করেন—

বহু দিনান্তরে রাজা সে দ্বীপ পাইল।
চণ্ডাই দেওড়াই সবে আশু বাড়ি নিল॥
দেওড়াই গালিম পূজক তারা যতি।
সবে আসি দেখিলেক ত্রিলোচন পতি॥
শুভদিনে দেওড়াই রাজার সহিতে।
রাজধানী আসিলেন মন হরষিতে॥[২]

মৎস্যেন্দ্রনাথের আদিলীলাভূমি চন্দ্রদ্বীপ হইতে চণ্ডাই (<চন্দাই< চন্দ্রাই) নামে খ্যাত নাথ পুরোহিত আসিয়া থাকিতে পারেন একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। দেওড়াইও সেখান হইতেই আসিয়াছিলেন একথা রাজমালার উপরোক্ত বচনে দেখা যাইতেছে। তবে নামে ভেদ হইবার কারণ কি? দেওড়াইরা অন্য কোন স্থানের অধিবাসীও হইতে পারেন। রাজমালার উক্ত অংশ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। ঘটনা বহু শতাব্দী পূর্বের। উহা লেখকের প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে। তিনি হয়ত কোন জনশ্রুতি অবলম্বনে এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই প্রকৃত তথ্য অন্যরূপও হইতে পারে। [ক্রমশঃ

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত—রাজমালা, পৃ. ১৩৬

২। ঐ গ্রন্থ, পৃ. ২৭

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্ ।
শিব-শাসনতঃ শিব-শাসনতঃ
শিব-শাসনতঃ শিব-শাসনতঃ ॥ ৬৮ ॥
ইদমেব শিবম্ ইদমেব শিবম্
ইদমেব শিবম্ ইদমেব শিবম্ ।
মম শাসনতো মম শাসনতো
মম শাসনতো মম শাসনতঃ ॥ ৬৯ ॥ *

গুরুদেবের অধিক বা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই, নেই, নেই,—এই শিবের পুনঃ পুনঃ শাসন বা উপদেশ। ইনি (গুরুদেব) সর্বদা মঙ্গল-বিধায়ক, ইনি পরম শিব,—এ আমার (শিবের) বারংবার অনুশাসন জানবে।

এবংবিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্ ।
তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥ ৭০ ॥

এইভাবে গুরুদেবের ধ্যান করতে করতে জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হয়। তখন "গুরুপ্রসাদে আমি মুক্ত হয়েছি"—এইরূপ ভাবনা করবে।

গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃশুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ ।
অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎকিঞ্চিদাত্মগোচরম্ ॥ ৭১ ॥

গুরুদেব কর্তৃক প্রদর্শিত মার্গে (সাধনপথে) মনকে শুদ্ধ করবে এবং আত্মগোচরীভূত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, সে সমস্ত খণ্ডন করবে।

---

* বাক্যের দৃঢ়তা সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে একই বাক্যাংশ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্ঞেয়ং সর্ব্বমনিত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং কুর্য্যান্নান্যোঽপ্যাত্মদ্বিতীয়ক ঃ॥ ৭২॥

জ্ঞেয় (জ্ঞানের) সমস্ত বস্তুই অনিত্য, মনকেই জ্ঞানস্বরূপ বলা হয় (অর্থাৎ মন ব্যতীত জ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব নেই)। সেইজন্য জ্ঞান ও (জ্ঞানসাপেক্ষ) জ্ঞেয় বস্তুকে সমজ্ঞান করবে (কারণ জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই অনিত্য), একমাত্র আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কিছুই নেই।

এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।

স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৭৩॥

হে মহাদেবি! এইরূপ (গুরুতত্ত্ব) শ্রবণ করেও যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা করে, সেই ব্যক্তি যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ততদিন ঘোরতর নরকে বাস করবে।

যাবদ্দেহান্তকালোঽস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ।

গুরুলোপো ন বক্তব্যঃ স্বচ্ছন্দং তঞ্চ* ভাবয়েৎ॥ ৭৪॥

পাঠান্তর ঃ *যদি।

হে দেবি! যতদিন জীবিত থাকবে (দেহান্তকাল পর্যন্ত), ততদিন গুরুদেবকে স্মরণ করবে। গুরুদেবের লোপ বা মৃত্যু কখনো বলবে না, তাঁকে স্বচ্ছন্দে চিন্তা করবে।

গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন।

অহঙ্কারো ন কর্তব্যঃ প্রাজ্ঞৈঃ শিষ্যৈঃ কথঞ্চন॥ ৭৫॥

গুরুদেবের সম্মুখে কখনো অসত্য কথা বলা উচিত নয় এবং প্রাজ্ঞ শিষ্যগণ কর্তৃক কোনরূপ অহঙ্কার করা কর্তব্য নয়।

যো বৈ হুঙ্কৃত্য হুঙ্কৃত্য গুরুং নির্জ্জিত্য বাদতঃ*।

অরণ্যে নির্জ্জনে স্থানে** স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥ ৭৬॥

পাঠান্তর ঃ *ভাষতে, **নির্জ্জনস্থানে।

যে ব্যক্তি হুঙ্কার দিয়ে গুরুদেবকে বিচারে পরাজিত করে, সেই ব্যক্তি অরণ্যে জনশূন্যস্থানে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে থাকে।

মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরূরক্ষতি পার্ব্বতি ॥ ৭৭ ॥

হে পার্বতি! (মর্তে) মুনিগণ, (পাতালে) পন্নগগণ (সর্পগণ), এমন কি (স্বর্গে) দেবতাগণ দ্বারাও যদি (শিষ্য) অভিশপ্ত হয়, তা থেকে এবং (যমালয়ে) কালমৃত্যুভয় থেকে গুরুদেব (তাকে) রক্ষা করেন।

অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

সমস্ত দেবতা অশক্ত, মুনিগণও (রক্ষায়) অশক্ত। গুরুশাপগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষীণ হতে হতে ক্ষয় প্রাপ্ত (বিনাশ প্রাপ্ত) হয়, এতে সংশয় নেই।

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
শ্রুতিবেদান্তবাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্ ॥ ৭৯ ॥

হে দেবি! "গুরু" এই অক্ষরযুগল মন্ত্রের রাজা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। শ্রুতি (বেদ) ও বেদান্ত বাক্যানুসারে গুরুই সাক্ষাৎ পরম পদ (পরম ব্রহ্ম)।

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ ॥ ৮০ ॥

যাঁরা শ্রুতি (বেদ) ও স্মৃতিশাস্ত্রে জ্ঞানশূন্য হয়েও কেবল গুরু-সেবায় তৎপর, তাঁরাই যথার্থ সন্ন্যাসী বলে কীর্তিত হন, অপর সকলে বেশধারী মাত্র।

গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন* আত্মারামো হি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥ ৮১ ॥

পাঠান্তর: *সেবা প্রসাদেন।

গুরুদেবের কৃপাপ্রসাদেই আত্মারাম (আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ) লাভ করা যায়। এই গুরুমার্গের (গুরু উপদিষ্ট সাধনপথের) দ্বারাই আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রবর্তিত (উৎপন্ন) হয়।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ম্॥ ৮২ ॥

ব্রহ্ম থেকে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত স্থাবর (স্থিতিশীল বা অচল) ও জঙ্গম (গতিশীল বা সচল) সমস্তই পরমাত্মস্বরূপ ; সেই জগন্ময়কে (জগৎ-ব্যাপী জগদাত্মক পরমাত্মস্বরূপ গুরুদেবকে) প্রণাম করি।

নিত্যপূর্ণং* নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্।
পরাৎ পরতরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্**॥ ৮৩ ॥

পাঠান্তর : *নিত্যং পূর্ণং, **সর্ব্বদানন্দকরকম্।

নিত্যপূর্ণ (সর্বদা পরিপূর্ণ), নিরাকার (আকারবিহীন), নির্গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের অতীত), স্বাত্মসংস্থিত (স্বীয় আত্মরূপে অবস্থিত), শ্রেষ্ঠ থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, নিত্য আনন্দকারক (গুরুরূপী ব্রহ্ম) পরম ধ্যেয়।

হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্।
স্ফটিক-প্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্পণে যথা।
তথাত্মানং চিদানন্দমানন্দং সোঽহমিত্যতঃ॥ ৮৪ ॥

যেমন দর্পণে স্ফটিক-প্রতিমার রূপ বিশুদ্ধ (নির্মল) স্ফটিকের ন্যায় দেখা যায়, তেমনি আত্মাকে (গুরুরূপী পরমাত্মাকে) হৃদয়রূপ আকাশের মধ্যস্থিত চিদানন্দময় ও আনন্দস্বরূপ "সোঽহম্" অর্থাৎ "আমিই সেই" মনে করবে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ধ্যায়েত চিন্ময়ং হৃদি।
তত্র স্ফুরতি যো ভাবঃ শৃণু তং কথয়াম্যহম্॥ ৮৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ চিন্ময় পুরুষকে (গুরুব্রহ্মকে) হৃদয়ে ধ্যান করলে, তাতে যে ভাব স্ফুরিত হয়, তা আমি বলছি, শ্রবণ কর।

অগোচরং তথাগম্যং রূপনামাদিবর্জ্জিতম্ ।
নিঃশব্দং তং* বিজানীয়াৎ স ভাবো**ব্রহ্ম পার্ব্বতি ॥ ৮৬ ॥

পাঠান্তর : *নিঃশব্দকং ; **স্বভাবো ।

হে পার্বতি ! (ইন্দ্রিয়সমূহের) অগোচর, (বুদ্ধির) অগম্য, রূপ ও নামাদি বর্জিত এবং শব্দশূন্য (শব্দজ্ঞানের অতীত) সেই ভাবকে ব্রহ্ম বলে জানবে ।

যথা নিজস্বভাবেন কর্পূরং কুঙ্কুমাদিকম্ ।
শীতোষ্ণাদিস্বভাবেন যথা ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্ ॥ ৮৭ ॥
গুরুধ্যানাৎ* তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।
পিণ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

পাঠান্তর : *গুরোর্ধ্যানাৎ ।

যেমন কর্পূর ও কুঙ্কুম প্রভৃতি নিজ স্বভাববশত গন্ধাদি বিতরণ করে, যেমন শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু স্বভাবগুণে পর্যায়ক্রমে প্রকটিত হয়, যেমন পরমাত্মা ব্রহ্ম স্বভাবতঃই শাশ্বত ; সেইরূপ গুরুদেবের ধ্যানে নিরত দেহধারী জীব নিজ স্বভাবেই ব্রহ্মময় হয়ে থাকেন । 'পিণ্ডে', 'পদে' ও 'রূপে' তাঁরা (গুরুদেবের ধ্যানরত ব্যক্তিগণ) মুক্ত হন, এতে সংশয় নেই । [ক্রমশঃ]

ফিজি দ্বীপের আতঙ্ক

ভুপেশ চন্দ্র সেন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তারপর সাতদিন কেটে গেল।

আজ আবার সেই ভয়ঙ্কর শুক্রবার। আজ রাত্রে শোবার আগে কেন যেন এক অজানা ভয়ে গাটা ছমছম্ করছিল। তাই ঘুমাবার আগে দরজা জানলাগুলো শক্ত করে বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। তারপর কখন যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, তার কোন খেয়াল নেই।

আমার বাংলোর নিকটেই একটা খুব বড় গাছ ছিল। ওটাতে অনেকগুলো বাঁদর থাকতো এবং তারই মগডালে নানা রং বেরংয়ের বিচিত্র রকম পাখীরা সন্ধ্যে হলেই এখানে এসে আশ্রয় নিত।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল বানরগুলোর ছুটোছুটির শব্দে এবং পাখীগুলোর প্রাণ ফাটান চীৎকার শুনে পরিষ্কার মনে হ'লো ওরা সবাই যেন কি দেখে ভয়ানক ভয় পেয়েছে। তার পরই অদ্ভুত একটা বুনো শুয়োরের ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে এল। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে বিছানা ছেড়ে পিস্তল হাতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর একটান মেরে জানলাটা খুলে, জামার পকেট থেকে টর্চ বের করে জানলার বাইরে আলোটা ফেললাম।

টর্চের তীব্র আলোতে জায়গাটা দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে গেল কিন্তু কোন কিছুই নজরে পড়ল না। সত্যি কথা বলতে কী আমি যদিও কোন কালেই ভীতু ছিলাম না, হেনরীর সেই ব্যাপারটা ঘটার পর থেকে আমার মনের মধ্যে কী যেন এক অজানা আতঙ্ক বাসা বেঁধেছিল।

সুতরাং জানলাটা বন্ধ করে বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়লাম।

এখানেও মশা ও অন্যান্য বিষাক্ত পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রোজ রাত্রে মশারী টাঙানো হোত। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ঘুমোবার আগে পিস্তলটা বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়লাম, যেমন রোজ করতাম।

সারাদিন পরিশ্রমের দরুণ হোক বা আর কোন কারণেই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তন্দ্রা দেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

....		....		....

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম আমার খেয়াল নেই। আচমকা আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করলাম। ভাবলাম জানালাগুলো বন্ধ, তাই বোধহয় হাওয়ার চলাফেরার অভাবে আমার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তারপর হঠাৎ অব্যক্ত বেদনায় আমার গলা থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল।

চকিতে জানলার দিকে নজর পড়তেই খুবই বিস্মিত হয়ে দেখলাম। জানলাটা হাট করে খোলা, তার ভেতর দিয়ে একফালি চাঁদের আলো জমাট অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এই সমস্ত দেখতে পেলাম এক পলকের মধ্যে। তারপর যা দেখলাম তাতে ভয়ে বিস্ময়ে আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সামান্য চাঁদের আলোয় দেখলাম এক বিশাল ঘোরকৃষ্ণবর্ণ দৈত্যাকৃতি একটা ছায়ামূর্তি আমার বুকের উপর চেপে বসে আছে এবং তার লোহার মত দু'হাত দিয়ে আমার গলা সাঁড়াশির মত চেপে ধরেছে।

আমি তখন কোন উপায় না দেখে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম সেই ছায়া দানবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। তখন আমার নড়াচড়ার শক্তি লোপ পেয়েছিল, কারণ ঐ অপার্থিব হাতীর মত ওজনের জীবটা আমার বুকের উপর চেপে বসে আমাকে একেবারে

বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম ঐ মূর্তির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। তখন আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, ঐ দানবীয় বাহুর পেশনে। তখন আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে এক ছটকা টান মেরে আমার হাত দুটো মুক্ত করে ফেললাম। কিন্তু তারপর দু'হাত দিয়ে আমি আততায়ীর হাত ধরতেই সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। বাবাঃ হাত নয়তো লোহার সাঁড়াশী এবং হাত দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা। আমি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও ঐ লৌহ বাহুর নাগপাশ থেকে আমার গলাটা মুক্ত করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারলাম আর আমার বাঁচার কোন উপায় নেই। তখন ক্ষণেকের জন্য আমার দেশের কথা, পিতামাতার কথা মনে পড়ল। তারপর বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল—তাইতো পিস্তল তো আমার বালিশের নীচে আছে! আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়। আমি পলকের মধ্যে বালিশের নীচ থেকে একটানে পিস্তলটা টেনে বের করেই আততায়ীর পায়ের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম।

গুলির আওয়াজে জঙ্গলের রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙ্গে গেল। বাইরে বাঁদরগুলো আর একবার ভয়ে কিচির মিচির করে উঠল এবং সমস্বরে পাখীদের চীৎকারে নিস্তব্ধতা আরও ভয়ানক রূপ নিল। পর মুহূর্তে সেই ছায়ামূর্তি এক অব্যক্ত আর্তনাদ করে আমায় ছেড়ে দিল এবং বিদ্যুৎ চমকের মত এক লাফ দিয়ে জানলায় উঠে আবার নীচে লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই হাতীর মত ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ ধীরে ধীরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

এদিকে তখন ঘরের মধ্যে আর এক বিপদ আমার দ্বিতীয় গুলি বোধ হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মশারীর গায়ে লেগেছিল, ফলে মশারীতে আগুন ধরে গেল।

সেই মূর্তির অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে গেলাম এবং একটান মেরে মশারী খুলে ফেলে আগুন নিভিয়ে

দিলাম। তারপর আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে এক হাতে টর্চ ও আরেক হাতে পিস্তল নিয়ে, দরজা খুলে বাইরে এসে, ধাবমান আততায়ীর পেছন পেছন ছুটে চললাম।

কিছুটা চলার পর হঠাৎ খেয়াল হোলো, ঠিক পথে চলেছি তো ?

তারপর মনে পড়ল, তাই তো আততায়ী গুলির আঘাত পেয়েছিল, মনে পড়ায় টর্চের আলো নীচের দিকে ফেললাম—পরিষ্কার রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। এরপর রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম জলের কাছাকাছি এসে রক্তের চিহ্ন মিলিয়ে গিয়েছে।

সারারাত আর ঘুমলাম না। ভোর হ'ল কিন্তু আমার মনের ভিতর গভীর অন্ধকার। দরজায় কসাঘাত হল, বুঝলাম উইলিয়াম এসেছে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

যে উইলিয়াম সদা হাসত, আজ কিন্তু সে খুবই গম্ভীর। তারপর সে —স্যার —বলেই, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল—

ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল—স্যার, তবে আপনাকেও শেষ পর্যন্ত কালরাতে ও ধরে ছিল। আপনার কি চেহারা হয়েছে। আপনার গলায় কালশিরে পড়ে গেছে। এবং আপনার বয়স একরাত্রে মনে হয় আরও দশ বছর বেড়ে গেছে। আর নয় আপনি আজই কাজ ছেড়ে চলে যান। উইলিয়াম যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তখন একজন নিগ্রো কর্মচারী, হেনরী সাহেবের নিয়মিত প্রেরিত সাপ্তাহিক খাবারের ঝুড়ি বয়ে এনে বাংলোর বারান্দায় নামিয়ে রাখল।

মনে মনে বললাম, এর আর দরকার হবে না। উইলিয়াম যথারীতি ঝুড়ি থেকে খাবার দাবারগুলো নামিয়ে রাখতে শুরু করল। আমিও তখন ঘরে ঢুকবো বলে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় উইলিয়ামের আর্ত চীৎকারে আমি চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম।

উইলিয়াম তখন শুধু ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে শুধু ঝুড়ির দিকে আঙ্গুল নির্দেশে অস্ফুটস্বরে বলল—হে—হে—।

আমি তৎক্ষণাৎ ঝুড়ির দিকে এক পলক তাকাতেই যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখলাম সে দৃশ্য চিন্তা করলে এখনও আমার শরীরের লোম ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে।

—ঝুড়ির ভিতর হেনরী সাহেবের রক্তাক্ত কাটা মুণ্ড। চোখ দুটো যেন ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

... .

এরপর আর একদণ্ডও এখানে থাকা চলে না।

পরের দিনই তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

....

আজ প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল দেশে এসে পৌঁছেছি। বাড়ীতে এসেই কিন্তু আমার জীবনে এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিয়ে খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম, এই রহস্যের যদি কিছু কূল কিনারা হয়। এ বিজ্ঞাপনে আমার আক্রমণকারীর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল এবং আমি যে মার্কা পিস্তল ও কার্তুজ ব্যবহার করেছিলাম তারও বিবরণ জানালাম।

অবশেষে এর জবাবে আমি বিদেশ থেকে দুখানা চিঠি পেলাম।

প্রথমটি নাইরোবীর এক শিকারীর কাছ থেকে—

তিনি লিখেছেন যে আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে অনেক ভয়ঙ্কর ক্ষমতাবান ওঝা রয়েছে, তারা তাদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা মৃত আত্মার সাহায্যে লোকের অনেক কিছু ক্ষতি করতে পারে, এমনকি প্রাণহানি পর্যন্ত। যেহেতু শ্বেতকায় ব্যক্তিরা ফিজি দ্বীপে নিগ্রোদের জমিজমা জবর দখল করছে, সেই জন্য ওখানকার কোন দুর্দান্ত শক্তিমান ওঝা প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে, শ্বেতকায় ব্যক্তিদের তাড়াবার জন্য তার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ঐ স্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এসেছিল হনুলুলু থেকে ডাঃ বেকেট লিখেছেন।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার জীবনের অলৌকিক ঘটনাটা খবরের কাগজে আজই দেখতে পেলাম। আপনি লিখেছেন ১৩ জুন প্রায় রাত ৪টায় এক বিশালকায় দৈত্যাকৃতি ছায়ামূর্তি আপনাকে আক্রমণ করেছিল, ঠিক সেই দিনই ভোর পাঁচটায় নিগ্রোপল্লী থেকে একটা অসুস্থ রুগীর চিকিৎসার জন্য আমার ডাক পড়ে। আমি রুগীর কাছে গিয়ে দেখি আপনার বর্ণিত চেহারার মত হুবহু এক বিশালকায় নিগ্রো মাটিতে শুয়ে পড়ে বেদনায় কাতরাচ্ছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে আঙ্গুল দিয়া পা দেখিয়ে দিল। আমি দেখলাম তার বাঁ পায়ের হাটুর নীচে একটা ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত পড়ছে। আমি ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম, লোকটার পায়ে গুলি লেগেছে। আমি বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী হ'ল না।

তখন আর কোন উপায় না দেখে আমি ঐ স্থানে অস্ত্রোপচার করে একটি কার্তুজ বের করলাম—যার সঙ্গে আপনার বর্ণিত পিস্তলের কার্তুজের সম্পূর্ণ মিল আছে।..........

চিঠি পড়ে আমি অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ফিজি দ্বীপের থেকে হনুলুলুর দূরত্ব প্রায় পাঁচশত মাইল হবে। যদি ডাক্তারের বর্ণিত সেই লোক আমার আততায়ী হয়ে থাকে, তবে কোন অলৌকিক ক্ষমতার বলে সেই ব্যক্তি এত দূরত্ব এক ঘণ্টার মধ্যে পাড়ি দিল, আজ অবধি আমি এই রহস্যের কোন সমাধান খুঁজে পাইনি।

———

Tresses that fair
Head can boast
A beautiful tress inspired the poets through the ages So, Jaborandi is a must for your hair care It is being used all over the world from time immemorial for the treatment of hair Millions benefited
JABORANDI
HAIR OIL
It
Jaborandi
HAIR OIL
Dr. S. D. Debnath
Homoeo Laboratory
Howrah Subway, Howrah-711101
Please enquire at all the Chemists (Allopathic Homoeopathic) and Stationery shops.

সনাতন-হিন্দুধর্ম

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

হিন্দু-ধর্মের অন্য নাম সনাতন-ধর্ম। হিন্দু-ধর্মের এই নামান্তর কেন, এই নামান্তর কতখানি সার্থক তা অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধ।

'সনাতন' শব্দের অর্থ 'সদাতন, নিত্য বা চিরস্থায়ী'। সুতরাং 'সনাতন' শব্দের দ্বারা সেই ধর্মকেই সূচিত করা সঙ্গত যে ধর্ম কালচক্রের আবর্তন সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থেকেছে এবং অপরিবর্তিত থাকবে।

এবারে, তাই, দেখা প্রয়োজন, কাল-প্রবাহ অতি প্রাচীন হিন্দু-ধর্মে কোন পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা।

বর্তমানে হিন্দু-ধর্ম নানা শাখায় বিভক্ত—(১) শৈব, (২) শাক্ত, (৩) বৈষ্ণব, (৪) গাণপত্য, (৫) সৌর, (৬) ব্রাহ্ম, (৭) বৌদ্ধ, (৮) জৈন প্রভৃতি। এখানে বৌদ্ধ ও জৈন সম্পর্কে আপত্তি উঠতে পারে। অনেকে বলতে পারেন—বৌদ্ধ ও জৈন আলাদা ধর্ম—হিন্দু-ধর্মের শাখা নয়। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন দুটি ধর্মই বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং উভয়কেই স্বামী বিবেকান্দ হিন্দু-ধর্মের শাখা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবকে তো জয়দেব রচিত দশাবতার স্তোত্রে ভগবান বিষ্ণুর একটি অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

"কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে"।[১]

১। শঙ্করাচার্য রচিত দশাবতার-স্তোত্র, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও বুদ্ধদেবকে ভগবান বিষ্ণুর একটি অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন, অতীতে বিভিন্ন যুগে হিন্দু-ধর্ম এই রকম বহুশাখায় বিভক্ত ছিল কি না।

আলোচনার সুবিধার জন্য হিন্দু-ধর্মের অতীতকে চারটি যুগে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) প্রাক্-বৈদিক যুগ, (২) বৈদিক যুগ, (৩) পৌরাণিক যুগ এবং (৪) বর্তমান যুগ।

প্রাক্-বৈদিক-যুগে হিন্দুধর্মের অন্তত দুটি শাখার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। বৈদিক-যুগেও দুটি ধারায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা বর্তমান ছিল, তবে সেগুলো বর্তমান-যুগের মতো ছিল না। বৈদিক-যুগের সেই বিভিন্ন শাখার মধ্যে কয়েকটি শাখার বেদ আমরা রক্ষা করতে পেরেছি মাত্র। অন্যান্য শাখার বেদ মহাকালের অতল তলে তলিয়ে হারিয়ে গেছে। পৌরাণিক-যুগে বর্তমান হিন্দু-ধর্মের শাখাগুলোর প্রায় সবগুলোই বর্তমানে বর্তমান আছে, কিছু নতুন শাখা সেগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে বর্তমান-যুগের শাখা-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

হিন্দু-ধর্মের শাখাগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন যুগের হিন্দু-সাধন-প্রণালীর ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাই বলতে হয়, যুগবিবর্তনে হিন্দু-ধর্মের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়,—যুগবিবর্তনে সাধিত এই পরিবর্তন আপাত না প্রকৃত। যদি দেখা যায়,—এই পরির্তন প্রকৃত নয়—আপাত; এই পরিবর্তন অন্তরঙ্গের নয়—বহিরঙ্গের মাত্র, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে, হিন্দু-ধর্মের 'সনাতন-ধর্ম' নামান্তর অসার্থক নয়—হিন্দু-ধর্ম সত্যিই সনাতন-ধর্ম।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন, এই হরপ্পা ও ও মহেঞ্জোদারের সভ্যতা ছিল অতি উন্নত এবং বৈদিক-সভ্যতার থেকেও প্রাচীন। সিন্ধুনদের উপত্যকায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল; তাই এই সভ্যতার নাম 'সিন্দুসভ্যতা' এবং এই সভ্যতা যে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত

ছিল তার নাম 'সিন্ধুধর্ম'। উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে 'সিন্ধু' শব্দ থেকে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হয়। তাই 'হিন্দু-সভ্যতা' আসলে 'সিন্ধু-সভ্যতা'র এবং 'হিন্দু-ধর্ম' আসলে 'সিন্ধু-ধর্মে'র রূপান্তর মাত্র।

কাজেই হিন্দু-সভ্যতার আদি নিদর্শন হচ্ছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় আবিষ্কৃত নিদর্শন। আমি এই সভ্যতাকে প্রাক-বৈদিক-হিন্দু-সভ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করছি।

বলা হয়েছে,—আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন। অবশ্য অনেকে এই মতকে স্বীকার করেন নি; তাঁরা বলেছেন, আর্যরা ভারতেরই অন্য অংশের অধিবাসী ছিলেন। তবে সকলেই একমত যে, প্রাগার্য-হিন্দুদের সঙ্গে আর্যদের সংঘাত হয়েছিল এবং আর্যদের দ্বারা প্রাগার্য-হিন্দু-সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল। ঋগ্বেদাদির মধ্যেও সেরকম আভাসই পাওয়া যায়।

আর্যরা প্রাগার্য-হিন্দুদের পরাজিত করেন, প্রাগার্য-হিন্দুদের ভূখণ্ড অধিকার করেন ঠিকই, কিন্তু কালক্রমে আর্য-সভ্যতা অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাগার্য-হিন্দু-সভ্যতার মধ্যে হারিয়ে যায়—আর্যরা প্রাগার্য-হিন্দু-ধর্মের মূলনীতিগুলোকে তাঁদের ধর্মের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করে সকলেই হিন্দু হয়ে যান। কারণ,—যোগধর্ম প্রাক-বৈদিক-হিন্দুধর্মের একটি প্রধান ধর্ম; দেখা যায়, এই যোগধর্ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বৈদিক-যুগের শেষভাগে রচিত বৈদিক-সাহিত্যে এবং পৌরাণিক-যুগের পৌরাণিক-সাহিত্যে।

প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দুধর্মের নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে মাতৃ-মূর্তি বা দেবীমূর্তি এবং যোগীমূর্তি বা শিবমূর্তি। মাতৃমূর্তি বা দেবী-মূর্তিকে শক্তিমূর্তি বলা চলে। তাই প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দুধর্মে অন্তত দুটি শাখার অস্তিত্বের অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নয়। এই দুটি শাখাকে শৈব ও শাক্ত নামে অভিহিত করা চলে। পৌরাণিক-যুগের শৈব ও শাক্ত শাখার মূল প্রাক-বৈদিক-যুগে নিহিত বলেই মনে হয়।

প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দু-ধর্মের প্রধান ধর্ম ছিল শৈব-যোগধর্ম। যোগ-ধর্মকে ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। আবার আবিষ্কৃত প্রাক-বৈদিক সিন্ধু বা হিন্দু সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে দেখা যায়,—উন্নত নগর-পরিকল্পনা, উন্নত ধরণের স্নানাগার ইত্যাদি। সুতরাং প্রাগার্য-হিন্দু-যুগে ভোগ যে অচ্ছুৎ ছিল তা মনে হয় না। তাই সবকিছু মিলিয়ে সিদ্ধান্ত করতে হয়,—প্রাক-বৈদিক-যুগের হিন্দু-ধর্মে ভোগও ছিল, ত্যাগও ছিল। মনে হয়, শাক্ত-ধর্মকে অবলম্বন করে ভোগের এবং শৈব-ধর্মকে অবলম্বন করে ত্যাগের সাধনা করা হ'ত। এই যুগের মানব-সাধারণ সাধারণত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকতেন; তবে চরম সাধনার ক্ষেত্রে ত্যাগকে অবলম্বন করে যোগ-সাধনার মধ্য দিয়ে সাধক মানব সাধনার চরমস্তরে উন্নীত হতেন। [ক্রমশঃ]

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীজে. সি. দেবনাথ
কোয়ার্টার নং ৪৬০
সেক্টর VI B
পোঃ বেলকোনগর
জিঃ বিলাসপুর
মধ্যপ্রদেশ

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দেবনাথ
৫এ সৎচাষী পাড়া রোড
কলিকাতা-৭০০০০২

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
প্রযত্নে দেবনাথ হার্ডওয়ার্স
পোঃ বাগুইআটী
কলিকাতা-৭০০০৫৪

শ্রীকালিপদ নাথ
নাথপাড়া
গ্রাঃ জগন্নাথ নগর
পোঃ জগন্নাথ নগর
ভায়া বাটানগর
জিঃ চব্বিশ পরগণা

শ্রীমতী নিরমা সুন্দরী কুণ্ড
৮৫ সি, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৫৪

বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন এর

উদ্যোগে

মহামানব অতীশ দীপঙ্কর এর

জন্ম-সহস্র-বর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে

আবেদন

দশম শতাব্দীর বঙ্গজননীর বরেণ্য সন্তান মহামানব অতীশ দীপঙ্কর যাঁর জ্ঞান-প্রতিভা তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার তুষারাবৃত উপত্যকা থেকে মহাচীনের মরুকান্তার অবধি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল—প্রাচীন ভারতের সেই মহান ঋষি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম-সহস্র-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবাংলার জনগণের পক্ষ হতে বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন আগামী ২৯ – ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮৩ তিনদিন ব্যাপী এক আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এই উপলক্ষে রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, ভারত ও অন্যান্য দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ভারততত্ত্ববিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই তিন দিনের কর্মসূচীতে মহামানব অতীশের পবিত্র জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনা ও বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের রচনাসমৃদ্ধ এক স্মরণিকা প্রকাশ এবং কলকাতা মহানগরীর রাজপথে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম-সহস্র-বর্ষ-পূর্তি উৎসবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পুণ্য সুযোগলাভ করা বাঙালী তথা ভারতীয় মাত্রেরই পরম সৌভাগ্যের

বিষয় সন্দেহ নেই। এই মহাপুণ্যানুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্য-মণ্ডিত করতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাদানই আমাদের একমাত্র সম্বল।

বিনীত—
উৎসব কমিটির পক্ষে—

ধর্মপাল মহাথের
এস. কে. খুরানা
প্রঃ চিমপা লামা
ডঃ অলকা চট্টোপাধ্যায়
রেভাঃ সিক্ ওউ চেইন
শীলানন্দ ব্রহ্মচারী
ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী

বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশন
(বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা)
১ নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০১২
ফোন—২৬-৭১৩৮
১০ই ডিসেম্বর ১৯৮২

উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২৯শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় রবীন্দ্রসদনে এবং বিকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা থেকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম।

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

পাত্রী—(২১) উচ্চতা ৫'-১" মাঝারী গড়ন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রী ১০ম মান, সূচী ও গৃহকর্মে নিপুণা একমাত্র কন্যার চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পি. সি. নাথ, ১৮১/১ কাশীনাথ দত্ত রোড, পোঃ বরানগর, কলিকাতা-৩৬।

পাত্রী—(২৩), (৫'-২") S. F অনুত্তীর্ণা। গায়ের রং ফরসা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, শান্ত স্বভাবা। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ, ষষ্ঠীতলা, রাণাঘাট, নদীয়া।

পাত্রী—(১৭) (৫'-৩") হায়ার সেকেণ্ডারীতে পাঠরতা, ফর্সা, সুন্দরী, সুগঠনা, স্বাস্থ্যবতী, সঙ্গীতজ্ঞা, নম্রস্বভাবা। সূচীশিল্প ও গৃহকর্মে নিপুণা। শিক্ষিত উপার্জনশীল সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পত্রে যোগাযোগ করুন। শ্রীকালীপদ নাথ, সি/৪ বাপুজীনগর, পোঃ রীজেন্ট স্টেট, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

পাত্রী—(২৮ বৎসর ৫') P. U গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী সুগঠনা, নম্রস্বভাবা, গৃহকর্মে নিপুণা। শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। নিজ বাটী থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রীঅরবিন্দ দেবনাথ, গ্রাম—রামচন্দ্রপুর, পোঃ শাখরাইল, জেলা হাওড়া।

পাত্রী—(১৮) (৫'-১"), ১২ ক্লাসে পাঠরতা, প্রকৃত সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্র চাই। পত্রে যোগাযোগ করুন—শিবরাম নাথ, পোঃ ত্রিবেণী, জেলা—হুগলী। (সাইকেল পার্টসের দোকান)।

পাত্র—স্কুল ফাইন্যাল, টেলার, মাসিক আয় ১০০০ টাকা। প্রকৃত সুন্দরী, নম্রস্বভাবা, গৃহকর্ম নিপুণা পাত্রী চাই। অবনী দেবনাথ, ইউনিক টেলার্স, শরৎ কর্ণার, চাকদহ, নদীয়া।

পাত্রী—(১৯), (৫'-১"), দশম মান। ফর্সা, সুশ্রী, বনেদী বংশ, শিবগোত্র। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীদুলালচন্দ্র নাথ, গ্রাম-রাজীপুর, পোঃ হাসনাবাদ, জিলা-২৪ পরগণা।

পাত্রী—(২০) মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়াছে। সুশ্রী ও কর্মা, উচ্চ বংশসম্ভূতা, গৃহকর্ম নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। Lalitmohan Bhaumik, I/L/14, Kusthia Housing Estate, Calcutta-700039.

পাত্রী—৩৩ বৎসর, উচ্চতা ৫ ফুট, S. F. পাশ, গৌরবর্ণা, স্লিম ফিগার, ধীর স্বভাব, গৃহকর্মে নিপুণা, সূচী ও অঙ্কন শিল্পে পারদর্শিনী। উপযুক্ত পাত্র চাই। Kiranbala Debnath, Vishnupath, Shivnagar, Ulliyan, Kadma, Jamshedpur-831005.

স্বামী, স্ত্রী, ছোট সংসারের জন্য মধ্য বয়স্কা শিক্ষিতা রাধুনি চাই। থাকা ও খাওয়া পরা সহ। যোগাযোগ করুন—শ্রীরমেন্দ্রনাথ নাথ, ২২/১/বি ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ রোড, কলিকাতা ২৫।

মহাশয়,

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র 'শৈবভারতী'র জন্য দেওয়া আপনার গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ............................তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনি অনতিবিলম্বে **আট টাকা** নিম্ন ঠিকানায় অথবা আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় আপনাকে 'শৈবভারতী' পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শ্রীসুবল চন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ
৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৭

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী **ষ্ট্রীট**, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩০।

বিঃ দ্রঃ : যারা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তারা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায় শৈবভারতী
২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৮৯
সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শিবভক্ত্যুৎকর্ষনিরূপণম্

সূত উবাচ

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি শুদ্ধং কৈবল্যমুক্তিদম্।
অনুগ্রহান্মহেশস্য ভবদুঃখস্য ভেষজম্॥ ১
ন কর্ম্মণামনুষ্ঠানৈর্নদানৈস্তপসাপি বা।
কৈবল্যং লভতে মর্ত্ত্যঃ কিন্তু জ্ঞানেন কেবলম্॥ ২
রামায় দণ্ডকারণ্যে পার্ব্বতীপতিনা পুরা।
যা প্রোক্তা শিবগীতাখ্যা গুহ্যাৎ গুহ্যতমা হি সা॥ ৩
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ নৃণাং মুক্তির্ভবেৎ ধ্রুবম্।
পুরা সনৎকুমারায় স্কন্দেনাভিহিতা হি সা॥ ৪
সনৎকুমারঃ প্রোবাচ ব্যাসায় মুনিসত্তমাঃ।
মহ্যং কৃপাতিরেকেণ প্রদদৌ বাদরায়ণঃ॥ ৫

অনুবাদ ঃ—

প্রথম অধ্যায়

শিবভক্তির উৎকর্ষ নিরূপণ

সূত বললেন,—(হে তাপসগণ !) দেবাদিদেব মহেশের অনুগ্রহে যা ভবদুঃখ-নাশের একমাত্র ঔষধ-স্বরূপে পরিণত হয়েছে, সেই কৈবল্য-দায়িনী (মুক্তিদায়িনী) বিশুদ্ধ শীবগীতা আমি কীর্তন করছি। ১॥

কর্মানুষ্ঠান, দান, তপস্যা কোন কিছুতেই মুক্তিলাভ করা যায় না ; কিন্তু একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মানবগণ সেই মুক্তি লাভ করে থাকে। ২॥ পুরাকালে (ত্রেতাযুগে) রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে গমন করলে দেবাদিদেব পার্বতীপতি তাঁর কাছে এই গুহ্যাতিগুহ্য শীবগীতা কীর্তন করেন। ৩॥ এই শীবগীতা শ্রবণমাত্রেই নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ হয়। পুরাকালে মহামতি স্কন্দ (কার্তিক) সনৎকুমারের কাছে, সনৎকুমার মহামুনি ব্যাসদেবের কাছে এই শীবগীতা কীর্তন করেন। আমার প্রতি অতিরিক্ত কৃপাবশত ভগবান বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) এই শীবগীতা আমাকে প্রদান করেন। ৪—৫॥

অনুবাদক—সু. নাথ

আগামী ২রা, ৯ই ও ১০ই চৈত্র যথাক্রমে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ইং ১৭ই, ২৪শে ও ২৫শে মার্চ ১৯৮৩ (২৩/১এ, ফিয়ার্স লেনস্থ কালী মন্দিরে) উপনয়নের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে, যাঁহারা স্বল্প খরচে তাঁহাদের পুত্রের উপনয়ন দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মন্দিরে পত্র লিখিয়া অথবা সাক্ষাৎ করিয়া যোগাযোগ করুন। ইতি—

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য
মন্দিরের সেবায়েৎ ও স্বত্বাধিকারী

যাঁহারা পূজা ও পৌরহিত্য কর্ম শিক্ষা করিতে চান তাঁহারা মন্দিরে আসিয়া শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-কুল 'শৈব ও শাক্ত' ধর্মের আদি-গুরু-কুল। এই ব্রাহ্মণ-কুলের আদি-পুরুষগণই শৈব-যোগ ও শাক্ত-তন্ত্র প্রথম প্রচার করেন।

কিন্তু বাংলাদেশে বল্লালী-অত্যাচারের শিকার হয়ে এই রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-কুলের সন্তানগণ আত্মগোপন করতে বাধ্য হ'ন। দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার ফলে তাঁদের অনেকেই আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছেন, অনেকেই আজ স্বধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন—গ্রহণ করেছেন বৈষ্ণবধর্ম।

বৈষ্ণবধর্মও খারাপ নয়। বেদের জ্ঞানকাণ্ড অনুযায়ী অক্ষর-পুরুষ শিব 'আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্তীপুরুষ' বিষ্ণুরও আরাধ্য। মহাভারতেও ভগবান বিষ্ণুর শিবোপাসনার কথা বলা হয়েছে। রামায়ণে দেখা যায়, বিষ্ণুর ত্রেতাযুগের অবতার রামচন্দ্র ছিলেন ভগবান শিবের উপাসক। বিষ্ণুর দ্বাপরযুগের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিব-পূজার উল্লেখ মহাভারতে আছে। সুতরাং ভগবান বিষ্ণু, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ সকলেই শিবের উপাসক মহা-শৈব। তাই বিষ্ণু, রাম বা কৃষ্ণের ভক্ত বৈষ্ণবগণও প্রকারান্তরে শিবেরই ভক্ত শৈব। আবার এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম যখন চিন্মাত্র তখন শিব নামে, যখন সৃষ্টিকর্তা তখন ব্রহ্মা নামে, যখন পালনকর্তা তখন বিষ্ণু নামে এবং যখন প্রলয়কর্তা তখন রুদ্র নামে অভিহিত। সেদিক থেকেও বিষ্ণু-ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রকারান্তরে শিব-ভক্ত শৈব।

সকল দেবতাই মূলত এক এবং অভিন্ন—অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র কিন্তু এই মহাসত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈষ্ণবাচার্যগণ,

বোধ হয়, বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাই দেবাদিদেব মহাদেব শিবকে ভগবান বিষ্ণু, রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার প্রয়াস অনেক আধুনিক-বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখা যায়। আর সেই সমস্ত আধুনিক-বৈষ্ণব-গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বর্তমানে বৈষ্ণব এমন কোন রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ যখন ভগবান রুদ্র বা শিবকে বিষ্ণু, রাম বা কৃষ্ণ অপেক্ষা হীন ভাবতে থাকেন তখনই দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

'শৈব ও শাক্ত' ধর্ম রুদ্রজ-ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম। তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবতা শিব ও শক্তি। তবে সকল দেবতা মূলত এক। তাই তাঁরা শিব ও শক্তির আবশ্যিক-উপাসনা যেমন করবেন, তেমনি অন্যান্য দেবতার উপাসনাও করবেন। সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই কাম্য।

রাজকীয় ও স্বাধীনতোত্তর ত্রিপুরা রাজ্যে শৈব নাথ-তন্ত্রের উপাদান

ডক্টর এন. সি. নাথ

অধ্যক্ষ রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আসামের দেওরি জাতি

আসামের ইতিহাস হইতে জানা যায়, ব্রহ্মপুত্র নদের অন্তর্গত মাজুলীচর বা দ্বীপে "দেওরি বা দেওড়াই" নামে এক পার্বত্য পুরোহিত জাতি বাস করিত।[১] ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গে দেওরাণী বা দেওড়াণী শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে।[২] ইহারা আসামের প্রাচীন অধিবাসী "বড়ো" বা "কাছাড়ী" জাতির শাখা বিশেষ। ত্রিপুরার পার্বত্য জাতিরাও এই জাতির অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। ডাল্টন মহোদয় লিখিয়াছেন—

'The people of Tiparah are, as he says, of the same origin as the Kacharis, and the similarity of their religion, customs and appearance makes this probable. Their tradition is that they conquered Kamrup more than 1000 years ago, and they were turned out of it by the Koch princes who were in possession till dispossessed by the Muhammadans on one side and the Ahoms on the other.'[৩]

১। দ্রষ্টব্য গ্রন্থ: Rev. Sidney Endle কৃত—The Kacharis (London, 1911), পৃ. ৩১, ৮৪, ৯১, Edward Tuite Dalton কৃত The Descriptive Ethnology of Bengal পৃ. ৩৮, ৭৮, ৮৫, ১৪১। Dalton মহোদয় বলিয়াছেন এই জাতির নামান্তর দেওশি, দেওড়া এবং দেওড়ার (পৃ. ২৫, ৮৫, ৮৬, ৯২)। দেওরি-রা চুটিয়া উপজাতির অন্তর্গত। ইহারাই কামাখ্যারও পুরোহিত বলিয়া মনে হয়।

২। Endle কৃত ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪০—৪১।

৩। Dalton কৃত ঐ গ্রন্থ। পৃ. ৮৪; Major Fisher কৃত—Memoir of Sylhet, Cachar etc.

অনুবাদ—তিনি (= মেজর ফিশার) বলেন। ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী এবং কাছাড়ী জাতি মূলতঃ এক। এই উভয় জাতির ধর্ম, রীতিনীতি এবং চেহারা বা শারীরিক গঠন একই প্রকার। ইহা হইতেও এই উভয় জাতির মৌলিক একতা সম্ভব মনে হয়। ত্রিপুরীদের মধ্যে জনশ্রুতি এই যে তাহারা ৩০০০ বর্ষেরও পূর্বে কামরূপ জয় করিয়াছিল; পরে কোচ রাজগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পরে একদিকে মুসলমান এবং অন্যদিকে অহোম জাতি কর্তৃক কোচবংশ উৎখাত হন।

সুতরাং এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে দেওরি বা দেওরাই (দেওড়াই) পুরোহিতগণকে ত্রিপুরাতে আনয়ন করা হইয়াছিল এবং ইহারাই রাজমালার দেওড়াই। ইহারা ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপে বাস করিতেন একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যত্রও ইহাদের বসতি ছিল। এসম্পর্কে এণ্ডল মহোদয় লিখিয়াছেন—

'Their chief habitant is on and near Dikrong river some 30 miles north of Lakhimpur, while other villages may be found in the Majuli (the holy land). Raja Gaurinath being unable to protect the Deoris from the Mishmis and other tribes, removed them to the Majuli.'[১]

অনুবাদ—দেওরি সম্প্রদায়ের প্রধান বসতি ডিক্রং নদীর তটভূমি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা। এই এলাকা লখীমপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। মাজুলি (= পুণ্যভূমি) অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের অন্তর্গত মাজুলিচর বা দ্বীপেও দেওরিদের বহু গ্রাম আছে। রাজা গৌরীনাথ দেওরিগণকে মিশমি ও অন্যান্য উপজাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ইহাদিগকে মাজুলী-তে স্থানান্তরিত করেন। দেওরিদের রাজা গৌরীনাথ নাথান্ত ইহাও লক্ষণীয়।

১। Endle কৃত ঐ গ্রন্থ—পৃ. ৯১, ৯৪।

কামাখ্যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ ও দেওরি পূজারী

মৎস্যেন্দ্রনাথ কামাখ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা[১] এবং সেখানে দেওরি পুরোহিত; আবার ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা পূজাতেও দেওরিদের আনয়ন। এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা। কামাখ্যা-পীঠের দেওরিরা আসামের মাজুলী ও তৎসংলগ্ন এলাকার এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শক্তিপীঠের পূজারীরা নাথ পুরোহিত হইবারই সম্ভাবনা। ত্রিপুরার দেওড়াই (দেওরি)-রাও একই নাথ পুরোহিত হইবার কথা।

তবে চণ্ডাই ও দেওরি (বা দেওড়াই)-দের এই পরিচয় (নাথ) সমাজে বিলুপ্ত। কালীপ্রসন্ন সেন চণ্ডাইগণকে "ঋষিকল্প যোগী পুরুষ" এবং "সংসার ত্যাগী তপস্বী" বলিয়াছেন ; আর দেওড়াইগণকে "সংসার ত্যাগী দণ্ডী" আখ্যা দিয়াছেন। আর উভয়েরই জাতি নির্ণয় দুঃসাধ্য স্বীকার করিয়াছেন।[২] আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন—চণ্ডাই ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ছিলেন মনে হয়। চণ্ডাই ও দেওড়াইগণের যে পরিচয় আমরা উপরে দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। তাহার মধ্যেই সত্য নিহিত আছে (চণ্ডাই দেওড়াই মৎস্যেন্দ্রনাথের আদি ও মধ্যলীলার সৃষ্টি)।

সেন মহোদয় ইহাদিগকে "যোগীপুরুষ" বলিয়াও জাতিনির্ণয় অসম্ভব বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। তবে তাঁহার আর একটি কথা

১। "ভৈরবী হইতে মহাজ্ঞান অবতীর্ণ হইয়া... ..মৎস্যেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। এই মৎস্যেন্দ্র মীন সিদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ : ইনি কামরূপ পীঠের অধীশ্বর ছিলেন এবং তুষ্যনাথ নামে তান্ত্রিক মণ্ডলে পরিচিত ছিলেন।" (মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ কৃত তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্ দর্শন পৃ. ৩৬)। শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—'There is another tradition which makes Matsyendra-nath the founder of Kamrupa Mahapitha.' (আর একটি জনশ্রুতি এই যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ কামরূপ মহাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা) (তৎকৃত Obscure Religious Cults, P. 386 দ্রষ্টব্য)।

২। তৎসম্পাদিত রাজমালা, পৃ. ১৩৬। শুধু বর্তমানে নয়, সেকালেও ইহাদের জাতি নির্ণয় দুঃসাধ্য ছিল (পৃ. ১৩৫)।

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—'জনপ্রবাদে জানা যায়, বঙ্গোপসাগরের অঙ্কস্থিত আদিনাথ তীর্থ হইতে ইহাদিগকে আনা হইয়াছে। একথা প্রকৃত কিনা। বর্তমান পূজকগণ তাহা বলিতে চায় না।'[১]

পূজারী (চণ্ডাই, দেওড়াই)-গণ আপনাদের পূর্বনিবাস ও পূর্বপরিচয় জ্ঞাপন করিতে চান না কেন? ইহাতেও আমাদের অনুমান দৃঢ়ীকৃত হয়। তাঁহারা নাথদের গৌরবের যুগে পূজারীরূপে এখানে আসিয়াছিলেন। বল্লাল সেনের আদেশে পৌরোহিত্যাদি হস্তচ্যুত হইবার পর নাথদের ব্রাহ্মণ পরিচিতি সমাজে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ায় রাজপুরোহিত চণ্ডাই-দেওড়াইগণের পক্ষে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় (নাথ) সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন অনেকটা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে নাথতত্ত্ব গবেষকগণের নূতন গবেষণা আবশ্যক।

সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে জনৈক চণ্ডাইর যে আলোকচিত্র প্রদান করিয়াছেন।[২] উহা ব্রিগ্‌স্‌ সাহেবের গ্রন্থের[৩] শেষে সংযোজিত বিভিন্ন নাথ মঠের মোহান্তগণের চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। চণ্ডাইকে নাথ যোগীর* মতই মনে হয়। মস্তকে শিরোপা, গলদেশে নাতিদীর্ঘ সূত্র, অনাড়ম্বর বসন, সরল মুখচ্ছবি। [ক্রমশঃ]

১। রাজমালা পৃ. ১৩৮।

২। ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৩৬ সংলগ্ন। চিত্রের নিম্নে "শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চণ্ডাই" এই নাম লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ রচনাকালে রাজচন্দ্র চণ্ডাই জীবিত ছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশের কাল ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ = ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ = ১৯২৬-২৭ইং। বর্তমান চণ্ডাইর বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

৩। George Weston Briggs কৃত—Gorakhnath and the Kanphata Yogis.

* নাথদের নাদবংশের সন্ন্যাসীযোগীর —সম্পাদক

সনাতন-হিন্দুধর্ম

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

প্রাক-বৈদিক-হিন্দু-যুগের পরবর্তী যুগ হচ্ছে বৈদিক-হিন্দু-যুগ। বৈদিক-যুগের হিন্দু-ধর্মের স্পষ্ট দুটি ধারা—(১) ঋষিধারা এবং (২) মুনিধারা। ঋষিধারায় দেখা যায়, যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম-সাধনের প্রয়াস; আর মুনিধারায় প্রধানত যোগানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ধর্ম-সাধনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যজ্ঞ-সর্বস্ব ঋষিধারায় কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; আর যোগ-প্রধান মুনিধারায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে জ্ঞানকে। ঋষিধারার ফসল বেদের কর্মকাণ্ড: আর মুনিধারার ফসল বেদের জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে বেদের সংহিতা এবং আরণ্যক ও উপনিষদ বাদে ব্রাহ্মণের বাকী অংশ; আর ব্রাহ্মণের আরণ্যক ও উপনিষদ অংশ পড়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে।

ঋষিধারায় কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পদ সঞ্চয় করে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ত। যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন তাঁকে বলা হ'ত যজমান। এই যজমানের আরো সুখ-সমৃদ্ধি ও সম্পদের কামনা করে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হ'ত। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে যজমান ভিন্ন চার ধরণের মানুষ অংশগ্রহণ করতেন—(১) হোতা, (২) উদ্গাতা, (৩) অধ্বর্যু এবং (৪) আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ। হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যুকে নিয়ে গঠিত ছিল ঋত্বিকবর্গ। ঋত্বিকবর্গ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। হোতা দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত পাঠ করতেন, উদ্গাতা দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত গান করতেন এবং অধ্বর্যু দেবতার উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গসহ যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের

আহার্যের এবং সকলকে দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা থাকতো। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার যজ্ঞানুষ্ঠানকর্তা যজমানকে বহন করতে হ'ত।

কাজেই ঋষিধারায় কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ ও ঐ সম্পদের ভোগ-সুখ এবং আরো সম্পদ ও ভোগ-সুখের কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করা হ'ত বলে এখানে প্রবৃত্তি বেশ প্রশ্রয় পেত। তাই, এই ধারার ধর্মকে বলা হয়েছে প্রবৃত্তিধর্ম।

মুনিধারায় কর্মানুষ্ঠান স্থান পেলেও কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করার থেকে জ্ঞান-সাধনার জন্য যোগানুষ্ঠান অধিক প্রাধান্য পেত।

মুনিধারার মুনিগণও গৃহী ছিলেন—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তাঁরাও সংসার করতেন। তাই-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে প্রতিপালন করার জন্য মুনিগণকেও কিছু কর্ম করতে হ'ত। তবে কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞান-সাধনার ওপর গুরুত্ব বেশী দেবার জন্য তাঁরা অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। সম্পদ-লালসা ও ভোগ-সুখকে এই মুনিধারায় জ্ঞান-সাধনার একান্ত অন্তরায় বলে মনে করা হ'ত। তাই কঠোর সংযম অভ্যাসের দ্বারা এই ধারায় যোগ-মূলক জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হ'ত। এই ধারায় যোগ-মূলক-জ্ঞান-সাধনার পাশাপাশি অনাড়ম্বর যজ্ঞানুষ্ঠানও করা হ'ত। অনেক ক্ষেত্রে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানও ছিল আবার একান্তভাবে যোগমূলক।

মুনিধারায় সাধনার চরমস্তরে নির্জনস্থানে প্রশান্তচিত্তে যোগাসনে বসে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে আত্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা হ'ত। আত্মজ্ঞান লাভের সাথে সাথে বিশ্ব-রহস্য-জ্ঞানও ধরা দিত সাধকের কাছে।

মুনিধারায় জাগতিক-ভোগ-সুখের কামনার নিবৃত্তি-সাধনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-সাধনার পথ প্রশস্ত করা হ'ত। তাই এই ধারার ধর্মকে বলা হয়েছে নিবৃত্তিধর্ম।

তাহলে দেখা গেল,—ঋষিধারার ধর্ম যজ্ঞ-ধর্ম এবং মুনিধারার ধর্ম যোগ-ধর্ম। যজ্ঞ-ধর্ম প্রধানত প্রবৃত্তিমূলক এবং যোগ-ধর্ম প্রধানত নিবৃত্তিমূলক।

ঋষিধারার যজ্ঞ-ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক হলেও, কিছুটা ত্যাগের পরিচয় এই ধর্মেও পাওয়া যায়। সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করা হ'ত ঠিকই; কিন্তু সাথে সাথে এই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচুর সম্পদ ও ভোগ্যবস্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হ'ত। যজ্ঞ-কর্তা সকলকে ভোগ সুখের অংশীদার করে নিজে ভোগ করতেন। এখানেই রয়েছে ভোগের ক্ষেত্রে ত্যাগ—সকলের জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগ। আর মুনিধারার যোগধর্ম তো প্রধানত ত্যাগের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

কাজেই বলতে হয়,—বৈদিক-যুগের হিন্দু-ধর্মও ত্যাগের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুনিধারায় ত্যাগই ছিল যোগমূলক-জ্ঞান সাধনার ভিত্তি; তবে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালনের জন্য সংযত-ভোগ সেখানে অনাদৃত ছিল না। আর ঋষিধারায় ভোগকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও, সেই ভোগ একেবারে ত্যাগ-বর্জিত ছিল না। তাই তো দেখা যায়, বৈদিক-যুগের হিন্দুধর্মের মর্মবাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা" অর্থাৎ ত্যাগের সাথে ভোগ কর।

বৈদিক-যুগের ধর্ম-সাধনার এই মর্মবাণীকে কেন্দ্রে স্থাপন করে বৈদিক-যুগের শেষভাগে হিন্দু-ধর্ম-সাধনার সামগ্রিক কাঠামো রচিত হয়। বেদে বলা হয়েছে,—কর্মকাণ্ডের যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বর্গলাভ হয়; আর জ্ঞানকাণ্ডের যোগানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাভ হয় মুক্তি বা মোক্ষ। এই মুক্তি বা মোক্ষ লাভই হচ্ছে হিন্দু-ধর্ম-সাধনার চরম-লক্ষ্য। সার্বিক-ত্যাগের মধ্যে দিয়েই এই মোক্ষ লাভ হয়।

সার্বিক-ত্যাগ খুব কঠিন ব্যাপার। কতকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হলে তবেই সার্বিক-ত্যাগ সম্ভব হয়। তাই

হিন্দু-ধর্ম-সাধনায় চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে চতুর্বর্গ-সাধনার কথা বলা হয়েছে। এই চতুর্বর্গ-সাধনা হচ্ছে 'ধর্মার্থকামমোক্ষ'-এর সাধনা।

'ধর্মার্থকামমোক্ষ'-এর অর্থ সাধারণত করা হয়, প্রত্যেক হিন্দু ধর্মপরায়ণ হবে, অর্থোপার্জন করে সংসার প্রতিপালন করবে, নানান কামনা-বাসনার পূরণ করবে এবং মোক্ষলাভের চেষ্টা করবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই অর্থ ঠিক নয়। আমার মনে হয়, এখানে ধর্মের অর্থ জীবন-ধারণ, অর্থের অর্থ জীবন-ধারণের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন, কামের অর্থ জীবন-ধারণের প্রকৃত অর্থানুযায়ী কামনা-বাসনার পূরণ এবং মোক্ষের অর্থ অবশেষে মুক্তিলাভ। কাজেই ধর্মার্থকামমোক্ষের প্রকৃত অর্থ অনুসারে প্রত্যেক হিন্দুর প্রথম কর্তব্য জীবন-ধারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া, দ্বিতীয় কর্তব্য অধ্যয়নের মাধ্যমে জীবন-ধারণের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা, তৃতীয় কর্তব্য জীবন-ধারণের সেই প্রকৃত অর্থ অনুসারে কামনা-বাসনার পূরণ করা এবং চতুর্থ বা শেষ কর্তব্য মোক্ষ-লাভের সাধনায় ব্রতী হওয়া। [ক্রমশঃ]

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।*

পিণ্ডং কিং তন্মহাদেব পদং কিং সমুদাহৃতম্।

রূপঞ্চ রূপাতীতঞ্চ এতদাখ্যাহি শঙ্কর॥ ৮৯॥

শ্রীপার্বতী বললেন, হে মহাদেব! সেই "পিণ্ড" কি? "পদ" কাকে বলা হয়? "রূপ" আর "রূপাতীত"-ই বা কি? হে শঙ্কর! এই সমস্ত আমাকে বলুন।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

পিণ্ডং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্।

রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্॥ ৯০॥

শ্রীশঙ্কর বললেন, কুণ্ডলিনী শক্তিকে "পিণ্ড" ও হংসকে "পদ" বলা হয়; বিন্দুকে "রূপ" এবং নিরঞ্জনকে "রূপাতীত" বলে জানবে।

সোঽহং সর্ব্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ।

পরাৎ পরতরং নান্যৎ সর্ব্বমেব নিরাময়ম্॥ ৯১॥

"সোঽহং" বা "আমিই সেই" (পরমব্রহ্ম) এইভাবে সর্বময় হয়ে (অর্থাৎ নিজেকে সর্বব্যাপ্ত পরমব্রহ্মরূপে চিন্তা করে) পরমব্রহ্মকে অবলোকন বা দর্শন করবে। সেই পর (পরমব্রহ্ম) থেকে পরাৎপর (শ্রেষ্ঠতর) অন্য কিছুই নেই। এই প্রকারে (ব্রহ্ম-দর্শনের ফলে) সমস্তই নিরাময় হয়ে থাকে।

---

* মহাদেবের "পিণ্ড" "পদ" ও "রূপ" উক্তিতে পার্বতীর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তিনি বুঝতে পারছেন না, এই উক্তির দ্বারা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত জগদ্গুরু সদাশিব কি বলতে চেয়েছেন। সেইজন্য সন্দেহযুক্তা পার্বতী ভক্তি-নম্রচিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেছেন।

যস্যাবলোকনাদেব সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তস্তৎক্ষণাদ্ভবতি প্রিয়ে॥ ৯২॥

হে প্রিয়ে! যাঁর (ব্রহ্মের) অবলোকন বা দর্শন মাত্র (জ্ঞান লাভ করা মাত্র) [সাধক] সর্বসঙ্গ বিবর্জিত হয়ে (সকলের প্রতি আসক্তি বিমুক্ত হয়ে) তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ স্পৃহাশূন্য ও শান্ত হয়।

লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহুলং তথা।

নিষ্কামৈরেব* ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্টমানসৈঃ** ॥ ৯৩॥

পাঠান্তর ঃ *নিষ্কামেনৈব, **মানসাৎ।

(ব্রহ্মজ্ঞ নিষ্কাম ব্যক্তি) লাভ হোক্ বা না হোক্, অথবা (লব্ধ বস্তু) অল্প হোক্ বা বহুল হোক্, (সমস্তই) সর্বদা সন্তুষ্টমানসে নিষ্কামভাবে ভোগ করেন।

সদানন্দঃ সদা শান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ।

যত্রৈব তিষ্ঠতে সোঽপি স দেশঃ পুণ্যভাজনম্॥ ৯৪॥

সদানন্দময় ও সর্বদা শান্ত (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্যক্তি যে কোনও স্থানে ভ্রমণ করেন, যেখানেই তিনি অবস্থান করেন, সেই দেশই পুণ্যভূমি বা পবিত্র স্থান।

মুক্তস্য লক্ষণং দেবি তবাগ্রে কথিতং ময়া।

উপদেশো ময়া দেবি গুরুমার্গেণ দর্শিতঃ॥ ৯৫॥

হে দেবি! আমি তোমার নিকট মুক্তের (মুক্ত পুরুষের) লক্ষণ বললুম। গুরুমার্গানুসারে (গুরুদেব প্রদর্শিত সাধনপদ্ধতি অবলম্বনে), হে দেবি, (মুক্তিলাভের) উপদেশও আমা কর্তৃক দর্শিত হলো।

গুরুভক্তিস্তথাধ্যানং সকলং তব কীর্ত্তিতম্।

অনেন যদ্ভবেৎ কার্য্যং তদ্বদামি মহাতপঃ॥ ৯৬॥*

---

* ৯৬ সংখ্যক শ্লোক থেকে ১২৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত মোট উনত্রিশটি শ্লোকে শ্রীশ্রীগুরুগীতা পঠন-পাঠন, শ্রবণ-স্মরণ, জপ-তপস্যাদির ফলশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে। কেবল ১০১ থেকে ১০৩ সংখ্যক শ্লোকত্রয়ে কোন্ প্রণালীতে গ্রন্থটি পাঠ বা জপ করতে হবে, তা বলা হয়েছে।

গুরুভক্তি ও গুরুধ্যান এবং (তৎসংশ্লিষ্ট) সমস্তই তোমার নিকট কীর্তন করলুম। এর দ্বারা যে মহাতপস্যারূপ কার্য সাধিত হয়, তা বলছি।

লোকোপকারকং দেবি লৌকিকন্তু ন ভাবয়েৎ।
লৌকিকাৎ কর্ম্মণো যান্তি জ্ঞানহীনা ভবার্ণবে ॥ ৯৭ ॥

হে দেবি! (তোমাকে কথিত এই উপদেশ) লোকোপকারক (সকল লোকের পরম হিতকর), কিন্তু একে লৌকিক (সাংসারিক ভোগের অনুকূল) ভাববে না। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা লৌকিক কর্মানুষ্ঠানের জন্য (পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুরূপ) সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়।

ইদন্তু ভক্তিভাবেন পঠ্যতে শ্রূয়তেঽথবা।
লিখিত্বা বা প্রদীয়েত সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৯৮ ॥

এই গুরুগীতা ভক্তিভাবে পাঠ করলে অথবা শ্রবণ করলে কিংবা লিখে প্রদান করলে সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

গুরুগীতাভিধং দেবি শুদ্ধং তত্ত্বং ময়োদিতম্।
ভবব্যাধিবিনাশার্থং স্বয়মেব সদা জপেৎ ॥ ৯৯ ॥

হে দেবি! আমার কথিত গুরুগীতা নামক শুদ্ধতত্ত্ব (জন্ম ও মৃত্যুরূপ) ভবব্যাধি বিনাশের জন্য সর্বদা স্বয়ং-ই (প্রত্যেকেই) জপ করবে।

গুরুগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে।
অনয়া* বিবিধা মন্ত্রাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১০০ ॥

পাঠান্তর: * অপরে।

হে প্রিয়ে! এই গুরুগীতার এক একটি অক্ষর এক একটি মন্ত্রের রাজা (শ্রেষ্ঠমন্ত্র), বিবিধ মন্ত্রসমূহ এর ষোড়শাংশের একাংশেরও তুল্য নয়।

কুশৈর্ব্বা দূর্ব্বয়া বাপি আসনে শুদ্ধকম্বলে।
উপবিশ্য ততো দেবি জপেদেকাগ্রমানসঃ ॥ ১০১ ॥

হে দেবি! কুশ কিংবা তৃণনির্মিত আসনে অথবা শুদ্ধকম্বলাসনে উপবেশন করে (এই গুরুগীতা) জপ করবে।

[শান্ত্যর্থমানসং শুক্লং বশ্যে রক্তাসনং প্রিয়ে।
অভিচারে কৃষ্ণবর্ণং পীতবর্ণং ধনাগমে ॥ ১০২ ॥

হে প্রিয়ে! শান্তি মানসে শুক্লবর্ণ আসনে, বশীকরণ কামনায় রক্তবর্ণ আসনে, অভিচার বাসনায় (মারণ, উচাটন প্রভৃতি কর্মে) কৃষ্ণবর্ণ আসনে ও ধনাগমের জন্য পীতবর্ণ আসনে উপবেশন করে (এই গুরুগীতা জপ করবে)।

উত্তরে শান্তিদং জপাং বশ্যং পূর্ব্বমুখোদিতম্।
দক্ষিণে মারণং প্রোক্তং পশ্চিমে চ ধনাগমে ॥ ১০৩ ॥

শান্তি কার্যে উত্তরদিকে মুখ করে, বশীকরণ ইচ্ছায় পূর্বদিকে মুখ করে, মারণ প্রভৃতি আভিচারিক কর্মে দক্ষিণদিকে মুখ করে ও ধনাগম কামনায় পশ্চিমদিকে মুখ করে (এই গুরুগীতা) জপ করবে।] *

সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনম্।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বসঙ্কটনাশনম্ ॥ ১০৪ ॥

(এই গুরুগীতা) সর্বপ্রকার পাপ প্রশমন করে, সকল দারিদ্র্য বিনাশ করে, অকালমৃত্যু হরণ করে এবং সমস্ত সঙ্কট নাশ করে।

যক্ষরাক্ষসভূতানাং চৌরব্যাঘ্রভয়াপহম্।
মহাব্যাধিহরঞ্চৈব বিভূতিসিদ্ধিদং ভবেৎ ॥ ১০৫ ॥

* বন্ধনী-চিহ্ন [ ] মধ্যস্থিত ১০২ সংখ্যক ও ১০৩ সংখ্যক শ্লোক দুটি অধিকাংশ গ্রন্থে নেই। এই শ্লোকদ্বয়ে বশীকরণ, অভিচার, মারণ, উচাটন প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সাধক-সমাজে প্রচলিত যথার্থ সাধনার পরিপন্থী। সেইজন্য এই শ্লোক যুগ্মকে প্রক্ষিপ্ত বলে অনুমিত হয়। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সানুবাদ দুটি শ্লোককেই বন্ধনীচিহ্ন মধ্যে উদ্ধৃত করলুম। কিন্তু গুরুপূজান্তে "শ্রীশ্রীগুরুগীতা" পাঠকালে শ্লোকদ্বয় বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

(এই গুরুগীতা) যক্ষ, রাক্ষস ও ভূতগণের বিনাশ করে ; চৌর ও ব্যাঘ্রের ভয় নিবারণ করে ; মহাব্যাধি হরণ করে এবং বিভূতিসিদ্ধি* প্রদান করে।

* বিভূতিসিদ্ধি :—যোগী বা সাধক দীর্ঘ তপশ্চারনার ফলে যে সকল বিভূতি বা ঐশ্বর্য লাভ করেন, তাকে বিভূতিসিদ্ধি বলা হয়। বিভূতিসিদ্ধি আট প্রকার; যথা—

"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥"

অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব। এই আট প্রকার বিভূতিসিদ্ধিকে সংক্ষেপে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :-

(১) দৈহিক বিভূতিসিদ্ধি, (২) ইন্দ্রিয় বিভূতিসিদ্ধি ও (৩) মানসিক বিভূতিসিদ্ধি।

(১) দৈহিক বিভূতিসিদ্ধিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় :—(ক) অণিমা—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুতুল্য দেহ ধারণের ক্ষমতা ; (খ) মহিমা—ইচ্ছানুযায়ী দেহকে অধিকতর বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা ও (গ) লঘিমা—দেহকে অত্যন্ত লঘু বা হাল্কা করবার ক্ষমতা।

(২) ইন্দ্রিয় বিভূতিসিদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় : –(ক) প্রাপ্তি—পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হস্তগত করবার শক্তি ও (খ) প্রাকাম্য—ইচ্ছামত দর্শন-যোগ্য ও শ্রবণযোগ্য সমুদায় বস্তুর ভোগ ও দর্শনাদির শক্তি।

(৩) মানসিক বিভূতিসিদ্ধিও তিন ভাগে বিভক্ত : –(ক) ঈশিত্ব—স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সর্বভূতের উপর প্রভুত্ব বা স্বামিত্ব করবার ক্ষমতা লাভ, (খ) বশিত্ব—সকলকে নিজের বশীভূত রাখবার শক্তি লাভ ও (গ) কামাবসায়িত্ব—সবপ্রকার কাম বা ইচ্ছা জয় করে নিষ্কাম হওয়ার সামর্থ্য লাভ।

দৈহিক, ইন্দ্রিয় ও মানসিক ভেদে বিভূতিসিদ্ধিকে এইরূপে আট ভাগে বিভক্ত করা হয় বলে একে অষ্টসিদ্ধিও বলা হয়। বিভূতিসিদ্ধি বা অষ্টসিদ্ধিকে তুচ্ছ করতে সমর্থ হলেই সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী, এই সিদ্ধিসমূহ সর্বদা তাঁর আজ্ঞাবহ হয় ও সতত তাঁর সেবায় উন্মুখ হয়ে ওঠে।

মোহনং সর্ব্বভূতানাং বন্ধনে মোচকং* পরম্।
দেবভূপপ্রিয়করং লোকানাং বশমানয়েৎ ॥ ১০৬ ॥

পাঠান্তর ঃ *বন্ধমোচনকং।

(এই গুরুগীতা) সকল জীবকে মোহিত করে, বন্ধন থেকে পরম মুক্তি প্রদান করে, দেবতা ও ভূপতির প্রীতিপ্রদ এবং সমস্ত লোককে বশে আনতে সমর্থ।

মুখস্তম্ভকরং নৃণাং সদ্‌গুণানাং বিবর্দ্ধনম্।
দুষ্কর্ম্মনাশনঞ্চৈব সৎকর্ম্মসিদ্ধিদং ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥

(এই গুরুগীতা) মানবগণের মুখস্তম্ভনকর, সদ্‌গুণসমূহের বিবর্ধক, দুষ্কর্মের নাশক এবং সৎকর্মের সিদ্ধিপ্রদায়ক হয়।

ভক্তিদং সিদ্ধয়েৎ কার্য্যং* নবগ্রহভয়াপহম্।
দুঃস্বপ্ননাশনঞ্চৈব সুস্বপ্নানাং প্রদর্শকম্ ॥ ১০৮ ॥

পাঠান্তর ঃ *ভক্তিদং সর্ব্বসিদ্ধিদং, অসাধ্যং সাধয়েৎ কার্য্যং।

(এই গুরুগীতা) ভক্তি প্রদান করে, কার্যে সিদ্ধি দান করে, নবগ্রহের (বৈগুণ্যজনিত) ভয় অপহরণ করে, দুঃস্বপ্ন বিনাশ করে এবং সুস্বপ্ন প্রদর্শন করায়।

সর্ব্বশান্তিকরং নিত্যং বন্ধ্যাপুত্রফলপ্রদম্।
অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়কং পরম্ ॥ ১০৯ ॥

(এই গুরুগীতা) নিত্য সর্বপ্রকার শান্তি দান করে, বন্ধ্যাকে পুত্ররূপ ফল প্রদান করে, স্ত্রীলোকগণের বৈধব্যদোষ নাশ করে এবং (সকলকে) পরম সৌভাগ্য দান করে।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধকম্।
নিষ্কামতস্ত্রিবারং বা জপেন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১০ ॥

(এই গুরুগীতা) আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য প্রদান করে ; পুত্র ও পৌত্রাদি বর্ধন করে এবং নিষ্কামভাবে তিনবার (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ম্ সন্ধ্যায়) জপ করলে মোক্ষলাভ হয়। [ক্রমশঃ]

পুণ্য ২৩শে জানুয়ারী

'নেতাজী স্মরণে'

শ্রীখগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত

প্রণাম লহ গো, নেতাজী সুভাষ,
ভারতের প্রিয়জন।
তোমারি পুণ্য জনম দিবসে
নমি মোরা সর্বজন॥
কোথায় তোমার আজাদ সেনানী
আজ তুমি কত দূরে—
দেশ জোড়া তব পরিজন আজ
ডাকে তোমা এসো ফিরে॥
জীবন মূল্যে স্বাধীনতা দিলে
সহিয়ে লাঞ্ছনা ব্যথা।
ভারতের প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে
রয়েছে সে কথা গাঁথা॥
বাংলার তুমি বীর সন্তান
ভারতের নব প্রাণ,
করেছিলে তুমি, মণিপুর পথে
দুর্বার অভিযান॥
মনে পড়ে তব দিল্লী চলার
কদম কদম গান।
হে বীর নেতাজী, হে বীর বিপ্লবী
হে পুরুষ, হে মহান্॥
(তব) অমর জীবন, অমর হউক
এই চাহে সব প্রাণ।
ফিরে এসে পুনঃ তোমার ভারতে
করে যাও শক্তি দান॥

— :(*):—

Tresses that fair
Head can boast
A beautiful tress inspired the poets through the ages. So, Jaborandi is a must for your hair care. It is being used all over the world from time immemorial for the treatment of hair. Millions benefited.
JABORANDI
HAIR OIL
Jaborandi Hair Oil is the result of a mixture of Jaborandi of Brazil Arnica of Northern Hemisphere and some Indian herbs
It
•stops hair falling, grows new hair,
•keeps your head cool and helps a sound sleep,
•makes your hair thicker, more black and silky
•stops early greying
Dr. S. D. Debnath
Homoeo Laboratory
Howrah Subway, Howrah-711101
Please enquire at all the Chemists (Allopathic/Homeopathic) and Stationery shops.
Jaborandi
HAIR OIL

ওঁ নমঃ শিবায়

বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার

গোকুলানন্দ ঘাট রোড শ্রীধাম নবদ্বীপ নদীয়া

স্থাপিত—১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতির প্রচেষ্টায় নবদ্বীপ ধামে "বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার" প্রতিষ্ঠা

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহর্ষি ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহোদয়ের মহাপ্রয়াণের (বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ এর) পরেই তাহার প্রথম স্মৃতিচারণ সভায় (প্রসিদ্ধ নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাটে) বৈষ্ণবাচার্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভায় পৌরহিত্য করেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদিগের অন্যতম পরম ভাগবত ৺গোপেন্দ্র ভূষণ শাস্ত্রতীর্থ মহোদয়।

বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্মৃতি গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন হয় গত বাং ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ইং ৩০শে নভেম্বর ১৯৮২ তারিখে নবদ্বীপ-ধামের গোকুলানন্দ ঘাট রোডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার কৃপায় ও নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট ডঃ নাথের অনুরাগীবৃন্দের সাহায্য সহানুভূতি এবং প্রচেষ্টায়। দ্বারোদ্ঘাটন করেন আসাম বঙ্গ যোগি সম্মিলনীর বর্তমান সুযোগ্য সম্পাদক ডাঃ হরিহর নাথ এম, বি, বি, এস মহোদয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর শ্রদ্ধেয় সভাপতি পুরোহিত রত্ন শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দেবনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এবং সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র দেবনাথ মহাশয়দ্বয়।

পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতির সহঃ সভাপতি স্বনামধন্য সমাজ-সেবক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত শশিভূষণ দেবনাথ বি, এ, মহাশয় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। নবনির্মিত গৃহের মাঙ্গলিক কার্য্য পূজার্চনা, যাগ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন বর্তমান গ্রন্থাগার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শৈবাচার্য শ্রীযুত মাখনলাল হালদার ভক্তিরত্ন ভাগবত ভূষণ মহাশয়।

বাং ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ইং ১লা ডিসেম্বর ১৯৮২ তারিখ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নবনির্মিত স্মৃতি গ্রন্থাগারে বৈষ্ণবাচার্য্য ডঃ নাথের ত্রয়োদশ বার্ষিক তিরোধান দিবস যথারীতি উদযাপিত হয়। বিশেষ কারণ বসতঃ সভাপতি শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী দেবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাচলাকালীন সভাত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতপ্রবর পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুত মনিলাল মৈত্র গোস্বামী এম, এ, ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ ভাগবতাচার্য্য মহাশয়কে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে অনুরোধ করেন এবং শ্রীযুত মৈত্র মহাশয় সভার অবশিষ্ট কার্য পরিচালনা করেন। এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবার একমাত্র কারণ, তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য ডঃ নাথের স্নেহধন্য ছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাতে অযাচিতভাবে এক অজ্ঞাত সাহায্যকারীর সহযোগিতায় তিনি ট্রেন ধরিতে পারিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে,—তিনি পঙ্গু, কাঠের পা দ্বারা কোনও প্রকারে চলাচল করেন। শ্রীযুত মৈত্র মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, আলোচ্য গ্রন্থাগার মানব কল্যাণে এক বিশেষ ভূমিকার উৎসস্থল হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ইহা পূর্ণাঙ্গরূপ লইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রয়োজনীয় সার্বিক সাহায্যের জন্য তিনি সর্বসাধারণের নিকট আবেদনও রাখেন। পরিশেষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পরিবেশনে সভাস্থ সকলের মনোরঞ্জন করেন।

অতঃপর নাম-কীর্তন অন্তে রাত্র ৮টা ১৫ মিনিটে ডঃ নাথের মহাপ্রয়াণের সময় তাঁহার প্রতিকৃতিতে আরতি, বন্দনা, পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন উপস্থিত সকল সভ্যবৃন্দ, সমাপ্তির পরে মিষ্টি প্রসাদ প্রায় ৩/৪ শত ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এই স্মৃতিচারণ সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী বিধুভূষণ মজুমদার, ডাঃ হরিহর নাথ, জ্ঞানেশ চন্দ্র রায়, মৃত্যুঞ্জয় নাথ, সুবল চন্দ্র দেবনাথ ও মাখন লাল হালদার, হরলাল নাথ এবং আরোও অনেকে।

পশ্চিমবঙ্গ নাথ কল্যাণ সমিতি এবং বৈষ্ণবাচার্য্য ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতি গ্রন্থাগার কমিটির প্রাণ পুরুষ বর্তমান সভাপতি শ্রীযুত হর

লাল নাথ মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন, জনসাধারণের নিকট হইতে স্বতস্ফূর্ত সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্যই এই গ্রন্থাগারের আংশিক রূপদান সম্ভব হইয়াছে। এই জন্য তিনি সমিতির পক্ষ হইতে সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যাঁহারা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে এই সভায় যোগদান করিয়া সভার কার্য্যকে সুন্দর করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, এই গ্রন্থাগার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং এই গ্রন্থাগার পূর্ণ রূপ লাভ করিবার পর, যোগাশ্রম, অতিথিশালা, ছাত্রাবাস, সভাকক্ষ, বিশেষ ভাবে ধর্মীয় গবেষণাগার এবং আরোও বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়া ৪র্থ তল গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, এইজন্য প্রচুর অর্থের ও সৎকর্মীর প্রয়োজন হইবে। ইহার জন্য তিনি সর্বসাধারণের নিকট অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতির আবেদন জানান।

উক্ত সভায় নবদ্বীপ হালদার ভবনের অন্যতম মালিক শ্রীযুত মতি লাল হালদার মহাশয় স্বতস্ফূর্ত ভাবে গ্রন্থাগারের জন্য একটি পাঁচশত টাকার অধিক মূল্যের আলমারি দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সভার পক্ষে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুত হালদারের এই বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অন্যকেও অনুপ্রণোদিত হইতে আহ্বান জানান।

সংবাদ দাতা—ডাঃ শ্রীননীগোপাল নাথ
সম্পাদক জাহান্নগর বিদ্যাপীঠ, বেতপুকুর, বর্দ্ধমান

গ্রন্থাগারে সাহায্য ও পত্রাদি পাঠাইবার ঠিকানা—

১। সভাপতি শ্রীহরলাল নাথ, চটীর মঠ, নবদ্বীপ, নদীয়া।

২। গ্রন্থাগার সম্পাদক শৈবাচার্য্য শ্রীমাখনলাল হালদার ভক্তিরত্ন ভাগবতভূষণ, গোকুলানন্দঘাট রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া।

—ঃ(*)ঃ—

হাতিয়াড়া ধর্ম মন্দিরের ইতিহাস

বিশ্বেশ্বর নাথ

এখন যে জায়গার নাম রাজারহাট, সেই রাজারহাটেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি কাছারি বাড়ী ছিল। সেই সময়ে সেই অঞ্চলকে সুন্দরবন এলাকা বলেই লোকে জানত। হাতিয়াড়া রাজারহাটের একটি গ্রাম। হাতিয়াড়া গ্রামের নাম কবে কোন্ সময়ে হয়েছিল তা সঠিক জানা নেই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে এই গ্রামে একটি জলাশয় খনন করা হয়েছিল। মাটি কাটার সময় পূর্ববাম নামে এক সর্দারের ঝুড়িতে একটি বিগ্রহ দেখা গিয়েছিল।

অনতিদূরে এক সাধু বাস করতেন। যারা কাজ করছিল, সবাই বিগ্রহটিকে নিয়ে সাধুর কাছে গেল। বিগ্রহ দেখে সাধু বললেন, 'এ নিরঞ্জন ধর্ম বিগ্রহ, কুর্ম অবতার। আমার তুলসী তলায় রেখে দাও। প্রতিদিন জল দেব'।

এই ঘটনার কিছুদিন পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শিকারে এলেন এই সুন্দরবন এলাকায়। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে সাধুর আশ্রমে এলেন মহারাজা। সাধু যথাসম্ভব আপ্যায়ন করলেন তাঁকে। সেই রাত্রিটা আশ্রমেই কাটাতে হ'ল মহারাজাকে। পরদিন সকালে তুলসী তলায় রাখা বিগ্রহটি মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সাধুর কাছে পুরো কাহিনী শুনলেন।

এরপর আরো কিছুদিন অতিবাহিত হ'ল। একদিন গ্রামবাসীরা দেখল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মন্ত্রী কিছু লোকজন নিয়ে জমি জরিপে ব্যস্ত। সেদিন তারা শুনল, বিগ্রহের সেবার জন্য মহারাজা কিছু জমি দান করতে চান। জমির পরিমাণ দাঁড়াল প্রায় একশ তিপান্ন বিঘার মত।

একদিন কৃষ্ণচন্দ্রকে আবার দেখা গেল সাধুর আশ্রমে। তিনি জমির একটি হাতচাপড়া পাট্টা সাধুকে দান করলেন বিগ্রহের সেবার জন্য। দান গ্রহণ করতে সাধু রাজি হলেন না। এতে কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মিত

হলেন। সাধু বললেন, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। সুদূর কান্যকুব্জ হতে এখানে এসেছি তপস্যার জন্য। এ সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করব।'

কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সাধুর নাম শিবশঙ্কর পণ্ডিত এবং তাঁর আরেক ভাই রামশঙ্কর পণ্ডিত কান্যকুব্জে আছেন; তাঁরা জাতিতে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ।

খোঁজ করে রামশঙ্কর পণ্ডিতকে এনে তাঁকেই জমি দান করলেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেই থেকে রামশঙ্কর পণ্ডিত থেকে গেলেন এই হাতিয়াড়া গ্রামে। তাঁরই বংশধর হলেন ধর্মদাস পণ্ডিত। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম হরিহর পণ্ডিত এবং কন্যার নাম নীরদা সুন্দরী দেবী।

হরিহর বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু কোন সন্তানাদি ছিল না। পিতা ধর্মদাস জীবিত থাকতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কন্যা নীরদা সুন্দরীর বিয়ে হয়েছিল বেনিয়াপুকুর নিবাসী মণিমোহন নাথের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র নাথের সঙ্গে। তিনি ডাক্তার ছিলেন। ধর্মদাস পণ্ডিতের মৃত্যুর পর নীরদা সুন্দরী এই সম্পত্তির অধিকারিণী হলেন এবং সুরেন্দ্র নাথ হলেন বিগ্রহের সেবাইত।

জমি যা কিছু প্রজা বিলি ব্যবস্থা ছিল। জমিদারি উচ্ছেদের সময় সবই গভর্ণমেণ্টের খাস হয়ে গেল। শুধু এক একর পঁয়ষট্টি শতক জমি সুরেন্দ্র নাথের খাস দখলে রইল। এখনও তা আছে।

নীরদা সুন্দরী ও সুরেন্দ্র নাথ উভয়েই এখন পরলোকে।

সুরেন্দ্র নাথের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম পুত্র প্রাণকৃষ্ণ নাথ, তিনি পিতা বর্তমানেই তিনপুত্র ও দুই কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয়—জীবনকৃষ্ণ নাথ, তৃতীয়—খগেন্দ্র নাথ, চতুর্থ—কমলকৃষ্ণ নাথ এবং পঞ্চম বিশ্বেশ্বর নাথ। এঁরা সকলেই বিবাহিত এবং আলাদা আলাদা সংসার করে আছেন।

১৯৭০ সাল থেকে বিগ্রহের মন্দির জীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। মেরামতের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। দৈনিক পূজা হয় না ঠিকমত।

একমাত্র দোলপূর্ণিমায় উৎসব হয় কোন রকমে। দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদই এর মুখ্য কারণ। যে সম্পত্তি দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে দেবতার সেবার জন্য, দেবতার প্রতি অবহেলা ক'রে সেই সম্পত্তি নিয়ে শরিকে শরিকে বিবাদ মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়।

তাই আমি, বিশ্বেশ্বর নাথ, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর সভ্যগণকে জানাচ্ছি,—আমাদের রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-পাড়ার এমনি একটি মন্দির যাতে তিলে তিলে অবহেলায় নষ্ট না হয়ে যায়, মন্দির মেরামত এবং নিত্য সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত পূজার্চ্চনা যাতে হয় তার সুবন্দোবস্ত করায় সহযোগিতা করুন।

পরিশেষে আমাদের অন্যান্য শরিকের প্রতি আমার আবেদন,—আসুন, আমরা দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে সকল শরিকী কলহের অবসান ঘটাই, জীর্ণমন্দির সংস্কারে ও দেবসেবায় যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করি।

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

পাত্রী—(২২) উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা, স্কুলফাইনাল অনুত্তীর্ণা। চাকুরীজীবি / ব্যবসায়ী পাত্র প্রার্থী। যোগাযোগ করুন। শ্রীদীনেশ চন্দ্র নাথ। ই ৪৯, রামগড় কলোনী, কলিকাতা-৪৭।

পাত্রী—(১৯ ৬ মাস) উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। সুশ্রী ও ফর্সা, উচ্চ বংশ সম্ভূতা, গৃহকর্মে নিপুণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। Lalitmohan Bhowmick. I'L/14 Kusthia Housing Estate, Calcutta—700039, Phone—26-9220.

পাত্রী—গ্র্যাজুয়েট, বয়স ৩০, উচ্চতা ৫'-২½", সরকারী চাকুরীরতা, সুশ্রী ও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীকৃষ্ণ রঞ্জন পণ্ডিত। ১১৮/১ বীরেন রায় রোড (ওয়েষ্ট), কলিকাতা—৭০০০৬১।

পাত্র—এম, এ, বি, এড, । এইচ, এস, শিক্ষক, বয়স ৩৫, পাত্রী চাই বি, এস, সি, বি, এ, । পত্রে যোগোযোগ করুন। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র নাথ। বাসন্তী নিকেতন, নরেন্দ্র পল্লী, পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীরামনারায়ণ দালাল
গ্রাম + পোঃ গোড়াপোতা,
জিলা ২৪ পরগণা।

শ্রীশঙ্করনাথ মল্লিক
১৮বি, বলরাম বোস ২য় লেন,
কলিকাতা-৭০০০২০।

শ্রীহৃষিকেশ পণ্ডিত
৭৫, ইউসুফ সাঁফুই রোড,
চড়িয়াল বাজার, পোঃ বজবজ,
জিলা ২৪ পরগণা।

শ্রীসূর্য্যকুমার দেবনাথ
১১৯/২/১ নিয়োগী পাড়া রোড,
কলিকাতা-৭০০০৩৬।

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা**।

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩০।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮৯

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শিবভক্ত্যুৎকর্ষনিরূপণম্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উক্তঞ্চ তেন কস্মৈচিন্ন দাতব্যমিদং ত্বয়া।
সূতপুত্রান্যথা দেবাঃ ক্ষুভ্যন্তি চ শপন্তি চ ॥ ৬

অথ পৃষ্টো ময়া বিপ্রা ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ভগবন্ দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিং ক্ষুভ্যন্তি শপন্তি চ ॥ ৭

তাসামত্রাস্তি কা হানির্যয়া কুপ্যন্তি দেবতাঃ।
পারাশর্য্যোঽথ মামাহ যৎ পৃষ্টং শৃণু বৎস তৎ ॥ ৮

নিত্যাগ্নিহোত্রিণো বিপ্রাঃ সন্তি যে গৃহমেধিনঃ।
ত এব সর্ব্বফলদাঃ সুরাণাং কামধেনবঃ ॥ ৯

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ যদ্যদিষ্টং সুপর্ব্বণাম্।
অগ্নৌ হুতেন হবিষা তৎ সর্ব্বং লভতে দিবি ॥ ১০

নান্যদস্তি সুরেশানামিষ্টসিদ্ধিপ্রদং দিবি।
দোগ্ধ্রী ধেনুর্যথা নীতা দুঃখদা গৃহমেধিনঃ ॥ ১১

তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রো দেবানাং দুঃখদো ভবেৎ।
ত্রিদশাস্তেন বিঘ্নন্তি প্রবিষ্টা বিষয়ং নৃণাম্ ॥ ১২

ততো ন জায়তে ভক্তিঃ শিবে কস্যাপি দেহিনঃ।
তস্মাদ বিদুষাং নৈব জায়তে শূলপাণিনঃ ॥ ১৩

যথা কথঞ্চিজ্জাতাপি মধ্যে বিচ্ছিদ্যতে নৃণাম্।
জাতং বাপি শিবজ্ঞানং ন বিশ্বাসং ভজত্যলম্ ॥ ১৪

অনুবাদ :—

তিনি (ব্যাসদেব) বলেছিলেন,—হে সূতপুত্র! এই শিবগীতা তুমি কাউকে প্রদান করবে না ; করলে দেবগণ ক্ষুব্ধ হয়ে তোমাকে অভিশাপ দেবেন। ৬॥ আমি বিপ্র-ভগবান-বাদরায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করে জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—হে ভগবান! দেবতাসকল কেন ক্ষুব্ধ হবেন, কেনই বা তাঁরা অভিশাপ দেবেন? ৭॥ তাতে (শিবগীতা প্রদান করলে) দেবগণের কি এমন ক্ষতি হয় যার ফলে তাঁরা কুপিত হন? পরাশর-নন্দন আমার এই কথা শুনে বললেন,—হে বৎস! তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে তা শোন। ৮॥ যে সকল বিপ্র অগ্নিহোত্রী এবং গার্হস্থ্যাশ্রমী তাঁরা সুরগণের পক্ষে সকল-ফল-প্রদ কামধেনু-স্বরূপ, সন্দেহ নেই। ৯॥ কারণ,—ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং পেয় যে সকল বস্তু সুরগণের পরম প্রিয় সমস্তই বিপ্রগণ ঘৃতসহযোগে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ; ফলে দেবগণ সেই সমস্ত প্রিয় বস্তু লাভ করে প্রীত হ'ন। ১০॥ এ ছাড়া সুরগণের কাম্যবস্তু লাভের অন্য কোন উপায় নেই। দুগ্ধবতী গাভী অপহৃতা হলে গৃহস্থের যেমন খুব দুঃখ হয়, তেমনি জ্ঞানবান বিপ্র দেবগণের দুঃখের কারণ হয়ে থাকেন (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী বিপ্র কর্মকাণ্ডের ক্রিয়ানুষ্ঠানকে অনর্থক বিবেচনা করে যজ্ঞাদি বর্জন করায় দেবগণের কাম্যবস্তুলাভের পথ বন্ধ হয় ; তাই সুরগণ দুঃখ লাভ করেন)। এই কারণে সুরগণ মানবগণের (জ্ঞান-প্রচারক মানবগণের) বিঘ্ন-সাধনে তৎপর হ'ন। ১১—১২॥ তাই দেহিগণের অন্তরে কখনো শিব-ভক্তি জাগ্রত হয় না। সুতরাং মূঢ় মানবগণ শূলপাণির কৃপালাভ করতে পারে না। ১৩॥ কারো কারো মধ্যে স্বল্প পরিমাণে শিব-ভক্তির উদয় হতে পারে ; কিন্তু পূর্ণ-শিব-ভক্তির উদয় হয় না। কারো মধ্যে শিব-জ্ঞানের সঞ্চার হলেও, সেটা তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। ১৪॥

অনুবাদক—সু. নাথ

স ম্পা দ কী য়

রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজে পুরোহিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। পৌরেহিত্য-কার্যের প্রতি অনীহাই এর জন্য দায়ী বলা চলে।

সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীপূজার সময় হিন্দু-সমাজের সর্বত্রই পুরোহিতের অভাব লক্ষ্য করা যায়। রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজেও তখন পুরোহিত পাওয়া যায় না।

রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ পুরোহিতের খুব অভাব। তাই অনেক রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-পরিবারকে অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত, নানা কারণে, রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের কাজ-কর্ম ঠিকমতো করতে ও করাতে পাবেন না। ফলে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের যাঁরা অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে কাজ-কর্ম করান তাঁদের সেই কাজ-কর্ম না করারই সামিল হয়।

সুতরাং রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-সমাজকে এই পুরোহিত-সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে হবে। পুরোহিত-সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ পৌরোহিত্য-শিক্ষা-দানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা। 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী' সেই দিকে অগ্রসর হতে চলেছে। ক'লকাতায় ফিয়ার্স লেনের কালীমন্দিবে রুদ্রজ-ব্রাহ্মণদের জন্য পৌবোহিত্য-শিক্ষা-দানের সীমিত-আয়োজন আরম্ভ হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কোন প্রচেষ্টাকে সীমিত রাখতেই হয়। সেদিক থেকে 'রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী' ঠিকই করছেন। তবে সেই প্রাথমিক-প্রচেষ্টা সফল হবার পর ব্যাপক-ব্যবস্থার কথাও সম্মিলনীকে মনে রাখতে হবে।

বর্তমানে, বেকার-সমস্যার তীব্রতার যুগে পৌরোহিত্য-কার্য রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-যুবকদের কিছুটা অবলম্বন নিশ্চয় হতে পারে। তাই বেকার রুদ্রজ-ব্রাহ্মণ-যুবকদের প্রতি আবেদন,—আসুন, আপনারা পৌরোহিত্য-শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সমাজের একটি সমস্যার সমাধান করুন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের বেকার-জীবনে, ক্ষুদ্র হলেও, একটি অবলম্বন গড়ে তুলুন।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৯০ সংখ্যক শ্লোকের টীকা ঃ—

** পূর্বে উল্লিখিত 'গুরুপ্রণামে'র অন্তর্গত ৪১ সংখ্যক শ্লোকে "বিন্দুনাদকলাতীত" প্রভৃতি উক্তিতে যে তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এখানে ৯০ সংখ্যক শ্লোকে সেই তত্ত্বকেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গুরুপ্রণামের মাধ্যমে যে গুহ্যসাধনার অবতারণা, এখানে ঘটেছে তারই পরিসমাপ্তি। এই গুহ্যসাধনা তান্ত্রিক যোগশাস্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র-সাধনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

পৃথিবী পঞ্চভূতাত্মক। ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্‌ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম্‌ (আকাশ)—এই পঞ্চভূতের সমষ্টিই স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্বচরাচর। "তৈত্তিরীয় উপনিষদে" 'ব্রহ্মানন্দবল্লী' নামক 'দ্বিতীয় অধ্যায়ে'র 'প্রথম অনুবাকে'র 'চতুর্থ মন্ত্রে' বলা হয়েছে,

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।...."২।১।৪

পরমেশ্বর বা পরমব্রহ্ম থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উদ্ভূত হয়েছে। এই পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবীর সৃষ্টি প্রধানত দুই প্রকার—জড়জগৎ ও জীবজগৎ। আত্মার অনুপম দেহকান্তির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কের ফলেই জীবজগতের সূচনা হয়েছে, ঐ সম্পর্ক পরিত্যক্ত হলেই পার্থিব দেহের অবসান ঘটে। কিন্তু আত্মার মৃত্যু হয় না; কারণ আত্মা অমর, অবিনশ্বর। জড়বস্তুর আত্মা নেই বলেই তা ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর।

জীবমাত্রেরই কেবলমাত্র পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরে এরই মত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে গঠিত আর একটি সূক্ষ্মদেহ রয়েছে। এই সূক্ষ্মদেহ স্থূল ইন্দ্রিয়াদির গোচরীভূত নয়। সেইজন্য একে বলা হয় সূক্ষ্মশরীর। এরই অপর নাম লিঙ্গশরীর। "পঞ্চদশী"তে বলা হয়েছে,

"জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশটি পদার্থে গঠিত যে সূক্ষ্মশরীর, তাকেই লিঙ্গশরীর বলা হয়।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে তৈরী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে গুহ্যদেশ থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান। এই নাড়ীব অভ্যন্তরে বজ্রিণী নাড়ী, তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী চিত্রিণী ও তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী রয়েছে। গুহ্যদেশে মেরুদণ্ডের অধোসীমায় মূলাধারচক্র, লিঙ্গমূলের সমস্থানে স্বাধিষ্ঠানচক্র, নাভিদেশে মণিপুরচক্র, হৃদয়ে অনাহতচক্র, কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভ্রূযুগলমধ্যে আজ্ঞাচক্র—সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরস্থ এই চিত্রিণী ও ব্রহ্ম-নাড়ীতেই চক্র ছয়টি অবস্থিত। এই চক্র ছয়টিকে এক কথায় ষট্চক্র বলা হয়। মূলাধারে বিদ্যুৎবর্ণা কুণ্ডলিনীশক্তি সার্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করে ব্রহ্মদ্বার রোধপূর্বক অধোমুখে সুগভীর নিদ্রায় নিমগ্না। সাধক সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগিয়ে ঊর্ধ্বমুখী করে একের পর এক চক্র অতিক্রম করে ষট্চক্র ভেদপূর্বক সহস্রারচক্রে অবস্থিত পরমশিবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে মিলনসঞ্জাত সহস্রার-ক্ষরিত আনন্দ-সুধারসে নিজেকে আপ্লুত করেন। ষট্চক্রের প্রথম পাঁচটি চক্র পঞ্চভূতস্বরূপ। মূলাধারচক্র ক্ষিতি বা পৃথিবীস্বরূপ, স্বাধিষ্ঠানচক্র অপ্ বা জলস্বরূপ, মণিপুরচক্র তেজঃ বা অগ্নিস্বরূপ,

অনাহতচক্র মরুৎ বা বায়ুস্বরূপ এবং বিশুদ্ধচক্র ব্যোম্ বা আকাশস্বরূপ। ষট্‌চক্রের ষষ্ঠ চক্র আজ্ঞা মনস্তত্ত্বস্বরূপ। এখানেই জীবসমূহের প্রজ্ঞানেত্র বা অদৃশ্য তৃতীয়নয়ন অবস্থিত। শাস্ত্রে ও পুরাণাদিতে সমষ্টিবুদ্ধ্যভিমানী যে হিরণ্যগর্ভকে প্রথম দেহী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আজ্ঞাচক্র তাঁরই আধ্যাত্মিক মূর্তি।

পঞ্চভূতে গঠিত জীবসমূহের বৃত্তিগুলির নিরোধের নামই প্রলয়। পূর্বেই বলেছি, পরমেশ্বর থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবী উদ্ভূত হয়েছে। এটাই পাঞ্চভৌতিক জাগতিক জীবসৃষ্টির স্বাভাবিক বৃত্তি বা নিয়ম। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হলেই প্রলয় উপস্থিত হয়। তখন সেই প্রলয়কালে পৃথিবীতত্ত্ব জলতত্ত্বে, জলতত্ত্ব তেজস্তত্ত্বে, তেজস্তত্ত্ব বায়ুতত্ত্বে, বায়ুতত্ত্ব আকশতত্ত্বে এবং আকাশতত্ত্ব পরমেশ্বরে লীন হয়ে একীভূত হয়ে যায়। সেই সময়ে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরে অবলুপ্ত হয়ে অবস্থান করে। তখন পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও তত্ত্বই আর থাকে না। অনুরূপ কুণ্ডলিনীশক্তি যখন উর্ধ্বমুখী হয়ে যথাক্রমে মূলাধারাদি চক্র ভেদ করে সহস্রারচক্রস্থিত পরমশিবের সঙ্গে মিলিতা হন, তখন বিভিন্ন চক্রস্থিত পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণসমূহ, দেবতাবৃন্দ ও তাঁদের শক্তিগণ একের পর এক-এর উর্ধ্ব চক্রে কুণ্ডলিনীশক্তিতে লয় প্রাপ্ত হন এবং বীজাকারে পরবর্তী চক্রে অবস্থিত থাকেন। এইভাবে মূলাধারচক্রস্থ পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্তি স্বাধিষ্ঠানচক্রে, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থ পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্তি মণিপুরচক্রে; মণিপুরচক্রস্থ পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্তি অনাহতচক্রে, অনাহতচক্রস্থ পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্তি বিশুদ্ধচক্রে; বিশুদ্ধচক্রস্থ পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্তি আজ্ঞাচক্রে এবং আজ্ঞাচক্রস্থ পদ্মদল, মাতৃকাবর্ণ, দেবতা ও তাঁর শক্তি সহস্রারচক্রে বিলীন হয়ে বীজাকারে কুণ্ডলিনীশক্তি মধ্যে অবস্থান করেন। সমস্ত চক্রের অবলুপ্তির পরে

যখন সহস্রারচক্রে পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির মিলন হয়, তখন শিবশক্তি ব্যতীত অপর কোনও তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে না। সাংখ্যদর্শনে এরই নাম সাম্যাবস্থা, উপনিষদ্ ও পুরাণাদিতে একেই বলে প্রলয়।

তন্ত্রোক্ত এই ষট্‌চক্রকেই যোগশাস্ত্রে শ্রীচক্র বলা হয়। এই শ্রীচক্র আন্তর-ষট্‌চক্রেরই বাহ্যিক রূপ। বস্তুত, ষট্‌চক্র ও শ্রীচক্রের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কেননা, স্বরূপত উভয়েই এক। আবার এই চক্রকেই মাতৃকাচক্রও বলা চলে। মূলাধারাদি ষট্‌চক্র বা মাতৃকা-চক্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"ত্রিখণ্ডং মাতৃকাচক্রং সোমসূর্য্যানলাত্মকম্।"

মাতৃকাচক্র চন্দ্র, সূর্য ও অনলরূপ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। ষট্‌চক্রের বা মাতৃকাচক্রের প্রথম দুটি চক্র অর্থাৎ মূলাধারচক্র ও স্বাধিষ্ঠানচক্র এর প্রথম খণ্ড, মধ্যবর্তী চক্রদ্বয় অর্থাৎ মণিপুরচক্র ও অনাহতচক্র এর দ্বিতীয় খণ্ড এবং শেষ চক্রদুটি অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্র ও আজ্ঞাচক্র এর তৃতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড অনলাত্মক, তাই একে বহ্নিতত্ত্বস্বরূপ; দ্বিতীয় খণ্ড সূর্যাত্মক, তাই একে সূর্যতত্ত্বস্বরূপ এবং তৃতীয় খণ্ড চন্দ্রাত্মক, তাই একে চন্দ্রতত্ত্বস্বরূপ বলা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আপাতদৃষ্টিতে অনল বা বহ্নির সঙ্গে সূর্যের পার্থক্য লক্ষিত হলেও স্বরূপত উভয়ের মধ্যে কোনও বৈষম্য নেই। "বায়বীয় সংহিতা"য় বলা হয়েছে,

"দ্বিধা বৈ তৈজসী বৃত্তিঃ সূর্য্যাত্মা চানলাত্মিকা।"

তেজঃবৃত্তিতে সূর্য ও অনল দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে। বহ্নিতত্ত্বস্বরূপ প্রথম খণ্ডকে ব্রহ্মগ্রন্থি, সূর্যতত্ত্বস্বরূপ দ্বিতীয় খণ্ডকে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং চন্দ্রতত্ত্ব-স্বরূপ তৃতীয় খণ্ডকে রুদ্রগ্রন্থি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বহ্নি প্রথম খণ্ডের উপরে অবস্থান করে আপন শিখাসমূহের দ্বারা এই খণ্ডকে অর্থাৎ মূলাধারচক্র ও স্বাধিষ্ঠানচক্রকে, সূর্য দ্বিতীয় খণ্ডের উপরে বর্তমান থেকে আপন কিরণগুলির দ্বারা এই খণ্ডকে অর্থাৎ মণিপুরচক্র

ও অনাহতচক্রকে এবং চন্দ্র তৃতীয় খণ্ডের উপরে বিদ্যমান হয়ে আপন কলাসমূহের দ্বারা এই খণ্ডকে অর্থাৎ বিশুদ্ধচক্র ও আজ্ঞাচক্রকে আবৃত করে রেখেছেন।

পঞ্চভূতাত্মক মূলাধারচক্রকে ক্ষিতিতত্ত্ব বলে। এই চক্রে কুণ্ডলিনী-শক্তি সর্পাকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করে ব্রহ্মদ্বার অবরুদ্ধ করে সুগভীর নিদ্রামগ্না। এই সময়ে তাঁকে পিণ্ডাকৃতি দেখায়। আবার ক্ষিতিতত্ত্বও পিণ্ডবৎ। সেইজন্য 'কুণ্ডলিনীশক্তি'কে 'পিণ্ড' বলা হয়েছে। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হলে জীবের জড়ত্ব অপসৃত হয়। এই শক্তি মূলাধারচক্রের ক্ষিতিতত্ত্ব পরিত্যাগ করে ঊর্ধ্বগামিনী হয়ে স্বাধিষ্ঠানচক্রের অপ্‌তত্ত্ব বা জলতত্ত্ব অতিক্রম করে মণিপুরচক্রের তেজস্তত্ত্বে উপনীতা হলেই মাতৃকাচক্রের প্রথম খণ্ড বা ব্রহ্মগ্রন্থি ছিন্ন হয়। একেই 'পিণ্ডে' মুক্তি বলে। এইভাবে সাধনার প্রাথমিক স্তর অতিক্রান্ত হলে ঊর্ধ্বগামী কুণ্ডলিনীশক্তি মণিপুরচক্রের তেজস্তত্ত্ব অতিক্রম করে হৃদয়ে অনাহতচক্রের মরুৎতত্ত্বে বা বায়ুতত্ত্বে উন্নীতা হন। এখানে 'সঃ অহং' বা 'অহং সঃ' অর্থাৎ 'হংসঃ' এই পদ বা শব্দ অনাহতভাবে আপনাআপনি ধ্বনিত হচ্ছে। 'হংসঃ' এই পদ নিজের থেকে অনাহতভাবে জপিত হয় বলেই একে অজপাগায়ত্রী বলে। সেইজন্য 'হংসঃ'কে 'পদ' বলা হয়। এখানেই জীবাত্মার অবস্থান। এখানেই আত্মস্বরূপ দর্শনের ফলেই জীবাত্মার অহং চেতনার অবসান হয়। জীব তখন শিবে উন্নীত হন অর্থাৎ শিবময় হয়ে ওঠেন এবং শিবস্বরূপ জীবের 'সোঽহং' জ্ঞানের উদয় হয়। কুণ্ডলিনীশক্তি অনাহতচক্রের বায়ুতত্ত্ব ভেদ করে বিশুদ্ধচক্রের ব্যোমতত্ত্বে বা আকাশ-তত্ত্বে উন্নীতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃকাচক্রের দ্বিতীয় খণ্ড বিষ্ণুগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। একেই 'পদে' মুক্তি বলে উল্লেখ করা হয়। এখানেই সাধনার দ্বিতীয় সোপানের অবসান। বিশুদ্ধচক্রের আকাশতত্ত্ব অতিক্রান্ত হয়ে অর্থাৎ জাগতিক পাঞ্চভৌতিকতত্ত্ব অতিক্রম করে ঊর্ধ্বমুখী কুণ্ডলিনীশক্তি মনস্তত্ত্বস্বরূপ আজ্ঞাচক্রে উপনীতা হন। এরই

উপরে মহাজ্যোতির্ময় প্রণব, তদুপরি শ্বেতবর্ণ নাদ এবং তার উপরে অমূর্ত বিন্দুর অবস্থান। এই বিন্দু একাধারে সূক্ষ্ম ও স্থূল—সকল রূপের আধার। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করেই স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক দিগন্তপ্রসারী নিখিল বিশ্বে অন্তহীন অনন্তরূপের বিস্তার। আবার সমগ্র বিশ্বের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও স্থূল থেকে স্থূলতম যাবতীয় রূপের মধ্যগত কেন্দ্রীয় বিন্দু এই রূপ। এই রূপ অচিন্ত্যনীয়, অনির্বচনীয় ও অবর্ণনীয়। সেইজন্য 'বিন্দু'কে 'রূপ' অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে। কুণ্ডলিনীশক্তি মনস্তত্ত্বস্বরূপ আজ্ঞাচক্র ভেদ করলেই মাতৃকাচক্রের তৃতীয় খণ্ড রুদ্রগ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়। একেই 'রূপে' মুক্তি কথিত হয়েছে। এখানেই সাধনার পরিসমাপ্তি। তারপর ঊর্ধ্বগামিনী কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারচক্রে পরমশিবের সঙ্গে মিলিতা হন। একেই বলে 'রূপ' থেকে 'রূপাতীতে' উত্তরণ। 'রূপাতীত' অবস্থা বোঝাতে 'নিরঞ্জন'কেই নির্দেশ করা হয়েছে।

নিম্নে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মেরুদণ্ড-মধ্যস্থিত বিভিন্ন নাড়ী ও ষট্চক্রের অবস্থান এবং তত্রস্থ মাতৃকাবর্ণ-সমূহ, দেবতাবৃন্দ ও তাঁদের শক্তিগণ সম্পর্কিত আলোচনার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলুম,

"জীবশরীরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে ঐ মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী সুষুম্না নাম্নী এক নাড়ী আছে। এই সুষুম্না নাড়ী অগ্নিস্বরূপা এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী। অধোভাগে মূলাধারে ইহার মুখ ধুস্তুর পুষ্পের ন্যায় বিকশিত। এই সুষুম্না নাড়ী মধ্যেই সমুদায় চক্র সন্নিবেশিত আছে। সুষুম্না নাড়ীর বামভাগে অমৃতময়ী চন্দ্রস্বরূপা ঈষৎ শুক্লবর্ণা ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণভাগে বিষস্রাবিণী সূর্য্যস্বরূপা রক্তবর্ণা পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী ঐরূপ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। ইড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা ও সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী। আজ্ঞা-চক্রে এই নদীত্রয় মিলিত থাকিয়া পশ্চাৎ পরস্পর পৃথক্ হইয়া পুনর্ব্বার

মূলাধারচক্রে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী ও মূলাধারচক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা যায়। মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রিণী নাড়ী; তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী চিত্রিণী নাড়ী রহিয়াছে। এই চিত্রিনী নাড়ীর মধ্যে মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখবিবর বা ব্রহ্মদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিব পর্যন্ত বিস্তৃত আর একটি নাড়ী আছে। এই নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলে। কেহ কেহ চিত্রিনী নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলেন। সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থিত সমুদায় পদ্ম এই উভয় নাড়ীতেই গ্রথিত রহিয়াছে। সমুদায় চক্রই এই নাড়ীর গ্রন্থিস্বরূপ। এই ব্রহ্মনাড়ীর স্থূলতা একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ হইবে। পদ্ম সমুদায়ও এইরূপ সূক্ষ্ম; কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ভাবনা হয় না বলিয়া চতুরঙ্গুলি পরিমিত কল্পনা করিয়া ভাবনা করিতে হয়। পদ্ম সমুদায় যদিও অধোমুখ ও মুদিত আছে, তথাপি ভাবনার সময় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা ঊর্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।... এই সমুদায় অধোমুখ পদ্মের নিম্নে ঊর্ধমুখ আর একটি করিয়া পদ্ম আছে। তন্মধ্যে মূলাধারপদ্মের নিম্নে যে ঊর্ধমুখ পদ্মটি আছে, উহা তড়িৎপ্রভশক্তিগণ-সমন্বিত, রক্তবর্ণ ও সহস্রদল।

গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে মূলাধারপদ্ম আছে। এই পদ্ম চতুর্দল;....। এই পদ্মপত্রচতুষ্টয় রক্তবর্ণ; এই পত্রচতুষ্টয়ে পূর্বদল হইতে ক্রমশঃ দলে দলে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বং শং ষং সং এই চারটি মাতৃকাবর্ণ আছে। এবং এই পত্রচতুষ্টয় ক্রমশঃ পূর্বপত্র হইতে উত্তরস্থ পত্র পর্য্যন্ত ক্রমে পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ ও যোগানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছেন। ....এই পদ্মের মধ্যস্থলে নবপল্লবের ন্যায় বর্ণ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তড়িদ্বর্ণা মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলয়কৃতি হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পদ্ম ও স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে সেই ব্রহ্মবিবরও অধোভাগে আছে। রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল, এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ন্যায় রহিয়াছে। এই

ত্রিকোণে রক্তবর্ণ কন্দর্পবায়ু বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দিকে অষ্টবজ্র-বিভূষিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল। ইহাতে লঁ বীজ এবং ঐ বীজের মধ্যে শুভ্রহস্তি-বাহন পৃথিবী আছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে প্রথমশিবস্বরূপ চতুর্ভুজ ব্রহ্মা ও সাবিত্রী শোভা বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে চতুর্ভুজা রক্তবর্ণা ডাকিনী শক্তিও আছেন। এই মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্ হইয়াছে।

মূলাধারের উপরিভাগে লিঙ্গমূলের সম-সম স্থানে ব্রহ্মনাড়ীতে পদ্মের ন্যায় গ্রথিত স্বাধিষ্ঠানচক্র, ইহা ষড়্দল। এই পদ্মের কর্ণিকা রক্তবর্ণ ও পদ্ম সমুদায় বিদ্যুদ্বর্ণ। পূর্বদিক্ হইতে ক্রমশঃ বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ ষড়্দলে আছে। প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্বনাশ ও ক্রূরতা, এই ছয়টি বৃত্তিও ঐরূপে ছয় দলে রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যেস্থিত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতা আছেন। বিষ্ণু নীলবর্ণ ও চতুর্ভুজ। সম্মুখে নীলবর্ণা রাকিনীশক্তি, বঁ এই বরুণবীজ, এবং ঐ বীজের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল ও শুভ্রমকর-বাহন বরুণ রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে নাভিমণ্ডলের পশ্চাতে মনিপুর নামক মেঘবর্ণ দশদল পদ্ম রহিয়াছে। পূর্ব হইতে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ ক্রমশঃ দশ দলে রহিয়াছে। এই বর্ণগুলি নীলবর্ণ। এতদ্ব্যতীত লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা ও ভয়, এই দশটি বৃত্তিও ক্রমশঃ দশ দলে আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে রঁ বীজ এবং ঐ বীজ মধ্যে স্বস্তিকত্রয় বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ও তাঁহার শক্তি ভদ্রকালী শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই রুদ্র বরাভয়-মুদ্রাযুক্ত-ভুজদ্বয়-বিভূষিত, সিন্দুরবর্ণ ত্রিলোচন, বৃদ্ধ ও ভস্মবিভূষিত-শরীর। ইহার সন্নিধানে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পীতভূষণভূষিতা, পীতবসনা, চতুর্ভুজা, মদমত্তচিত্তা লাকিনী শক্তি শোভা পাইতেছেন। এই পদ্মের উপরিভাগে ভানু-ভবন ও সূর্যমণ্ডল

রহিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদায় অমৃত ক্ষরণ হয় এই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হইয়া থাকে।

এই মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয়মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান ঊর্ধমুখ অষ্টদল কমল। তাহার উপরি অনাহতচক্র নামে রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম আছে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ সিন্দুরবর্ণ বর্ণ যথাক্রমে দ্বাদশ দলে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশ দলে আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ত্রিকোণমণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণশক্তি বলিয়া থাকে। এই ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন। ইঁহার সন্নিধানে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। এই ঈশ্বরই নারায়ণ ও হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ, দ্বিভুজ এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইঁহার নিকট কাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও তাঁহার চারি হস্তে পাশ, পানপত্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধার্দ্র-হৃদয়া, মত্তা ও অস্থিমালা-বিভূষিতা। এই স্থানে কালরাত্রি প্রভৃতি অনেকগুলি শক্তি আছেন। এই চক্রে যঁ এই বায়ুবীজ এবং তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ-মণ্ডল, গোলাকার বায়ুমণ্ডল ও কৃষ্ণসার-বাহন চতুর্ভুজ পবন শোভা পাইতেছেন। এই চক্রের মধ্যে নির্বাত-দীপ-কলিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভারতীস্থান নামক ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণের এক এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদায় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ পূর্বাদিক্রমে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম সপ্তদলে এই সপ্তস্বর, অষ্টমদলে বিষ; তৎপরবর্তী সপ্তদলে হুঁ, ফট্‌,

বৌষট্‌, বষট্‌, স্বধা, স্বাহা ও নমঃ এই সাতটি মন্ত্র এবং শেষদলে অমৃত আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে সকলেরই মূলমন্ত্র আছে। এই স্থানে বিদ্যুদ্বর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধরমণ্ডলও অবস্থান করিতেছেন। এই চক্রে হঁ এই আকাশবীজ এবং তন্মধ্যে স্বচ্ছ গোলাকার আকাশমণ্ডল ও শ্বেতহস্তীতে আরূঢ় শুক্লবস্ত্র-পরিধান আকাশ আছেন। আকাশের চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, ইহাকেই সদাশিব বলা যায়। ইনি শুক্লবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, দশভুজ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান। ইহার নিকট শুক্লবর্ণা ও পীতবসনা শাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে।

এই চক্রের উপরি তালুমূলে ললনাচক্র নামে একটি গুপ্ত চক্র আছে। এই পদ্ম রক্তবর্ণ ও দ্বাদশদল। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম ও ঊর্মি, এই দ্বাদশটি বৃত্তি আছে। কোন কোন তন্ত্রে ললনাচক্রের পরিবর্তে কালচক্রের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহার উপর ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র নামক শুভ্র দ্বিদল কমল। ....এই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে হং ক্ষং এই দুইটি রক্তবর্ণ বর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে লঁ এই বর্ণও গুপ্ত রহিয়াছে। দুই পত্রে ও কর্ণিকায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ আছে। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে প্রণবাকৃতি তেজোময় ইতর নামক লিঙ্গ আছেন। এই স্থানে হংসরূপ পরশিব ও তাঁহার শক্তি সিদ্ধকালী রহিয়াছেন। ইহা যঁ বীজ ও বায়ুর আলয়। ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রে শুক্লবর্ণা ষন্মুখ-সুশোভিতা চতুর্ভুজা হাকিনী শক্তি রহিয়াছেন। তাঁহার চারি হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালা। এই চক্রকে পরমকুল বলা যায়। এই চক্রে মন ও হকারার্দ্ধ আছে। এই চক্রকে মুক্তত্রিবেণীও বলে। কারণ এই স্থান হইতে গঙ্গা, যমুনা

সরস্বতীরূপা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্ হইয়া মূলাধার পর্যন্ত গমন করিয়াছে।

ইহার উপরিও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম মনশ্চক্র। ইহা ষড়্দল পদ্ম। ইহার এক এক দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন, এই কয়েকটি বৃত্তি যথাক্রমে আছে।

ইহার উপরিভাগে আরও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম সোমচক্র। এই সোমচক্র ষোড়শদল। এই ষোড়শদলকে ষোড়শ কলা বলা যায়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম মৃদুতা, তৃতীয় কলার নাম ধৈর্য্য, চতুর্থ কলা বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, ষষ্ঠ কলা সম্পৎ, সপ্তম কলা হাস্য, অষ্টম কলা রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা সুস্থিরতা, দ্বাদশ কলা গাম্ভীর্য, ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ঔদার্য্য এবং ষোড়শ কলা একাগ্রতা।

ইহার উপরি নিরালম্বপুরী। ....এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপশিখা-সদৃশ জ্যোতির্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরি শ্বেতবর্ণ নাদ, তদুপরি বিন্দু। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখ সহস্রদল কমলের নিম্নে একটি ঊর্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম রহিয়াছে। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে বিদ্যুৎ-সদৃশ অ-ক-থাদি ত্রিকোণ রেখা আছে। ইহার মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর সীমা। ইহার উপরি নানাবর্ণ অধোমুখ সহস্রদল কমল। এই দ্বাদশদলের উপরি সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনীশক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। পরমশিব মহাকাশরূপী, ইনিই পরমাত্মা,—ইনিই অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যস্বরূপ। ....উক্ত দ্বাদশ-দল কমলের উপরি সহস্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ও ত্রিকোণ অ-ক-থাদি রেখা আছে ; তন্মধ্যে নাদবিন্দু। এই নাদবিন্দু-রূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছে। এই হংসপীঠের

উপরি গুরুপাদুকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই সকলের গুরুচিন্তার স্থান। গুরুর পাদপীঠস্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণযুগল শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাস্বরূপ।

এই সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে অমা-নাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। এই অমাকলা রক্তবর্ণা, নির্মলা, বিদ্যুৎসদৃশ তেজস্বিনী, পদ্ম মৃণাল-তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, ও অধোমুখী। এই অমাকলাই চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে।

অমাকলার ক্রোড়ে নির্বাণকলা। ইহাও অমাকলার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিময়ী। এই নির্বাণকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। এই নির্বাণকলার ক্রোড়ে পরমনির্বাণশক্তি আছেন। ইহাও সূর্য্যসদৃশদীপ্তিমতী, অতীব সূক্ষ্মা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশিকা। ইহার উপরি বিন্দু ও বিসর্গশক্তি আছেন। ইহাই নিত্য-আনন্দ স্থান ও নিখিল আনন্দের মূল। ...ইহার উপরি শিবের সপ্তম মুখ অব্যক্ত। ষড়াম্নায় পর্য্যন্তই উপদেশ প্রচারিত আছে। সপ্তমাম্নায়ের উপদেশ সচরাচর প্রকাশিত নাই। এই সহস্রদল কমলের প্রত্যেক পত্রে অ-ক-থাদি বর্ণ সমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। মূলাধার প্রভৃতি চক্র সমুদায়ে অথবা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় পদার্থ আছে, এই স্থানে তৎসমুদায়ই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে।"*

এখানে স্মরণীয়, মূলাধারচক্রে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হয়ে যখন বিভিন্ন চক্রাদি ভেদ করে ঊর্ধ্বে উত্থিতা হন, তখন চক্রস্থিত অধোমুখ

* উদ্ধৃত অংশটি পরমারাধ্য সশক্তিক গুরুদেব শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং সশক্তিক পরম গুরুদেব ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন ও সশক্তিক পরাপর গুরুদেব ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক বিস্তৃত টীকা-টিপ্পনীসহ অনূদিত "মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্" গ্রন্থের 'প্রথম খণ্ডে'র 'পঞ্চমোল্লাসে'র ৮৭ সংখ্যক টীকায় বর্ণিত ষট্চক্র-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা থেকে গৃহীত। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করলে মূলগ্রন্থ পাঠ করে এই সম্পর্কে বিষদ্ভাবে অবগত হতে পারেন।

পদ্মদলসমূহ ঊর্ধ্বমুখ হয় ও চক্রস্থ মাতৃকাবর্ণসমূহ, বৃত্তিগুলি, বীজসমূহ, দেবতাবৃন্দ ও তাঁদের শক্তিগণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুই কুণ্ডলিনী-শক্তি মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়ে বীজাকারে পরবর্তী চক্রে অবস্থান করেন। এক চক্র পরিত্যাগ করে কুণ্ডলিনাশক্তির পরবর্তী চক্রে ঊর্ধ্বগমনকালে নিম্নস্থ চক্রের পদ্মদলগুলি আবার আধোমুখ ও বর্তমান চক্রের পদ্মদলগুলি বিকশিত হয়। এইভাবে মূলাধারচক্র, স্বাধিষ্ঠানচক্র, মণিপুরচক্র, অনাহতচক্র, বিশুদ্ধচক্র, আজ্ঞাচক্র প্রভৃতি সমস্ত চক্র অতিক্রম করে এই শক্তি যখন সহস্রারচক্রে উপনীতা হন, তখন সকল চক্রস্থিত মাতৃকাবর্ণসমূহ, বৃত্তিগুলি, বীজসমূহ, দেবতাবৃন্দ ও তাঁদের শক্তিগণ সমস্তই তাঁর সূক্ষ্মশরীরে বীজকারে বিদ্যমান থাকেন। সহস্রার-চক্রে পরমশিবের সঙ্গে কুণ্ডলিনীশক্তির পরম মিলনের পরে এই শক্তির অধোগমনকালে তাঁর দেহস্থিত মাতৃকাবর্ণসমূহ, বৃত্তিগুলি, বীজসমূহ, দেবতাবৃন্দ ও তাঁদের শক্তিগণ প্রভৃতি সমস্তই পুনরায় স্ব স্ব চক্রে আবির্ভূত হন এবং তাঁর চক্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মদলসমূহ যথাক্রমে নিম্নমুখ হতে থাকে। এইরূপে একের পর এক সকল চক্র পরিত্যাগ করে কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধারচক্রে উপস্থিত হয়ে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে সার্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করে অধোমুখে ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধ করে পুনরায় নিদ্রিতা হন। [ক্রমশঃ

সনাতন-হিন্দুধর্ম

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মোক্ষ-সাধনই হিন্দুর চরম লক্ষ্য। আর সার্বিক-ত্যাগের মধ্য দিয়েই এই মোক্ষ লাভ করা যায়। সার্বিক-ত্যাগ-সাধনা বা যোগ-সাধনার জন্যই আগে ধর্ম, অর্থ ও কাম সাধনার মধ্য দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রয়োজন।

ধর্ম অর্থাৎ জীবন ধারণ না করলে সাধনা চলবে কার ওপর দাঁড়িয়ে? তাই সাধনার জন্যও জীবন-ধারণ প্রয়োজন। আর জীবন ধারণ করতে হলে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন। তাই খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য সেযুগে সকলকেই কর্ম করতে হত। এর পরেই প্রশ্ন আসে, এই জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য কি? হিন্দু কি কেবল জীবন-ধারণের জন্যই জীবন ধারণ করবে? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য তার আছে? এই প্রশ্নের উত্তর সেযুগে অধ্যয়নের মাধ্যমে পাওয়া যেত। কাজেই প্রতিটি হিন্দুকে সেযুগে অধ্যয়ন করতে হ'ত। বিভিন্ন বেদ অধ্যয়ন করে এবং আচার্য গুরুর উপদেশ শ্রবণ করে এই অধ্যয়ন বৈদিক-যুগে সম্পন্ন হ'ত। 'বেদ' শব্দের অর্থ জানা বা জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞান-মূলক-সমস্ত-গ্রন্থরাজিই এক অর্থে বেদের অন্তর্ভুক্ত। এই বেদ বা জ্ঞানমূলক-গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে জানা যেত,—জীবন-ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য মোক্ষ-সাধন: আর মোক্ষ-সাধনের একান্ত অন্তরায় ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা। অধ্যয়নের ফলে আরো জানা যেত,—ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করা খুব কঠিন ব্যাপার; কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করবো বললেই ত্যাগ করা যায় না; দীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ত্যাগের অভ্যাস আয়ত্ব করলে এবং কামনা-বাসনার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ কামনা-বাসনার পূরণে যে চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয় না সেটা

বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলে তবেই কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করা সহজ হয়। কামের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির জন্যই সেযুগে কাম-সাধনা করতে হ'ত। তবে এক্ষেত্রে সুগভীর কাম-পঙ্কে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কা থাকে। অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ-সাধনার জ্ঞান দ্বারা কাম-সাধনা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে আর কাম-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু খাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হবার জন্যই কাম-সাধনার আগে অর্থ-সাধনা করতে হ'ত।

অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্থ-সাধনার ক্ষেত্রে এবং যোগানুষ্ঠানের মাধ্যমে মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্রে কঠোর সংযম প্রয়োজন। কৈশোরে অধ্যয়নে স্বাভাবিক অনুরাগ আসে না; কঠোর শাসনের মধ্যে অন্যান্য কামনা-বাসনার নিবৃত্তি সাধিত হলে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্থ-সাধনা প্রকৃত ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। এখানেই রয়েছে অর্থ-সাধনার ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রশ্ন। আবার নানাবিধ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা. কাম-লালসার নিবৃত্তি সাধিত না হলে যোগানুষ্ঠানের মাধ্যমে মোক্ষ-সাধনা ফলপ্রসূ হয় না। তাই এখানেও, মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্রেও সার্বিক-ত্যাগের প্রশ্ন রয়েছে। আর কাম-সাধনার ক্ষেত্রে চরম-লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হবার জন্য, সুগভীর কাম-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে হাবুডুবু না খাবার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। অসৎ-কর্মানুষ্ঠানের আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে সৎ-কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাম-সাধনাকে অগ্রসর করাতে পারলে চরম লক্ষ্য মোক্ষ-সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তাই কাম-সাধনা আসলে ছিল ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের সাধনা।

বৈদিক-যুগের শেষভাগে। চতুর্বর্গ-সাধনার ধর্মকে জীবনের প্রথম স্তরে, অর্থকে জীবনের দ্বিতীয় স্তরে, কামকে জীবনের তৃতীয় স্তরে এবং মোক্ষকে জীবনের চতুর্থ বা শেষ স্তরে প্রাধান্য দিয়ে হিন্দুর সমগ্র-জীবন-সাধনাকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করা হয়েছিল।

জীবনের প্রথম স্তর শৈশব। এই শৈশবে শিশু নিজ-প্রচেষ্টায় খুব বেশী কিছু করে না। পিতার সঞ্চিত সম্পদে মাতার পরিচর্যায়

শিশু বেড়ে ওঠে মাত্র। সেইজন্য জীবনের এই স্তরকে আশ্রম-সাধনার বাইরে রাখা হয়েছিল। এই স্তরে শিশু চতুর্বর্গের শুধু ধর্ম বা জীবন-ধারণকে অবলম্বন করে বর্ধিত হ'ত।

কৈশোরের প্রারম্ভে কিশোর গুরু বা আচার্যের গৃহে অধ্যয়নের জন্য গমন করতো। সেখানে আচার্যের নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করে কিশোর অধ্যয়ন করতো। এই স্তরে ধর্ম বা জীবন-ধারণের জন্য কিশোরকে কিছুটা সচেষ্ট থাকতে হ'ত। তবে এই স্তরে কিশোরের প্রধান-সাধনা হ'ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক অধ্যয়ন—অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্থ বা জীবন-ধারণের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন। এটাই। ছিল চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

যৌবনের প্রারম্ভে আচার্য-গৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে যুবক পিতা-মাতার কাছে ফিরে আসতেন এবং বিয়ে-থা করে সংসার-জীবনে প্রবেশ করতেন। এই স্তরে যুবক কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করতেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিকে প্রতিপালন করতেন। জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে স্থির থাকার জন্য এখানে তিনি আগের ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে প্রাপ্ত 'অর্থ' বা জীবন-ধারণের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী সমস্ত কর্ম, কামনা-বাসনা ও ভোগ-সুখকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, ত্যাগের সঙ্গে ভোগ অভ্যাস করতেন, অসৎ-কর্মকে বর্জন করে সৎ-কর্মের অনুষ্ঠান করতেন। এই ভাবে যুবকের যৌবনের সিংহভাগ কাম-সাধনায় ব্যয় হ'ত। এটাই ছিল চতুরাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রম।

যৌবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে জীবন-সাধক আপন-সন্তান-সন্ততিদের গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করে পত্নীসহ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করতেন। লোকালয় থেকে দূরে অরণ্য-পরিবেশে জীবনের অন্তিম-সাধনা মোক্ষ-সাধনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সাধনায় রত হতেন। এই স্তরে সার্বিক-ত্যাগ-মূলক যোগানুষ্ঠানের সূচনা হ'ত। আগের আশ্রমগুলোর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এটাই উপলব্ধি করার চেষ্টা হ'ত যে, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার পূরণে অর্থাৎ ভোগে প্রকৃত অর্থাৎ

চিরস্থায়ী সুখ লাভ হয় না—সার্বিক-ত্যাগের মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থাৎ চিরস্থায়ী সুখ অর্জিত হয়, মোক্ষ লাভ হয়। এই স্তরে প্রকৃত প্রস্তাবে মোক্ষ-সাধনার প্রস্তুতিপর্ব চলতো।

মোক্ষ বা মুক্তি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবার পর বিগত-যৌবন জীবন-সাধক পত্নীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে যতি বা সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক যতি বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতেন এবং সার্বিক-ত্যাগের মধ্য দিয়ে যোগ-সাধনায় রত হতেন। সাধনার সিদ্ধিতে, অবশেষে, তিনি মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতেন।

এই ভাবে সমগ্র জীবনে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে প্রাক্-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'ধর্ম', ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 'অর্থ', গার্হস্থ্যাশ্রমে 'কাম' এবং বানপ্রস্থ ও যতি বা সন্ন্যাস আশ্রমে 'মোক্ষ' সাধনার মধ্য দিয়ে হিন্দুর সমগ্র জীবন-সাধনা পরিচালিত হ'ত। বাস্তবিক, এই চতুর্বর্গ ও চতুরাশ্রম সাধনার মতো এমন পূর্ণাঙ্গ-সাধনা আর হয় না। যে কোন ধর্মের যে কোন সাধনা এমন পূর্ণাঙ্গ কাঠামোর ওপর স্থাপিত না হলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

কাজেই দেখা গেল,—বৈদিক-যুগের হিন্দু-সাধনাও ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কোথাও সীমিত-ত্যাগ, কোথাও বা সার্বিক-ত্যাগ—এমনকি এই যুগে ভোগও ত্যাগকে বাদ দিয়ে ছিল না। [ক্রমশঃ]

অভিমান

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, এ্যাডভোকেট

মধু বসন্ত এলো বুঝি আজ
শত যুগ কামনায়,
যৌবন মুকুল ছড়াল সুরভি
মৃদুল দখিনা বায়।
প্রাণের পরশে স্বপন কমল,
মেলিল নীরবে শ্বেত-শতদল ;
অলি তাই এসে
শুধাল আবেশে—
বিরহ দিনের বারতা।
সলাজ হাসিতে উছলিত মুখ,
কুসুম চাহিল পিছন ও সমুখ ;
জানাল চকিতে
ব্যথাতুর চিতে—
গোপন মনের মমতা ॥
ঘোরে চারিধারে, ছোঁয় নাকো তারে,
কাছে এসে দূরে যায় বারে বারে ;
গুঞ্জন রবে
জাগে তার এবে—
হৃদয়ের অভিমান।
(তবু) বাধা নাহি মানে হৃদয় আবেগে,
কুসুমের পানে ধেয়ে যায় বেগে ;
ভুলিতে না পারে
চুমু দেয় তারে—
পরাণে মেশে পরাণ ॥

॥ ভ্রান্ত স্বপ্ন ॥

ধীরেন দেবনাথ এম. এস-সি., বি. এড্.

মাঘ মাস শেষ প্রায়। মধুমাস না এলেও কোকিল বঁধুয়ার অহর্নিশি উতলা করা কুহু ধ্বনি ঘোষণা করছে পলাশ ফোটা শিমূল রাঙা ফাল্গুনের আগমন বার্তা। প্রদীপ—নেভার আগে যেমন উজ্জ্বল শিখায় দব্‌দবিয়ে জ্বলতে থাকে তেমনি শীতঋতু অন্তর্হিত হবার পূর্বে কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঢেলে প্রকৃতিকে করে তুলেছে ভারাক্রান্ত। সুদীর্ঘ বাইশ ঘণ্টা ভ্রমণের পর গভীর রাতে আহারান্তে ক্লান্তিতে কাতর দেহখানি শীতল বিছানায় এলিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমোবার চেষ্টা করছি মাত্র। বিছানা গরম হলে সহসা কখন যে তন্দ্রাদেবীর মধুময় স্নিগ্ধ কর-পল্লবের স্নেহ পরশে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তা' সঠিকভাবে বল্‌তে পারবো না। তবে, রাতের নিদ্রাটা যে অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়েছে তা' হলফ করেই এক প্রকার বল্‌তে পারি।

হঠাৎ নেশা জাগানো একটা সুমিষ্ট গন্ধ আমার হু'চোখের সুখ নিদ্রাকে কেড়ে নিয়ে আমাকে দিল সজাগ করে। গন্ধটাকে যে কোন্ বিশেষণে বিভূষিত করবো তা' ঠিক মনে করতে পারছি না। এমন অপরিচিত গন্ধ আমি ইতিপূর্বে কখনও আস্বাদন করিনি। এ গন্ধ কিসের—কোথা থেকেই-বা আসছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বাইরে পাখীদের কাকলী-কূজন ও ভোর-সংকীর্তন আমায় বুঝিয়ে দিল যে ভোর হয়েছে। ঘরের ভিতর হু'চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই না দেখতে পেয়ে খোলা জানালাটার দিকে তাকাতেই আমার প্রসারিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো জানালার মধ্যে। কিন্তু ও কে! এই সাত সকালে কে একাকী দাঁড়িয়ে আছে জানালায়! আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেল্‌লাম। মুহূর্তের মধ্যে আমি এ পার্থিব জগতের সমস্ত মায়ামমতা,

স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলাম অদৃশ্য পূর্ব এক স্বপ্নরাজ্যে। যেখানে নেই কোন দুঃখ নেই কোন ক্রন্দন; নেই কোন বেদনা নেই কোন ছলনা। সেখানে সূর্য যায় না অস্তাচলে; ফোটা ফুল পড়ে না ঝরে। সেখানে আছে শুধু অফুরন্ত আনন্দ, শান্তি, ভালোবাসা, মধুমিলনের অনাবিল সুখানুভূতি; আছে শাশ্বত সৌন্দর্যের সমারোহ। সেথায় চির বসন্ত বিরাজমান। আমি যেন সেই স্বপ্ন-রাজ্যের একক রাজা। সেই স্বপ্নলোকে স্বপ্ন ঘোরে আমি দেখতে পেলাম সদ্য স্নাতা শ্বেত বসনে সুশোভিতা এক ষোড়শী আমার ছোট্ট কুটিরের জানালা পথে অপলক চেয়ে আছে আমার দিকে। অধরে তার আধো ফোটা রাঙা গোলাপের কামনা ভেজা হাসি; আঁখিতে তার করুণা বিগলিত দৃষ্টিবান; হাসিতে তার প্রেমোজ্জ্বল দ্যুতি। এ যেন এক অপরূপা স্বর্গীয় পারিজাত, যে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে তার প্রণয়ের শিকারী জালে আমারই অজান্তে। আমি চুম্বকের মতো আকর্ষিত হতে লাগলাম তার দুর্নিবার আকর্ষণে। আত্ম-সম্বরণ করতে না পেরে আমি এক নিমেষে ছুটে গেলাম জানালার কাছে। জানালা পথে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেল্‌লাম আমি আমার ক্ষণিকের দেখা স্বপ্ন-সুন্দরীকে। ভেঙে গেল স্বপ্ন আমার। কিন্তু হায়, এ কী! যাকে নিয়ে এতো স্বপ্ন দেখা, যাকে নিয়ে এতো কাব্যের ফুলঝুরি ঝরানো এতো আমার স্বপ্নরাজ্যের সুপরিচিতা সেই স্বপ্নের রাণী নয়। এ যে আমার নিত্য দেখা চিরপরিচিত শ্বেতফুলে সুশোভিত অনেক সাধের-'জুঁই ফুলের গাছটি।'

—:*:—

পূজারী

হরষিত দেবনাথ

ওরে—দেবালয়ের পূজারী !

কী মন্ত্রে ডাকিছ দেবতাকে ?

যে মুখে জপিছ মন্ত্র

শোধন করে কি ডাক তাঁকে ?

বাইরের মোহজাল থেকে

মনকে করেছ কি মুক্ত ?

হৃদয়-পরতে মুখের বাক্য

করিতে পেরেছ কি যুক্ত ?

যে মন্ত্রে ডাকিছ তুমি

দেবালয়ের অধি-দেবতাকে,

মন্ত্র বাক্যের সেই পরিভাষা

দিয়েছ কি বুঝিতে তাঁকে ?

জানি, তুমি পারিবেনা

এ প্রশ্নের জবাব দিতে ;

'তুমি কি বুঝেছ—মন্ত্র ?'

পারি তো এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে :

তুমি না বুঝিলে ভাষা

দেবতা কি বুঝিতে পারে ?

দেবতা চাহেন হৃদয় প্রসূণ

মন্ত্র বাক্যে তুষ্ট হ'তে সে নারে ।

মনের বাক্যে রচিয়ে মন্ত্র

যদিনা পূজিতে পারো ;

বুঝিতে যদি না পার মন্ত্র

মন্দির তা' হ'লে ছাড়ো ।

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—**বি. দেবনাথ**

পাত্র—(৩৩)(৫'-৬") এম. এস. সি. কেন্দ্রীয় সরকারের সাইন্টিফিক্ এ্যাসিষ্ট্যান্ট (১২০০), বনেদী পরিবার, সুস্বাস্থ্য। সুন্দরী পাত্রী হইলে দাবীর প্রশ্ন নাই।

পাত্র—(৩৫) (৫'-৩") লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাড্ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট, নবদ্বীপে বাড়ী আছে। স্বাস্থ্যবান, পাত্রীর সৌন্দর্যই একমাত্র বিচার্য বিষয়।

পাত্র—(৩২) (৫'-২") এম, এ প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত (১০০০), স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর ক্ষেত্রে দাবীর প্রশ্ন নাই।

পাত্র—(৩০) (৫'-৩") এম. এ. বি. টি. শিক্ষক (১২০০) চাকদহে নিজস্ব বাড়ী। বনেদী পরিবার, সুস্বাস্থ্য, শিক্ষিতা ও সুন্দরী পাত্রী চাই।

পাত্র—(২৪) (৫'-৬") কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (দেড়/দু'হাজার) নিজস্ব বাড়ী। অত্যন্ত সুপুরুষ। সুন্দরী পাত্রী চাই, অল্প শিক্ষিত পাত্রী হইলেও আপত্তি নাই।

পাত্রী—(২৭) (৫'-১") শ্যামবর্ণা, বি. ই. পরীক্ষায় ৩টি স্বর্ণ পদক প্রাপ্তা (যাহা একটি বিরল দৃষ্টান্ত) বর্তমানে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে গবেষণারতা। ইঞ্জিনীয়ার/ডাক্তার বা সমতুল্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (পাত্রীর এক ভগিনী এম. বি. বি. এস. ডাক্তার)।

পাত্রী—(২৬) (৫'-৩") এম. এ (1st class 2nd) প্রকৃত সুন্দরী। ডাক্তার/ইঞ্জিনীয়ার কিম্বা সমতুল্য প্রতিষ্ঠাবান পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা ও ভ্রাতা National Scholar.

পাত্রী—(২৯) (৫'-১") ব্যাঙ্ক কর্মচারী প্রথমা কন্যা। উচ্চ মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণা, শ্যামবর্ণা, অতীব শান্ত স্বভাবা, সূচী-শিল্প ও গৃহকর্মে সুনিপুণা। ব্যবসায়ী পাত্রে আপত্তি নাই।

[উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য বি. দেবনাথ, ৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬-এর সহিত যোগাযোগ করণীয়]

পাত্রী—(২৮/২৯) বি. এ. পাশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘাঙ্গী এবং গৃহকর্মে নিপুণা, শিক্ষিত চাকুরীজীবি বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পাত্রী আমার শ্যালিকা। পিতামাতা বর্ত্তমান এবং বাংলাদেশ ফরিদপুর জেলায় বাস করিতেছেন। নবদ্বীপে নিজস্ব বাড়ী আছে। যোগাযোগ করুন—শ্রীহরিদাস দেবনাথ। সুশীল জ্যোতি এভেনিউ, পোঃ প্রফুল্লকানন কলি-৭০০০৫৯।

পাত্রী—(২৫) (৫'-২") এম. এ., বি-এড পরীক্ষার্থিনী, ফর্সা ও সুশ্রী। উপযুক্ত পাত্র চাই। এবং

পাত্র—(২৯) (৫'-৬"), বিমান বাহিনীর কেরাণী-কর্পোর‍্যাল (১১০০-০০), বি. এ. পার্ট টু পরীক্ষা দিয়াছে, দ্বিতল বাড়ী। প্রকৃত ফর্সা ও সুশ্রী, অন্ততঃ এস. এফ. পাশ পাত্রী চাই। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীহরিমোহন দেবনাথ, ২নং সেণ্ট্রাল রোড, পোঃ নোনাচন্দনপুকুর, ২৪ পরগণা, ৭৪৩১০২।

পাত্র—(৩১) বি. এস-সি (ডিষ্টিং) বিজিনেস ম্যানেজমেণ্ট, এল. এল. বি. বেসরকারী ফার্মের ম্যানেজার (১৮০০ টাকা) পাত্রের জন্য সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ করুন—শ্রীনীলমণি নাথ, সুন্দিয়া হাউজিং এষ্টেট, কোয়ার্টার নং A/6, পোঃ জগদ্দল, ২৪ পরগণা।

মহাশয়,

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র 'শৈবভারতী'র জন্য দেওয়া আপনার গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ............................তারিখে শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনি অনতিবিলম্বে আট টাকা নিম্ন ঠিকানায় অথবা আমাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় আপনাকে 'শৈবভারতী' পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

শ্রীসুবল চন্দ্র দেবনাথ
সাধারণ সম্পাদক

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণেশচন্দ্র নাথ
৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৭

রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখপত্র

শৈবভারতী

নিয়মাবলী

১। বৈশাখ মাস হ'তে **শৈবভারতীর** বৎসর আরম্ভ। বৎসরের যে কোন মাস হ'তে গ্রাহক হওয়া যায়।

২। পত্রিকার সডাক বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা **আট টাকা**। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য **পঁচাত্তর পয়সা**। **আজীবন গ্রাহক চাঁদা একশত টাকা।**

৩। 'শৈবভারতী'তে প্রকাশার্থ রচনা নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪।৫ পৃষ্ঠার অনধিক) এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়। সম্পাদকমণ্ডলী প্রয়োজনবোধে রচনার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে পারবেন।

৪। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নন।

৫। বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা **পঞ্চাশ টাকা**, অর্ধ পৃষ্ঠা **ত্রিশ টাকা**, সিকি পৃষ্ঠা **কুড়ি টাকা**। এক বৎসরের জন্য বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। ব্লকের জন্য পৃথক খরচ দেয়। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে কার্যাধ্যক্ষ **শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র দেবনাথ**, ২০০, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬। শৈবভারতীতে প্রকাশার্থে রচনা পাঠাবার ঠিকানা—পত্রিকা সম্পাদক **শ্রীসুবোধকুমার নাথ**, গ্রাঃ পার্বতীপুর, পোঃ প্রীতিনগর, জেলা-নদীয়া, পিন—৭৪১২৪৭।

৭। গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা—কোষাধ্যক্ষ **শ্রীগণেশ চন্দ্র নাথ**, ৫৭এ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭।

৮। অন্যান্য খাতে অর্থ পাঠাবার ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক **শ্রীসুবলচন্দ্র দেবনাথ**, ৪৮, টালা পার্ক এভিনিউ, ফ্ল্যাট নং ১৮, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

বিঃ দ্রঃ : যাঁরা এককালীন **একশত টাকা** দিয়ে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হবেন, তাঁরা 'শৈবভারতী' বিনামূল্যে পাবেন।

বিজ্ঞপ্তি

৪ নম্বর ফরম অনুযায়ী মাসিক 'শৈবভারতী' পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ঘোষণা :—

১। প্রকাশনার স্থান : ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২

২। প্রকাশকাল : মাসিক

৩। মুদ্রকের নাম : শ্রীতাপস কুমার নাথ
(ক) নাগরিকত্ব : ভারতীয়
(খ) ঠিকানা : ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২

৪। প্রকাশকের নাম : শ্রীতাপস কুমার নাথ
(ক) নাগরিকত্ব : ভারতীয়
(খ) ঠিকানা : ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২

৫। সম্পাদকের নাম : শ্রীসুবোধ কুমার নাথ
(ক) নাগরিকত্ব : ভারতীয়
(খ) ঠিকানা : ২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২

৬। যাঁরা মালিকানা স্বত্বের
অন্ততঃ এক শতাংশের
অধিকের অংশীদার
তাঁদের নাম ও ঠিকানা : রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনী
২৩/১-এ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২

আমি, শ্রীতাপস কুমার নাথ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর : তাপস কুমার নাথ
[প্রকাশক]

তাং—১.৩.৮৩

ওঁ নমঃ শিবায়

শৈবভারতী

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৮৯

সম্পাদক—শ্রীসুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত

শ্রীশ্রীশিবগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শিবভক্ত্যুৎকর্ষনিরূপণম্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঋষয় উচুঃ

যদ্যেবং দেবতা বিঘ্নমাচরন্তি তনূভৃতাম্।
পৌরুষং তত্র কস্যাস্তি যেন মুক্তির্ভবিষ্যতি।
সত্যং সূতাত্মজ ব্রূহি তত্রোপায়োঽস্তি বা ন বা॥ ১৫

সূত উবাচ

কোটিজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ শিবে ভক্তিঃ প্রজায়তে।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি তেনাচরতি মানবঃ॥ ১৬
শিবার্পণাধিয়া কামান্ পরিত্যজ্য যথাবিধি॥ ১৭
অনুগ্রহাত্তেন শম্ভোর্জ্জায়তে সুদৃঢ়ো নরঃ।
ততো ভীতাঃ পলায়ন্তে বিঘ্নং হিত্বা সুরেশ্বরা॥ ১৮
জায়তে তেন শুশ্রূষা চরিতে চন্দ্রমৌলিনঃ।
শৃণ্বতঃ জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানদেব বিমুচ্যতে॥ ১৯
বহুনাত্র বিমুক্তেন যস্য ভক্তিঃ শিবে দৃঢ়া।
মহাপাপোপপাপৌঘকোটীগ্রস্তোঽপিমুচ্যতে॥ ২০
অনাদরেণ শাঠ্যেন পরিহাসেন মায়য়া।
শিবভক্তিরতশ্চেৎ স্যাদন্ত্যজোঽপি বিমুচ্যতে॥ ২১

অনুবাদ ঃ—

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন,—দেবতাগণ যদি এইভাবে মানবগণের বিঘ্নসাধনে তৎপর থাকেন, তাহলে কিভাবে তাদের মুক্তি হবে? সত্য করে বল হে সূতপুত্র, মানবগণের মুক্তিলাভের আর কোন উপায় আছে কিনা। ১৫ ॥

সূত বললেন,—কোটিজন্মার্জিত পুণ্যফলে মানবগণের শিবভক্তি জাগ্রত হয়, তাই তারা ইষ্টাপূর্তাদি কর্মসকল সম্পাদনকালে সেইরূপ আচরণ করে থাকে; অর্থাৎ, 'সবকিছু মহেশ্বরকে অর্পণ করছি' এই জ্ঞানে কামনাসকল পরিত্যাগ করে থাকে। ১৬-১৭ ॥ এতে শম্ভুর অনুগ্রহে শিবভক্ত নরগণ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে; ফলে সুরগণ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, তাঁরা (সুরগণ) ভীত হয়ে পলায়ন করেন। ১৮ ॥ এই কারণে শিবচরিত শ্রবণে সকলের অভিলাষ জন্মে এবং শিবচরিত শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, মুক্তি লাভ হয়। ১৯ ॥ বেশী আর কি বলব, যে ব্যক্তি শিবের প্রতি দৃঢ়-ভক্তি প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তি কোটি কোটি মহাপাতক ও উপপাতক দ্বারা অভিভূত হলেও মুক্তি লাভ করে থাকে। ২০ ॥ কি অনাদরে, কি শঠতায়, কি পরিহাসে, কি মায়াবশে যে কোন ভাবে শিবভক্তিতে রত হলে অন্ত্যজজাতিও মুক্তি লাভ করে থাকে। ২১ ॥

[ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

শিবরাত্রি। শিবপূজা শেষ করেছি। সামনে বিগ্রহ—শিবলিঙ্গ। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ভাবছি—

—ভাবতে ভাবতে মন চলে যায় সুদূর অতীতে, দ্বাপরযুগে।

শুনতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন,—আমি যদি বরদাতা শিবের অর্চনা না করি তাহলে কেউই আমার অর্চনা করবে না।

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-নিঃসৃত 'বরদাতা শিব' এই কথাটিই কেবল কানের মধ্যে বারবার বেজে চলে। ভাবি,—তাই তো, মহেশ্বর শিবই তো একমাত্র বরদাতা; আশুতোষ অল্পেই তুষ্ট হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের বর প্রদান করেন।

শিবরাত্রিতে নানান জন নানান কামনা নিয়ে শিবকে জল-বেলপাতা দিয়ে থাকেন, করে থাকেন শিবের আরাধনা। উপোস করে শিবকে জল-বেলপাতা দিয়ে কুমারী মেয়েরা প্রার্থনা করেন পতি-বর, নিঃসন্তান দম্পতি প্রার্থনা করেন পুত্র-বর, পিতা-মাতা প্রার্থনা করেন সন্তানের মঙ্গল-বর, গৃহস্থ প্রার্থনা করেন নানা-সুখ-সৌভাগ্য-বব, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া প্রার্থনা করেন পারলৌকিক শান্তি-বর, মুমুক্ষু-মানব প্রার্থনা করেন মুক্তি-বর।

শিবচতুর্দশীর রাতে বেলগাছে আশ্রয়গ্রহণকারী মহাপাপী ব্যাধের শিশির-সিক্ত গা ছুঁয়ে, তার অজান্তে, একটিমাত্র শিশিরে ভেজা বেলপাতা গাছের গোড়ায় অবস্থিত শিবের মাথায় পড়ায় মহেশ্বর শিব ঐ ব্যাধের প্রতি তুষ্ট হন এবং কেবলমাত্র তার জন্যই মৃত্যুর পর ঐ ব্যাধের আত্মাকে শিবদূত যমদূতকে নিবারণ করে শিবলোকে নিয়ে যান। —এ হেন আশুতোষকে জল-বেলপাতা দিয়ে অথবা তাঁর পূজা করে বর প্রার্থনা করলে, 'বরদাতা শিব' কি সেই বর না দিয়ে পারেন?

—সম্বিৎ ফেরে।

শিব-বিগ্রহকে আবার প্রণাম করে বর প্রার্থনা করি—হে মহেশ্বর! আমায় এমন বর দাও যাতে আমার মঙ্গল হয়; আমায় এমন বর দাও যাতে আমাদের 'শৈবভারতী'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের মঙ্গল হয়।

—:*:—

॥ শ্রীশ্রীগুরুগীতা ॥

আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বদুঃখভয়ং বিঘ্নং নাশয়েত্তাপহারকম্।
সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্* ॥ ১১১ ॥

পাঠান্তর :— *ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।

(এই গুরুগীতা) সর্বপ্রকার দুঃখ, ভয় ও বিঘ্ন নাশ করে ; তাপ (জন্ম, জরা ও মৃত্যুরূপ ত্রিতাপ) হরণ করে, সকল বাধা প্রশমন করে এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ (চতুবর্গ) প্রদান করে।

যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
কামিনাং কামধেনুশ্চ কল্পিতস্য সুরদ্রুমম্ ॥ ১১২ ॥

(গুরুগীতার পাঠক) যা যা কামনা করেন, তা তা নিশ্চিত প্রাপ্ত হন। (এই গুরুগীতা) কামীদের কামধেনু ও কল্পনাকারীদের সুরদ্রুম (কল্পবৃক্ষ) স্বরূপ।

চিন্তামণিং চিন্তিতস্য সর্ব্বমঙ্গলকারকম্।
জপেচ্ছাক্তশ্চ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবঃ।
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্* ॥ ১১৩ ॥

পাঠান্তর :—* ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।

হে দেবি! চিন্তিতের চিন্তামণিস্বরূপ, সর্বপ্রকার মঙ্গলকারী, সিদ্ধিপ্রদানকারী এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ (চতুবর্গ) দানকারী (এই গুরুগীতা) শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও সৌর জপ করবেন।

সংসারমলনাশার্থং ভবতাপনিবৃত্তয়ে।
গুরুগীতাম্ভসি স্নানং তত্ত্বজ্ঞঃ কুরুতে সদা ॥ ১১৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সংসাররূপ মল নাশের নিমিত্ত এবং ভবতাপ

(সংসারজ্বালা) নিবৃত্তির জন্য সর্বদা গুরুগীতারূপ সলিলে স্নান করে থাকেন।

স এব সদ্গুরুর্যঃ স্যাৎ সদসদ্ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি* ন সংশয়ঃ ॥ ১১৫ ॥

পাঠান্তর :—* বর্ণানি পত্রাণি চ।

যিনি সৎ ও অসৎ অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই সদ্গুরু। তাঁর (অবস্থিত) সমগ্র স্থানই পবিত্র, এতে সংশয় নেই।

স দেশঃ শুদ্ধো যত্রাসৌ গীতা তিষ্ঠতি দুর্ল্লভা।
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রপীঠে বসন্তি হি ॥ ১১৬ ॥

যে স্থানে এই দুর্লভা গুরুগীতা অবস্থান করেন, সেই দেশ পবিত্র। সেই ক্ষেত্ররূপ পীঠস্থানে সমস্ত দেবতা বাস করেন।

শুচিরেব সদা জ্ঞানী গুরুগীতাজপেন তু।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১১৭ ॥

আর গুরুগীতা জপের (বারংবার পাঠের) দ্বারা (সাধক) নিত্য শুচি ও জ্ঞানী হন, তাঁর দর্শনমাত্রই পুনর্জন্ম রহিত হয়।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নিজধর্ম্মো ময়োদিতঃ।
গুরুগীতাসমো নাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ১১৮ ॥

হে বরাননে! আমা কর্তৃক কথিত নিজ ধর্ম (জগদ্গুরুরূপে আমার মনোগত অভীপ্সা) সত্য, সত্য, পুনঃ সত্য। গুরুগীতার সমান সত্য সত্যই আর কিছুই নেই।

গুরুর্দ্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ১১৯ ॥

গুরু দেবতা, গুরু ধর্ম ও গুরুনিষ্ঠা (গুরুভক্তি) শ্রেষ্ঠ তপস্যা। গুরু থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই এবং গুরু (গুরুতত্ত্ব) থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছুই নেই।

ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যং সর্ব্বকুলন্তথা* ।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ১২০ ॥

পাঠান্তর :—* বংশং কুলং তথা ।

হে দেবি ! (গুরুভক্তের) মাতা ধন্যা, পিতা ধন্য, তথা সমস্ত কুল (পিতৃকুল, মাতৃকুল ও গৃহীর শ্বশুরকুল) ধন্য এবং (তাঁকে বক্ষে ধারণ করায়) বসুধাও ধন্যা হন। (এইরূপ) গুরুভক্তি অতি দুর্লভ।

শরীরমিন্দ্রিয়ং প্রাণা অর্থস্বজনবান্ধবাঃ ।
পিতৃমাতৃকুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২১ ॥

পাঠান্তর :—* শরীরমিন্দ্রিয়প্রাণা ।

হে দেবি ! গুরুই শরীর, ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়)* ও প্রাণসমূহ (পঞ্চপ্রাণ)** ; অর্থ, স্বজন ও বান্ধবগণ ; পিতৃকুল ও মাতৃকুল (তথা গৃহীপক্ষে শ্বশুরকুল), এতে সংশয় নেই ।

---

* ইন্দ্রিয় :—ইন্দ্রিয়সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত :—(ক) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়।

(ক) জ্ঞানেন্দ্রিয় :—বিশেষ ও সাধারণ ইন্দ্রিয় ভেদে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় :—১) চক্ষু, ২) কর্ণ, ৩) নাসিকা, ৪) জিহ্বা ও ৫) ত্বক্। এদের প্রথম চারটিকে বিশেষ ইন্দ্রিয় ও শেষেরটিকে সাধারণ ইন্দ্রিয় বলা হয়। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা স্বাদেন্দ্রিয় এবং ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। সাধারণত ইন্দ্রিয় বলতে এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কেই বোঝানো হয়।

(খ) কর্মেন্দ্রিয় :—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মত কর্মেন্দ্রিয়ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত :— ১) বাক্, ২) পাণি, ৩) পাদ, ৪) পায়ু ও ৫) উপস্থ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মিলিত ইন্দ্রিয় সংখ্যা সর্বসমেত দশ।

** প্রাণসমূহ :—মানবদেহ রক্ষা করবার জন্য যে পাঁচটি বায়ু একান্ত অপরিহার্য, তাদের পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু বলা হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ভেদে বায়ু বা প্রাণসমূহকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যে অপানবায়ু, নাভিতে সমানবায়ু, কণ্ঠে উদানবায়ু এবং সর্বদেহে ব্যানবায়ু পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। প্রাণবায়ুতে রক্তসঞ্চালন, অপানে আহার্যচালন, উদানে বমন উদগার প্রভৃতি শ্বাসাদি কার্য, সমানে পচন এবং ব্যানে সমস্ত শরীরে সামঞ্জস্য বা সমতা রক্ষিত হচ্ছে।

আজন্মকোট্যাং দেবেশি জপব্রততপঃক্রিয়াঃ।
তৎ সর্ব্বং সফলং* দেবি গুরুসন্তোষমাত্রতঃ ॥ ১২২ ॥

পাঠান্তর :—* তাসাং সর্ব্বফলং।

হে দেবেশি! কোটি জন্ম সম্পাদিত যে জপ, ব্রত, তপস্যা ও ক্রিয়া; গুরুদেবের সন্তোষমাত্রই, হে দেবি, সেই সকল সফল হয়।

বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।
গুরোঃ সেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥ ১২৩ ॥

যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে গুরুসেবা না করে, আমি সত্য সত্য বলছি, তারা মন্দভাগ্য।

গুরোঃ সেবা পরং তীর্থমন্যত্তীর্থমনর্থকম্*।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্ ॥ ১২৪ ॥

পাঠান্তর :—* নিরর্থকম্।

গুরুদেবের সেবাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ, অন্য তীর্থ অনর্থক। হে দেবি! সদ্‌গুরুর চরণকমল সমস্ত তীর্থের আশ্রয়।

ইদং রহস্যং নো বাচ্যং তবাগ্রে কথিতং ময়া।
সুগোপ্যঞ্চ প্রযত্নেন যেনাত্মানং প্রযাস্যসি ॥ ১২৫ ॥

আমা কর্তৃক তোমার নিকট কথিত এই (গুরুগীতা) রহস্য (অস্থানে) বলবে না ও সম্যক্ যত্ন সহকারে অতি গোপন রাখবে, যার দ্বারা আত্মস্বরূপে গমন (আত্মজ্ঞান লাভ) করবে।

ষড়াননগণেশাদিবৈষ্ণবানাঞ্চ পার্ব্বতি।
মনসাপি ন বক্তব্যং মম সান্নিধ্যকারকম্ ॥ ১২৬ ॥

হে পার্বতি! (ভক্তিবিহীন হলে) ষড়ানন (কার্তিক), গণেশ প্রভৃতির (স্বজন) এবং বৈষ্ণবগণ প্রভৃতির (উপাসক) নিকটও আমার সান্নিধ্যকারক (এই গুরুগীতা) মনে মনেও বলবে না (বলার চিন্তা পর্যন্ত করবে না)।

অতীবচিত্তশান্তে চ* শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতে।
প্রবক্তব্যমিদং দেবি মমাত্মাসি সদা প্রিয়ে** ॥ ১২৭ ॥

পাঠান্তর ঃ— *অতীবশান্তচিত্তে চ, **মম ভক্তায় চ প্রিয়ে।

হে দেবি! হে প্রিয়ে! তুমি সর্বদা আমার আত্মস্বরূপা; অতীব শান্তচিত্ত ও শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত ব্যক্তিকেই এই (গুরুগীতা) বলবে।

অভক্তে বঞ্চকে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।
মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগীতাভিধং প্রিয়ে ॥ ১২৮॥

পাঠান্তর ঃ— *গুরুগীতা কদাচন।

হে প্রিয়ে! ভক্তিহীন, প্রতারক, ধূর্ত, পাষণ্ড ও নাস্তিক ব্যক্তিকে এই গুরুগীতা মনে মনেও বলবে না (বলার চিন্তা পর্যন্ত করবে না)।

আগমো নিগমশ্চাপি নির্ব্বাণশ্চ ত্রিধাগমঃ।
তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশি গুরুগীতা ময়োদিতা ॥ ১২৯ ॥

আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র তিন প্রকার ঃ—আগম, নিগম ও নির্বাণ*। হে দেবেশি! আমার দ্বারা তা থেকে উদ্ধৃত (সঙ্কলিত) হয়ে এই গুরুগীতা উদিত বা প্রকাশিত হয়েছে।

* সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—১) আগম, ২) নিগম ও ৩) নির্বাণ।

১) **আগম** ঃ—আগম তন্ত্রে বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী এবং মত বাসুদেব সমর্থিত। "রুদ্রযামলবচনে" বলা হয়েছে,

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদগম উচ্যতে ॥"

অর্থাৎ শিব বক্ত্রসমূহ বা মুখগুলি থেকে আগত, গিরিজা বা গিরিকন্যা পার্বতী মুখে গত ও শ্রীবাসুদেবের মত; সেইজন্য একে "আগম" বলা হয়। "আগতং" "গতং" ও "মতং" এই শব্দ তিনটি আদ্যক্ষর 'আ', 'গ' ও 'ম' একত্রিত করে "আগম" শব্দ গঠন করা হয়েছে। জগজ্জননী পার্বতী জিজ্ঞাসু হয়ে ভক্তিসহকারে দেবাদিদেব মহাদেবকে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করেছেন, মহাদেব সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়ে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করেছেন। পরম পিতা

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ ১৩০ ॥

হে দেবি! শিষ্যের বিত্ত অপহারক গুরু বহু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারক (সংসারদুঃখনিবারক) এইরূপ (ব্রহ্মজ্ঞানী) গুরু দুর্লভ।

বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুম্‌॥ ১৩১ ॥

আমি ভেদাতীত (ভেদজ্ঞানের অতীত, বিকাররহিত), সচ্চিদানন্দ (সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ পরম ব্রহ্ম) শ্রীমদ্‌গুরুদেবকে বন্দনা করি।

বক্ত্রী ভগবানের যাবতীয় উক্তি স্বয়ং নারায়ণের সমর্থনপুষ্ট। শিবোক্ত এই "**শ্রীশ্রীগুরুগীতা**" আগম তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত।

২) **নিগম** ঃ--নিগম তন্ত্রে বক্তা পার্বতী, শ্রোতা মহেশ্বর এবং মত বাসুদেব সম্মত। "আগমদ্বৈতনির্ণয়বচনে" বলা হয়েছে,

"নির্গতা গিরিজাবক্ত্রাদ্‌ গতশ্চ গিরিশশ্রুতৌ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে॥"

অর্থাৎ গিরিজা বা পার্বতী বক্ত্র বা মুখ থেকে নির্গত, গিরিশকর্ণে গত ও শ্রীবাসুদেবের অভিমত; এইজন্য একে "নিগম" বলা হয়েছে। এখানেও 'নির্গতা', 'গতং' ও 'মতং' এই শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর 'নি', 'গ' ও 'ম' একত্রিত করে "নিগম" শব্দ গঠিত হয়েছে। নিগমে জিজ্ঞাসু সর্বান্তর্যামী মহাদেবের তন্ত্রশাস্ত্র-সম্পর্কীয় প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়েছেন সর্বান্তর্যামিনী ত্রিলোকেশ্বরী পার্বতী, স্বয়ং বাসুদেব সেই অভিমতকে সমর্থন করেছেন।

৩। **নির্বাণ** ঃ--তন্ত্রসাধনার মূল লক্ষ্য নির্বাণ। তন্ত্রসাধক ভূমিতে পাদচারণা করেন সত্য, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি সর্বদা সন্নিবিষ্ট থাকে ঊর্ধ্বলোকে ভূমার দিকে। বেদান্তে বলা হয়েছে যে, সাধকের অহংবোধ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হলে তিনি পরমব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে অদ্বৈতভূমিতে স্থিতিলাভ করেন এবং "সোঽহং" [সঃ অহম্‌, অহং সঃ] অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আমি, আমিই ব্রহ্ম' এই ভাবের উদয় হয়। এইরূপ ব্রহ্মময় উচ্চকোটির সাধকই পুনঃ পুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যু প্রভৃতি জাগতিক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

সংসারসাগরসমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং,
ব্রহ্মাদিদেবমুনিপূজিতসিদ্ধমন্ত্রম্ ।
দারিদ্র্যদুঃখভয়শোকবিনাশমন্ত্রং,
বন্দে মহাভয়হরং গুরুরাজমন্ত্রম্ ॥ ১৩২ ॥

সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র মন্ত্র ; ব্রহ্মাদিদেবতা ও মুনিগণ পূজিত সিদ্ধমন্ত্র ; দারিদ্র্য, দুঃখ, ভয় ও শোকের বিনাশমন্ত্র ; মহাভয়হর এই গুরুরাজমন্ত্রকে আমি (পুনঃ পুনঃ) বন্দনা করি ।

॥ ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে শিবপার্ব্বতীসংবাদে
শ্রীশ্রীগুরুগীতাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥
॥ ওঁ তৎ সৎ ওম্ ॥

শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রান্তর্গত শিব-পার্বতী কথোপকথনে
শ্রীশ্রীগুরুগীতা নামক স্তোত্র সমাপ্ত ।

—:(০):—

সনাতন-হিন্দুধর্ম

সুবোধ কুমার নাথ, এম. এ. বি. টি.

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পৌরাণিক-যুগের হিন্দু-ধর্মে দেবদেবীর পূজা প্রথম প্রচলিত হ'ল।[১] বৈদিক-যুগের যজ্ঞ এবং যোগও পাশাপাশি থাকলো। তবে যজ্ঞানুষ্ঠান সাধারণতঃ সম্পদশালী গৃহস্থ ও রাজগণ সম্পন্ন করতেন; আর যোগানুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন সাধারণত সন্ন্যাসীগণ। সাধারণ-হিন্দুর জন্য পূজা ছিল প্রশস্ত। এই যুগের যোগধর্মেরও শ্রেণীবিভাগ হ'ল—(১) কর্মযোগ, (২) জ্ঞানযোগ, (৩) ভক্তিযোগ ইত্যাদি। ঈশ্বর বা দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের যে কোন পন্থাকেই যোগ নামে অভিহিত করা হ'ল। কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমেও ঈশ্বর বা দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হতে পারে বলে বলা হ'ল এবং সেই যোগকে বলা হ'ল কর্মযোগ; জ্ঞানের মাধ্যমেও ঈশ্বর বা দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হতে পারে বলে বলা হ'ল এবং সেই যোগকে বলা হ'ল জ্ঞানযোগ; ভক্তির মাধ্যমেও ঈশ্বর বা দেবতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হতে পারে বলে বলা হ'ল এবং সেই যোগকে বলা হ'ল ভক্তিযোগ ইত্যাদি। এই যুগের জ্ঞানযোগটাই ছিল আসলে বৈদিক-যুগের যোগমূলক জ্ঞানসাধনা।

পৌরাণিক-যুগের পূজায় কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের বিনিময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপচার দেবতার উদ্দেশ্যে দান করে বিশেষ কামনা পূরণ করার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হ'ত। পরে প্রসাদ বিতরণ করা হ'ত। যজ্ঞের ঋত্বিকগণের স্থলে এখানে পুরোহিত পূজাকার্য সম্পন্ন করতেন। পৌরাণিক পূজাও বৈদিক যজ্ঞের মতো

১। প্রাক্-বৈদিক যুগেও মাতৃমূর্তি বা শক্তিমূর্তি এবং শিবমূর্তি ছিল। তাই তখন মূর্তিপূজা প্রচলিত থেকে থাকলে পৌরাণিক-যুগে তা পুনঃপ্রবর্তিত হ'ল বলতে হবে।

কামনা-মূলক প্রবৃত্তি মার্গের অনুষ্ঠান। তবে এই পূজা উপলক্ষে নিবৃত্তি-মার্গের সংযম, ত্যাগ সাময়িকভাবে পালন করা হ'ত। এছাড়া দান-দক্ষিণার মাধ্যমে যজমান নিজের অর্জিত সম্পদ অন্য সকলকে ভোগ করিয়ে নিজে ভোগ করতেন। এখানেই প্রবৃত্তির সাথে নিবৃত্তির, ভোগের সাথে ত্যাগের প্রশ্ন রয়েছে।

পৌরাণিক-যুগে বৈদিক-যুগের দেবতাদের বিভিন্ন নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হ'ল[১] এবং বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে ঐ সকল দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার করা হ'ল। তবে এই কাজ করতে গিয়ে, আমার মনে হয়, বিভিন্ন পুরাণে বৈদিক-যুগের বিভিন্ন তত্ত্বকে রূপকের আশ্রয়ে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

পৌরাণিক-যুগের তিন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু স্থিতির দেবতা পালনকর্তা এবং মহেশ্বর লয়ের দেবতা প্রলয়কর্তা। বৈদিক-যুগের ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান দেবতাগণ পৌরাণিক-যুগে অপ্রধান হয়ে গেলেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু এবং রুদ্র আছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাসঙ্গিক সূক্তগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়,—ব্রহ্মণস্পতি স্তুতিদেব অর্থাৎ স্তুতির দেবতা, বিষ্ণু সূর্যদেব অর্থাৎ সূর্যের দেবতা এবং রুদ্র বজ্রদেব অর্থাৎ বজ্রের দেবতা।

বৈদিক-যুগে যজ্ঞ উপলক্ষে স্তুতি পাঠ করা ও গান করা হ'ত। যে দেবতার কৃপায় এই স্তুতি সকলের সৃষ্টি হ'ত তিনিই ব্রহ্মণস্পতি। স্তুতিসৃষ্টি ব্রহ্মণস্পতির ক্রিয়া বলে ব্রহ্মণস্পতিকে সৃষ্টিকর্তা বলা যেতে পারে।

১। আবিষ্কৃত শিবমূর্তি এবং মাতৃমূর্তি বা শক্তিমূর্তি থেকে মনে হয়, প্রাক্-বৈদিক যুগেও শিব এবং শক্তির রূপ কল্পনা করা হয়েছিল, তবে পৌরাণিক-যুগের শিব এবং শক্তির রূপ কল্পনা একটু অন্য ধরণের।

আদিত্য বা সূর্য বিশ্বচরাচর প্রতিপালন করে চলেছেন। সূর্য বা সৌরশক্তির জন্য জীব ও উদ্ভিদ জগতের স্থিতি সম্ভব হয়েছে। আবার এই আদিত্য বা সূর্যের দেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। তাই ঋগ্বেদ-সংহিতায় বিষ্ণুকে বলা যেতে পারে স্থিতির দেবতা পালনকর্তা।

বজ্রপাতের ফলে আকস্মিক ধ্বংস সাধিত হয়। পৃথিবীতে প্রলয়ঙ্কর ঝড়ঝঞ্ঝার সময় ঘন ঘন বজ্রপাত হয়। আবার বজ্রের দেবতা রুদ্র। তাই ঋগ্বেদ-সংহিতার রুদ্রকে বলা যেতে পারে প্রলয়ের দেবতা সংহারকর্তা।

বেদের কর্মকাণ্ডে বহু দেবতার কথা বলা হয়েছে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে কর্মকাণ্ডের ঐ বহুদেবতাকে স্বীকার করে নিয়েও সমস্ত দেবতার এক উৎস ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ অনুযায়ী বলতে হয়,—পরব্রহ্ম নির্বিকল্প অব্যক্ত স্বরূপ। তাঁকে দেখা যায় না অথচ তাঁর সাহায্যে সমস্তকিছু দেখা যায়; তাঁকে শোনা যায় না অথচ তাঁর সহায়তায় সমস্তকিছু শোনা যায়; ইত্যাদি। তিনি সর্বব্যাপী আবার সমস্তকিছুর অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট।

বলা হয়েছে,—"এক ব্রহ্ম ত্রয় দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা"; অর্থাৎ এক ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন প্রধান পৌরাণিক দেবতা হয়েছেন। পৌরাণিক ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা সৃষ্টিকর্তা; পৌরাণিক বিষ্ণু স্থিতির দেবতা পালনকর্তা; পৌরাণিক মহেশ্বর লয়ের দেবতা প্রলয়কর্তা।

সুতরাং বলতে হয়,—বৈদিকযুগের ঋগ্বেদ-সংহিতার স্তুতিদেব ব্রহ্মণস্পতি পৌরাণিক-যুগে পৌরাণিক ব্রহ্মায়, বৈদিক-যুগের ঋগ্বেদ-সংহিতার আদিত্যদেব বিষ্ণু পৌরাণিক-যুগে পৌরাণিক বিষ্ণুতে এবং বৈদিক-যুগের ঋগ্বেদ-সংহিতার বজ্রদেব রুদ্র পৌরাণিক-যুগে পৌরাণিক মহেশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছেন।

[ক্রমশঃ]

ম'রে গিয়ে বলি যদি

অধ্যাপক উমাপদ নাথ

সূর্যের শবযাত্রায় আমরা
মশালহাতে রোশনাই দেখিয়ে
হাঁটুকাদায় হইহল্লা আর
কেতামতো হেটোম করছি।
ওদিকে মাটির পেটে
কবর খুঁড়তে গিয়ে
তার
কলিজা থেকে অনেকখানি খুন
বেরিয়ে এলো। বললাম, এটা
অকালের ফাগ।

ছেঁড়া-ফাটা আকাশের
ঝুলপড়া প্রাচীনত্ব থেকে
জঘন্য মৃত্যুর মতো কালো কালো
সূর্য-পোড়া ছাই
আমাদের সৌখীন
মাথায় পড়ে। বলি,
এটা কষ্টসৃষ্ট যুগাগ্নির দান।

মৃত্যুর পাঞ্জা চিপে
জীবনকে জিতে আনা যায়—
একথা যেমন সত্য, তেমনি
মিথ্যা হলো এই
ম'রে গিয়ে বলি যদি,
'বেঁচে আছি দিব্যি আরামেই।'

—ঃ*ঃ—

মামা-ভাগ্নের হোটেল

(কৌতুক নক্শা)

অসিত বরণ নাথ

ছেলে : আসুন আসুন—স্যার। কি খাবেন বলুন ?

ভদ্রলোক : আচ্ছা, তোমাদের এখানে কি থাকার ব্যবস্থা আছে ?

ছেলে : আজ্ঞে আছে স্যার। ক'দিন থাকবেন ?

ভদ্রলোক : ক'দিন নয়। আজ রাতটা শুধু।

ছেলে : ঠিক আছে স্যার। আমাদের ডাইরীতে নাম-ঠিকানা লিখিয়ে নিন।

ভদ্রলোক : কিসের নাম-ঠিকানা ?

ছেলে : বাহ্, হোটেলে রাত কাটাতে হলে নাম-ঠিকানা লেখাতে হয়না ?

ভদ্রলোক : ওহ্, সেই কথা। তা তোমাদের ম্যানেজার বাবু কোথায় ? তাকে-তো দেখছি না।

ছেলে : আজ্ঞে আমিই বর্ত্তমানে ম্যানেজার। এটা আমার মামার হোটেল।

ভদ্রলোক : তাই নাকি ? আমি কিন্তু তোমাকে হোটেলের 'বয়' মনে করেছিলাম।

ছেলে : 'বয়' বলবেন না। আমি বাঙালী। তাই বালক বলবেন! আসলেই আমি বয়-টয় নই।

ভদ্রলোক : তাহলে তুমি কি গার্ল ? মানে বালিকা ? কই তোমাকে সেরকম তো মনে হচ্ছে না ?

ছেলে : আজ্ঞে স্যার আমি বালকও নই বালিকাও নই। আমি এই হোটেলের ম্যানেজার এবং হোটেলের বয়দের, সরি, বালকদের 'সুপার ভাইজার'।

ভদ্রলোক : ওহ্—বুঝতে পেরেছি। তা তোমার মামা কোথায় ?

ছেলে : আজ্ঞে তিনি দিনে রাজনীতি আর ঘটকালী করে বেড়ান, রাতে এখানে এসে ঘুমান। আর একটু বাদেই তিনি আসবেন। দেখবেন আপনাকে দেখলে তিনি কেমন ফুলে ওঠেন।

ভদ্রলোক : কেন, লোক দেখলেই তার দেহ ফুলে ওঠে নাকি ?

ছেলে : আজ্ঞে না। দেহ ফুলে ওঠার কথা বলিনি। আপনার মত কাষ্টমার দেখলে না তার মন ফুলে উঠবে।

আজ্ঞে এবার নামটা বলুন। ডাইরীতে লিখে রাখি।

ভদ্রলোক : হুঁ, লেখ। নাম—ভোম্বল ব্যানার্জী, গ্রাম—ঠকেরগাঁ।

ছেলে : হলো। আজ্ঞে এবার এখানে একটা সই করুন।

ভদ্রলোক : এখানটায় ?

ছেলে : হ্যাঁ—অ্যাঁ—করলেন কি স্যার ! ইংরাজীতে সই করলেন যে ? মামা দেখলে তো আমাকে মেরে ফেলবেন। দেখুন, আমাদের ডাইরীতে কেউ ইংরাজীতে সই করেন না ; বাংলায় করেন। জানেন, একবার এক বিদেশী ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি আবার বাংলায় সই করতে পারেন না। মামা তখন তাঁকে বললেন—'বাংলায় সই করতে পারেন তো করুন নয়তো টিপ সই দিন।' শেষে ভদ্রলোক টিপ সই করে তবে হোটেলে রইলেন। হ্যাঁ, আর একবার এক ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি টিপসই দিতে রাজী হননি। তিনি বললেন—'হামি টো আর অশিক্ষট নই যে হামি টিপসই ডেব।' শেষে মামা তাঁকে বাংলায় হাতেখড়ি দিয়ে বাংলা অক্ষর শিখিয়ে বাংলায় সই করিয়ে তবে ছাড়লেন।

ভদ্রলোক : আমি কি করে বুঝব ? তুমি বল্‌লে সই করতে তাই আমি ইংরেজীতে সই করলাম।

ছেলে : আজ্ঞে দুজনেরই যখন ভুল হয়ে গেছে তখন কেটে কুটে বাংলায় সই করুন না স্যার।

ভদ্রলোক : তাই হোক।

ছেলে : আচ্ছা, আপনি শহরে এসেছেন কেন স্যার ?

ভদ্রলোক : চাক্‌রী করতে। আর আমি তো শহরে রোজই আসি।

ছেলে : আজ্ঞে আমার সাথে তো দেখা হয় না। তা আপনি আমাদের হোটেলে আসেন না কেন ?

ভদ্রলোক : আমি তো রোজ বাড়ী চলে যাই। আজ বেতন পেয়েছি। আজকালকার রাস্তাঘাটতো তেমন ভাল নয় তাই মনে করলাম রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাই।

ছেলে : আজ্ঞে আমাদের এখানে নিঃসংশয় থাকতে পারেন।

ভদ্রলোক : তোমাদের এখানে কি কি খাবার আছে ?

ছেলে : ইলিশ মাছ, ছ'ডাল, মুড়িঘণ্ট, ডালনা········· ।

ভদ্রলোক : বেশ বেশ। মুড়িঘণ্ট কি মাছের মাথা দিয়ে করেছ ?

ছেলে : লাটা মাছের স্যার।

ভদ্রলোক : লাটা মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট ! কী যে শোনালে।

ছেলে : আজ্ঞে হাসছেন্ যে বড় ? সত্যি রান্নাটা যা হয়েছে না; একটু খেলেই বুঝতে পারবেন।

ভদ্রলোক : আচ্ছা, অনেক রাত হলো এবার খেতে দাও।

ছেলে : আজ্ঞে চেয়ারে বসবেন না চাটাইতে বসবেন ?

ভদ্রলোক : তা আমার যেখানে খুশি বসব।

ছেলে : আজ্ঞে চেয়ারে বসলে পয়সা একটু বেশী দিতে হবে। আর চাটাইতে বসলে পয়সা কম।

ভদ্রলোক : বাড়ীতে তো রোজই চেয়ারে বসে খাই। এখানে চাটাইতে বসব কেন ?

ছেলে : আজ্ঞে চেয়ারেই বসুন স্যার।
—এই কে আছিস্ স্যারকে ভাত দে!

(চাকর টেবিলে ভাত দিয়ে গেল)

ভদ্রলোক : এ কী! এতে তো রেশনের পচাচালের ভাত থেকে গোবিন্দভোগ পর্যন্ত আছে।

ছেলে : আজ্ঞে দেখুন, সবাইতো সব রকমের চাল খেতে অভ্যস্ত নন। কেউ খান গোবিন্দভোগ আবার কেউ রেশনের। তাই আমরা এভাবেই দুটোকে মিশিয়েই রান্না করি। যে যারটা বেছে খান। তবে চাইলে বেছে দেবার জন্য আমাদের লোক আছে। প্লেটে আট আনা করে নেয়।

ভদ্রলোক : ঠিক আছে আমি এভাবেই খাব। মাছ দাও।

(চাকর ইলিশ মাছ দিয়ে গেল)

ছেলে : এই নিন খাসা ইলিশ।

ভদ্রলোক : অ্যাঁ, এটা ইলিশ হলো? এতো দেখছি খোকা ইলিশ।

ছেলে : দেখুন, বাইরে থেকে তো আর খোকা-খুকি বুঝতে পারি না। তাই পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে না গিয়ে উভয়লিঙ্গই বলে দিলাম।

ভদ্রলোক : এটা কি মাছের ঝোল না গঙ্গাজল? এর চেয়ে আমার দশ বছরের মেয়েও ভাল রাঁধে।

ছেলে : আজ্ঞে কিছু মনে করবেন না। আপনার কন্যা যদি এতই ভাল রাঁধে তো তাকে এখানে নিয়ে আসুন না? ভাল মাইনে দেব। থাকা-খাবার ব্যবস্থাও করে দেব।

ভদ্রলোক : কি বললে? আমার মেয়ে তোমার হোটেলে রাঁধবে? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

ছেলে : আজ্ঞে মুখের কী দোষ বলুন? দোষ তো মনের।

এমন রাঁধুনীর কথা শুনলে কোন্ হোটেল মালিকের মন না চায় তাকে রাখতে ?

ভদ্রলোক : খুব হয়েছে। এবার ডাল পাঠাও।

(চাকর ডাল দিয়ে গেল)

ভদ্রলোক : অ্যাঁ ! এটা কি ডাল ? বাসি-পচা-টক হয়ে গেছে। কই আর কী ডাল আছে দাও।

ছেলে : আজ্ঞে আর তো ডাল নেই।

ভদ্রলোক : কেন ? তুমি যে বল্‌লে দু'ডাল।

ছেলে : আজ্ঞে, যে বাসি ডাল ভালবাসে সে বাসি মনে করে খায়। আর যে টক ডাল ভালবাসে সে টক ডাল মনে করে খায়।

ভদ্রলোক : তোমার মাথা।

ছেলে : আজ্ঞে, মাথার মুড়িঘণ্ট আনবো স্যার ?

ভদ্রলোক : হয়েছে, তোমার ঐ লাটা মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট খেতে হবেনা। থাক্‌লে একটু লেবু-টেবু দাও।

ছেলে : 'লেমু' দেব স্যার ?

ভদ্রলোক : লেবুকে লেমু বলছ কেন ? 'ম' এর জায়গায় 'ব' বলবে।

ছেলে : ঠিক আছে স্যার। এখন থেকে 'ম' এর জায়গায় 'ব' বল্‌ব। এইবার বলুন স্যার কী ভাবে শোবেন।

ভদ্রলোক : তার মানে ? শোয়া আবার কীভাবে হয় ? মানুষ যে ভাবে শোয় সেভাবেই শোবো।

ছেলে : আজ্ঞে স্যার ঠিক তা বলছি না। এই ধরুন চিৎ হয়ে শোবেন না কাৎ হয়ে শোবেন ? ডান কাতে না বাঁ কাতে ? হাঁটু মেলে না হাঁটু গুটিয়ে ? না বসে বসেই ঘুমাবেন ? বসে বসে ঘুমালে পয়সা সবচেয়ে কম। হাঁটু গুটিয়ে শুলেও অনেক কম। ডান কাতের চেয়ে বাঁ কাতে শুলে

একটু বেশী পয়সা লাগবে। কারণ লক্ষ্য করে দেখবেন, পুরুষের বাঁ কাতে একটু জায়গা বেশী লাগে। চিৎ হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মেলে দিয়ে শুলে পয়সা সবচেয়ে বেশী। ঐ যে আমার বাবা আসছেন।

ভদ্রলোক : বাবা! তোমার বাবা এখানে থাকেন না কি?

ছেলে : কেন? বললাম্ না উনিই মালিক; খানিকটা পরে আসবেন।

ভদ্রলোক : সে তো তোমার মামার কথা বলেছিলে।

ছেলে : আজ্ঞে আপনি তখন বলেছিলেন না 'ম'-এর জায়গায় 'ব' বলতে? তাই 'মামা'র জায়গায় 'বাবা' বললাম।

ভদ্রলোক : হুঁ, না এ রাতে মামাই বলবে।

ছেলে : এই যে মামা! উনি আমাদের অতিথি।

মামা : তা কেমন খেলেন? আমি উপরে যাচ্ছি। একটু বাদে তুই এসে কথা শুনে যাস্।

ভদ্রলোক : কেমন খেয়েছি জিজ্ঞেস করলেন কেন?

ছেলে : আজ্ঞে আপনার খাওয়ার উপর আমাদের বিল নির্ভর করছে। ঐ মামা ডাকছেন। আমি আসি।

(ভদ্রলোক মনে মনে ধোঁকা দেবার ফন্দি আঁটে)

ছেলে স্যার, মামা আপনাকে ডাকছেন।

ভদ্রলোক চল।

মামা বসুন বসুন। আপনার ঠিকানা?

ভদ্রলোক ঠকেরগাঁ।

মামা আপনার মেয়ে ছেলে কটা?

ভদ্রলোক কি বললেন? মেয়েছেলে পুরুষের ক'জন থাকে? ইয়ার্কি হচ্ছে?

মামা : চটে যাচ্ছেন কেন মশাই? কথাটা একটু উল্টে জিজ্ঞেস

করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ে ছেলে উল্টে ছেলে মেয়ে জিজ্ঞেস করছি। ছেলে মেয়ে কটা আপনার ?

ভদ্রলোক : একটা মাত্র মেয়ে।

ছেলে : মামা! ওনার মেয়ে নাকি খুব ভাল রাঁধে।

মামা : তাই নাকি! একদিন নিয়ে আসুন না ?

ভদ্রলোক : আপনারা তো দেখছি মামা-ভাগ্নে একেবারে এক।

ছেলে : আজ্ঞে ওসব কথা বাদ দিন। এবার বিলটা দিন।

ভদ্রলোক : কিসের বিল ?

ছেলে : এই যে খাওয়া-দাওয়া করলেন—থাকবেন।

ভদ্রলোক : না এখানে থাকব না। আর বাসি-পচা যা' খেয়েছি তার কোন দামই নেই। বেশী বাড়াবাড়ি করলে পচা-বাসি চালানোর কথা থানায় জানিয়ে দেব।

ছেলে : কী, দাম দেবেন না ? আর আমরা যে বাসি-পচা খাইয়েছি তার প্রমাণটা কি ?

ভদ্রলোক : দেখুন মামা মশাই ; আপনার বাসি-পচা খাবার সব আমি আমার এই টিফিন কেরিয়ারে নিয়েছি। আর এটাও জেনে রাখবেন আমি নিজেই একজন পুলিশ। বড় বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের যাচাই করতে। এবার আমি যা' যা' জিজ্ঞেস করছি সব সত্য বললে আমি আপনাদের রেহাই দিতে পারি।

মামা-ছেলে : সব সত্য বলব স্যার। বলুন কি কি জানতে চান ?

ভদ্রলোক : আপনাদের বাসি-পচা খাবারগুলো কত দিনের ?

ছেলে : আজ্ঞে স্যার ইলিশমাছের ঝোলটার বয়স মাত্র তিন দিন, ডালটা গতকালের, ভাতটাও কাল রাতের। রোজ রান্না করলে কি পোষায় ? আমাদেরও তো বাঁচতে হবে স্যার।

ভদ্রলোক : বাঁচতে হবে ঠিকই কিন্তু এই বাসি-পচা খাইয়ে ? যাক্, টিফিন কেরিয়ারে আসলে আমি কিছুই নিইনি। এবার

এই টিফিন কেরিয়ার ভরে ভাত মাছের ঝোল দাও তো।

ছেলে : দিচ্ছি স্যার।

ভদ্রলোক : তাহলে এবার আমি আসি। এই চিঠিটায় যা' লেখা আছে ঠিক সেই মত কাজ করবে। নইলে আমি সব ব্যাপারটা আউট করে দেব।

ছেলে : যাক্ বাঁচা গেল।

মামা : তুই কি করলি ? পচা খাবারগুলো দিয়ে দিলি ? এবার যদি লোকটা দারোগা-টারোগা নিয়ে আসে তাহলে কি আর রক্ষে আছে ?

ছেলে : আসলেও আর বাসি-পচা বের করতে পারবে না মামা। কারণ, এইমাত্র আমাদের জন্য যা' রান্না হয়েছিল সেগুলো থেকেই দিয়ে দিয়েছি।

মামা : খাসা বুদ্ধিতো দেখছি তোর ! এবাব চিঠিটা খুলে পড় দেখি।

মামা/ভাগ্নে,

আসলে আমি কোন পুলিশ নই। আমি একটা বেকার লোক। হাতে পয়সা ছিল না ; খিদেও পেয়েছিল। তাই খিদেও মেটালাম আর আপনাদের সাথে একটু মশকরাও করলাম। আশা করি মনে কিছু করবেন না।

ইতি
কাষ্টমার

ছেলে : কাষ্টমার না ছাই। সারাদিন পর একটা কাষ্টমার পেলাম। ভেবেছিলাম একটা বড় বিল করব। তা না একেবারেই লোকশান ! এবার এই ঠকবাজির ব্যবসা বাদ দাও মামা ! নইলে লোকশান খেয়েই মরতে হবে।

—(০)—

পাত্র-পাত্রী

(পরিণয় সংঘটন বিভাগ)

পরিচালনায়—বি. দেবনাথ

পাত্রী অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত বয়স ১৭ উত্তম শ্যামবর্ণ প্রকৃত স্বাস্থবান সুকেশী গৃহ কর্ম নিপুনা উপযুক্ত পাত্র চাই। হরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীমা রেডিও সার্ভিস, উত্তর ঘোষপাড়া, চাকদহ, নদীয়া।

পাত্র (৩২), (৫'-৬"), বি. এস. সি, ধনী ব্যবসায়ী, স্বাস্থ্যবান, সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ, গ্রাঃ+পোঃ—পানুহাট, জিলা—বর্দ্ধমান।

পাত্রী (৩১) (৫'-৪") গ্রাজুয়েট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী, স্লিম ফিগার, ঐ ভ্রাতা

পাত্র (৩০) (৫'-৬") গ্রাজুয়েট কেঃ সঃ কর্মচারী, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, প্রয়োজনে বদল সম্বন্ধে আপত্তি নাই। শ্রীতারাপদ নাথ, ১৯, মিত্র বাগান রোড, পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

পাত্রী (২৮) বি. এ. Short Hand জানা। প্রাইভেট ফার্মে কর্মরতা। ফর্সা, সুন্দরী স্লিম ফিগার এবং

পাত্রী (২৬) বি. এ. Short Hand জানা, ফর্সা স্লিম ফিগার এবং

পাত্রী (২৪) বি. এ. পরীক্ষার্থিনী, প্রকৃত সুন্দরী। গোপাল দেবনাথ, অনরেট ফার্ষ্ট লেন, ইণ্টালি, কলি-১৪।

পাত্রী (২৪) (৫'-২") বি. কম্, বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত নাথ বংশীয়, উত্তম শ্যামবর্ণা, সুগঠনা সুশ্রী, শান্ত স্বভাবা গীটার ও টাইপ জানে। সত্বর সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীশ্যামাপদ নাথ, ২৬-পি জুবিলী পার্ক, কলি-৩৩, ফোন ৪২-৩৫৫৫।

পাত্র (২৮) বি. এস. সি, ইলেঃ ইঞ্জিনীয়ার (কলিকাতা), এম. এস. সি. ইলেঃ ইঞ্জিনীয়ার (কানাডা)। আমেরিকায় পদস্থ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কর্মরত। প্রকৃত সুন্দরী এবং উচ্চ শিক্ষিতা পাত্রী চাই। এবং

পাত্রী ঐ ভগ্নী, (২৬), (৫'-২½"), বি. এ. সঙ্গীতজ্ঞা, মধ্যমবর্ণা, সুগঠনা, স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উপযুক্ত পাত্রের ক্ষেত্রে বিদেশে চাকুরীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে। শ্রীএল. কে. নাথ, হেড মাষ্টার, বাদকুল্লা ইউনাইটেড একাডেমি, পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া।

পাত্রী (২৫) (১-৫০ মি) বি. এ. কথক নৃত্যে বি. এ. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষণ বিভাগে কর্মরতা। সুন্দরী গৃহকর্মে নিপুনা। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শ্রীহিমাদ্রি শেখর নাথ, ৪৮, এ. সি. সেন রোড, রিষড়া, জেলা-হুগলী।

পাত্রী (২৭) বি. এ. এবং স্পেশাল বি. এ. সরকারী প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, ফর্সা, সঙ্গীতজ্ঞা। উপযুক্ত পাত্র চাই। শ্রীঅজিত কুমার নাথ, ৪৭, নিমচাঁদ মৈত্র ষ্ট্রীট, কলি-৩৫।

পাত্র (২৫), ১১ ক্লাস, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুস্বাস্থ্য, নিজস্ব বাড়ী। সুন্দরী পাত্রী চাই। বি. দেবনাথ।

পাত্রী (২৮) (৫'-১") শ্যামবর্ণা, হাঃ সেঃ মান, ব্যাঙ্ক অফিসারের প্রথমা কন্যা। অতীব শান্ত স্বভাবা। চাকুরে বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। বি. দেবনাথ।

[উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রের জন্য বি. দেবনাথ, ৫২/৬ শশীভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলিকাতা-৩৬-এর সহিত যোগাযোগ করণীয়]

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ একশত টাকা প্রদান ক'রে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর আজীবন সদস্য হয়েছেন

শ্রীমতী শোভারানী নাথ
প্রযত্নে গোষ্ঠবিহারী নাথ
গ্রাম—কপাটের হাট
পোঃ—ডায়মণ্ডহারবার
জিলা—২৪ পরগণা

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাথ
গ্রাঃ—প্রফুল্লনগর
পোঃ—হাবড়া
জিঃ—২৪ পরগণা

শ্রীনন্দলাল ভৌমিক
১০ নং হলধর বর্দ্ধন লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

শ্রীসুরেশচন্দ্র ভৌমিক
২নং হৃষিকেশ ঘোষ লেন
সালকিয়া, হাওড়া-৬

শ্রীতাপসকুমার নাথ কর্তৃক ২৩/১এ স্কিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও বাসন্তী আর্ট প্রেস ১/২বি, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য : ৭৫ পয়সা